কালকূট

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৬১
দ্বিতীয় মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৬২
তৃতীয় মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৬২
চতুর্থ মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৬৩
পঞ্চম মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৬৪
ষষ্ঠ মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৬৪
সপ্তম মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—বি. বি. রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭।এ, বলাই সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

অনেক আশা নিয়ে যারা গিয়েছিল,
আর কোন আশা নিয়ে কোনদিন ফিরে আসবে না
তাদের উদ্দেশে—
—কালকূট

॥ বিচিত্র ॥

অনেক বিচিত্রের মধ্যে মানুষের চেয়ে বিচিত্র তো আর কিছু কোনদিন দেখি নি। সেই বিচিত্রের মাঝেই আমার অপরূপের দর্শন ঘটেছে। ভেবেছিলাম, একদিন মানুষ ছাড়িয়ে, অন্য কোনখানে আমার সেই অপরূপের দেখা পাব।

সব মানুষই একজন নন। আর-একজন আছেন তাঁর মধ্যে। একজন, যিনি কাজ করেন বাঁচবার জন্যে, অর্থের জন্যে গলদঘর্ম দিবানিশি, যিনি আহার-মৈথুন-সন্তানপালনের মহৎ কর্তব্যে ব্যাপৃত প্রায় সর্বক্ষণ, এই জটিল সংসারে যাঁর অনেক সংশয়, ভয় প্রতি পদে পদে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিবাদ, এই সব নিয়ে যে মানুষ, তাঁর মধ্যে আছেন আর-একজন—যিনি কবি, সাহিত্যিক, পাঠক, শিল্পী, গায়ক, ভাবুক। এক কথায়, যিনি রসপিপাসু। হয়তো তিনি লেখেন না, লেখা পড়ে হাসেন, কাঁদেন, মুগ্ধ হন। গায়ক নন, গান শুনে সুরের মাঝে হারিয়ে যান। মানুষের এই অনুভূতির তীব্রক্ষণে, সে বড় একলা। এ একাকিত্বের বেদনা যত গভীর, আনন্দ তেমনি তীব্র।

বুঝতেও পারি নে, মানুষের এ একাকী মুহূর্তেই, তার ঘরবাঁধা মন মানুষের হাটের মাঝে যায় হারিয়ে। তখন তো সে আর ঘরের নয়, পরের। তখন সে যত একলা, তত দোকলা। এতে মনের কোন অলৌকিকত্বের ছলনা নেই। আমাদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে এ একাকিত্ব অকাজের খেলা হয়ে আছে। এ অনুভূতি যখন এক ফাঁকে মনের দরজা খুলে, ছড়িয়ে পড়ে রক্তকোষে, চারিয়ে যায় শরীরে, তখন আমরা সেই হাট-করে-খোলা মনটি নিয়ে সশরীরেই যাই মেলায়। পথে ঘাটে মাঠে যাই। দশজনের মিছিলের মধ্যে, সকলের ভয় নিয়ে কখনো আসি পিছিয়ে। কখনো ঝাঁপ দিই সাহসে বুক বেঁধে।

যখন কোন নিঃশব্দ নিরালা মুহূর্তে, বিস্ময়ে বেদনায় আনন্দে লক্ষ্য করেছি, এক প্রসন্নময়ের আবির্ভাব ঘটেছে আমার চোখের সামনে, তখনই অবাক হয়ে দেখেছি, সে আর কেউ নয়, মানুষ! তাকে ছাড়িয়ে কোন অপরূপের দর্শন আমার ঘটল না। তাই আমার সব নমস্কার মিলিয়ে, এক নমস্কার নিয়ে ফিরেছি বারংবার তারই দরজায়।

যে প্রসঙ্গে এত কথা উঠল, সেই কথা বলি। বইটির এই নতুন সংস্করণের আগে পর্যন্ত, অনেক মানুষের অনেক চিঠি পেয়েছি। কেউ দিয়েছেন 'দেশ' পত্রিকার ঠিকানায়, কেউ প্রকাশকের ঠিকানায়। জনে জনে জবাব দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। আজো ঠিক তেমনি করে জবাব দিতে বসি নি। সব মিলিয়ে কিছু কথা জমেছে মনে। সেটুকু না লিখে পারলাম না। যে পাঠক-পাঠিকারা পত্র দিয়ে কালকূটকে অভিনন্দিত করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ। এই নতুন সংস্করণ তাঁদের হাতে পৌঁছুবে কি না জানিনে। যাঁদের হাতে পৌঁছুবে, তাঁদের, এবং তাঁদের হাত দিয়ে আগের পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশে এই 'বিচিত্র' কথা উৎসর্গ করছি।

যত বিচিত্র মানুষ, তত বিচিত্র তার পত্র। এ দেশে মহৎ মানুষের পত্রগুচ্ছ ছাপানো হয়। আমার পাওয়া পত্রগুচ্ছ তার চেয়ে কম মহৎ নয়। এ পত্রগুচ্ছ এক-একটি বিচিত্র দরজা খুলে দিয়েছে আমার সামনে। সব পত্রে নিরঙ্কুশ প্রশংসা, বিস্ময়, অভিনন্দন নেই। অনেক কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, সংশয়ও আছে। এমন কি ভয়ও আছে।

একজন অনেক কথার পর লিখেছেন, "আমি বৃদ্ধ এবং অন্ধ। চোখে দেখতে পাই নে। আমার ভাইপো বইটি পড়ে শুনিয়েছে। তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি পত্রটি।

পত্রটি না দিয়ে পারলুম না। আমার সব অন্ধত্ব যে ঘুচে গেল ভাই!"

পত্রটি পড়ে বুঝেছি, আর যাই হোক, তিনি আমার চেয়ে চক্ষুষ্মান।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যাদের মেলায় দেখেছি, তাদের কারুর দেখা ফিরে এসে পেয়েছি কি না। পেয়েছি বৈ কি! সঙ্গমসৈকত

তো আজ শূন্য। সবাই আমরা ফিরে এসেছি জনপদে। আমরা যে সবাই জনপদেরই অধিবাসী। এখান থেকেই তো সবাই গিয়েছিলাম সেখানে। ফিরে এসেছি, দেখতে পেয়েছি, শুধু চিনতে পারি নে। সেই মহামেলায় দেখা পাওয়া, আর এখানে দেখা পাওয়া, দুয়ে যে অনেক তফাত।

ঘুরে ফিরে একটি নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে কোন কোন পত্রে। হবেই। সেইজন্যেই মানুষ বড় বিচিত্র। পত্রের লেখক-লেখিকার অধিকার সম্পর্কে আমি প্রশ্ন তুলতে পারি নে। কিন্তু সব কথার জবাব দেওয়া যায় না, সব মানুষই জানেন।

যা লিখেছি, তার চেয়ে বেশী লেখার কিছু আমার এই মুহূর্তে নেই। বলেছি, শ্যামা স্বৈরিণী নয়। যদি কেউ তা ভাবেন, সে নৈতিক দায়িত্ব আমারই। তাকে বাইরে প্রকাশ করেছি আমি।

একবার ফিরছিলাম সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে, এক মেল ট্রেনে। ছোট কামরাটিতে কুল্যে তিনটি পরিবার। তার মধ্যে একটি অবাঙালী। আমি ফিরছিলাম, একটি বাঙালী পরিবারের বন্ধু হিসেবে। অপর বাঙালী পরিবারের মধ্যে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী।

স্ত্রীটি রূপসী নন। কিন্তু সব মিলিয়ে বাইশ-চব্বিশে ভদ্রমহিলার একটি অদ্ভুত চটক ছিল। তাঁর বড় বড় চোখের চাউনি কেমন অলস, কিন্তু একটি বিচিত্র হাসি ঝিকিমিকি করছিল চোখের কোণে। তাঁর ঈষৎ স্থূল ঠোঁটের বিষণ্ণতার মধ্যে কেমন একটু অদ্ভুত হাসির বিদ্যুৎ-চমক ছিল। স্বামী ভদ্রলোককে বেশ নিরীহ মনে হচ্ছিল। জানালা দিয়ে এর চা এগিয়ে দেন, ওর জল এগিয়ে দেন। একে জায়গা ছেড়ে দেন তো আর-একজনের শোবার জন্যে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু ব্যস্তবাগীশ নন। ওর মধ্যেই, ভদ্র লোককে আবার সব বিষয়ে কেমন যেন নিরাসক্ত মনে হচ্ছিল।

একটি জিনিস চোখে পড়ল অনেকক্ষণ পর। আমাদের পরিবারের মধ্যে এক যুবক ছিলেন। তিনি জামাই। জনাকয়েক যুবতী শাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে তিনি কলকাতায় ফিরছিলেন। সেই যুবকের সঙ্গে দেখলাম, ও-পক্ষের স্ত্রীটির কখন বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সব ফেলে ওই দুটি!

কেমন করে, কখন এ বন্ধুত্ব হয়েছে, কেউ খবর রাখে নি। বোধ হয় ওঁরা দুজনেও রাখেন নি। যখন চোখ পড়ল, তখন দেখি, ভদ্রমহিলার ঠোঁটের চমক, চোখের ঝিকিমিকি, কখন আর-এক ভাবের দরজা দিয়েছে খুলে। এমন দুটির বন্ধুত্ব হলে যা হয়। দজ্জাল কথাটি বাংলায় গালাগাল কিনা, সঠিক জানি নে। তবু বলছি, ভদ্রমহিলা দজ্জাল-সুন্দরী নন। তাই তাঁর আবেগের মধ্যে কিছু ভাবপ্রবণতার লক্ষণ দেখেছিলাম।

শাশুড়ীদের চোখ যে না পড়েছিল তা নয়। তবে, নিজেদের মেয়েটির রূপ ও গুণ সম্পর্কে অবস্থা এত বেশী ছিল যে, জামাইয়ের জন্য তাঁদের ভয় ছিল না একটুও। তবু, মানুষের মন তো! চোখের মণিগুলি চোখের কোণ থেকে আর মাঝে গেল না তাঁদের।

স্বামী ভদ্রলোকের ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের মনে যাই-থাক, সবটুকুই খুব সহজ চোখে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। স্বামীও বোধ হয় তাই। কেননা, উনি যেন সকলের চেয়ে সহজ। ওর মধ্যেই মাঝে মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে দু-একটি কথা বলছেন। আমাদের জামাইয়ের সঙ্গেও যে না বলছেন, তা নয়। কখনো বাইরে তাকাচ্ছেন, কাগজ পড়ছেন, চা খাচ্ছেন। কিন্তু ঝিমুচ্ছিলেন না একদম।

বলতে গেলে জামাইবাবু আমারও জামাইবাবুই! আলাপও কম হয়নি। এখন চোখাচোখি হলেও তিনি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। সে বেচারীরও যে অস্বস্তি কম ছিল, তা নয়। কিন্তু সেও তো মানুষ! ভদ্রমহিলার চোখ দুটিও তো কম নয়। তার উপরে, তাঁর চোখের বিষণ্ণ ছায়ার কোল ঘেঁষে যে সামান্য একটু রোদের ঝিকিমিকি ছিল, এখন সেই দুটি চোখের পুরোটিই তৃতীয়ার চাঁদের মত বঙ্কিম ও রহস্যময় হয়ে উঠেছিল।

সন্ধ্যার পর খাওয়া, শোয়া ইত্যাদির জন্য সকলকেই কিছু পরিমাণে এলোমেলো হতে হল। সেই ফাঁকে একবার শুনতে পেলাম, ভদ্রমহিলা বলছেন, বউ বুঝি খুব রূপসী আর গুণী?

জামাই বললেন, সেটা তা হলে আপনাকে গিয়ে দেখে আসতে হয়।

ভদ্রমহিলা : আমাকে ? কেন, আপনার মুখ দেখেই তো বুঝতে পারছি।

জামাই : মুখ দেখলেই সব বোঝা যায় বুঝি ?

ভদ্রমহিলা : নয় ?

বলে ওঁরা ছুজনেই ছুজনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন।

তারপর রাত হয়েছে। কত রাত কে জানে। কোনদিনই গাড়িতে সহজে ঘুমোতে পারি নি। ভদ্রমহিলা শাশুড়ীদের এক পাশে আধশোয়া হয়ে ছিলেন। জামাই আমার মাথার কাছে কনুই রেখে, অন্য বেঞ্চিতে আধশোয়া। তার পাশে স্বামী ভদ্রলোক।

শুনলাম ভদ্রমহিলা বলছিলেন, মনে আছে তো ?

জামাই বললেন, নোটবুকে লিখে রেখেছি।

: যদি একেবারেই মনে না থাকে, সেই ভয়ে, না ? ভদ্রমহিলার গলায় একটু অস্ফুট হাসির নিক্কণ।

জামাই : না, মনে থাকবে। তবু লিখে রাখা উচিত।

ভদ্রমহিলা : তবে, কাগজে। আবার একটু হাসি।

একটু নীরবতা। আবার ভদ্রমহিলা বললেন, আসবেন তো সত্যি ?

: সত্যি আসব।

: মিথ্যে বলছেন না ?

ভদ্রমহিলার গলায় কী ছিল জানি নে। মনে হয়েছিল যেন যুগযুগান্ত ধরে শুধু মিছে কথাই শুনে এসেছেন। জামাই বললেন, মিথ্যে বলি নে।

তারপর চুপ। শুধু চাকা আর লাইনের ঘষাঘষি। ওঁদের স্তব্ধতা দেখে, চোখ চাইলাম।

আশ্চর্য ! দেখলাম, জামাই অন্যদিকে মুখ করে আছেন চিন্তিতভাবে। ভদ্রমহিলা জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বিষণ্ণ হাসি নিয়ে। আমার চোখের ভুল কিনা জানি নে, ভদ্রমহিলার চোখ ছুটি ভেজা মনে হয়েছিল।

তারপর হাওড়া স্টেশন। স্বামী-স্ত্রী নামলেন। ওঁদের নিতে লোক এসেছে। গাড়ি এসেছে নিতে। জামাই আমি ছুজনেই মালপত্র নামাতে ব্যস্ত। শাশুড়ীদের ধমকানিতে জামাই একটু বেশী ব্যস্ত।

মালপত্র নামানো হল। সেই স্বামী-স্ত্রী তখনো দাঁড়িয়ে। স্ত্রী এগিয়ে এলেন জামাইয়ের কাছে। বললেন, হয়েছে?

জামাই চমকে বললেন, অ্যাঁ? তারপর ভদ্রমহিলাকে দেখে লজ্জিত হয়ে, বললেন, হ্যাঁ, হয়েছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, তা হলে যাচ্ছি।

এই মুহূর্তে জামাইকে একবার বিষণ্ণ ও বিস্মিত হতে দেখলাম। যেন এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, এই মেয়েটির সঙ্গে তার এক বিচিত্র ভাবের বন্ধন হয়েছে। সে মেয়েটির বাসি মুখের দিকে তাকিয়ে কেবল বলল, আচ্ছা!

ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে ফিরেও একবার হেসে নমস্কার করলেন। স্বামীও তাই করলেন। জামাইকে বললেন, আসবেন কিন্তু।

শেষ। তবু শেষ নয়। কেবলি ভাবছিলাম, একে কী বলে? কখন এর শুরু আর কখন শেষ, কেউ জানে না। অনুসন্ধানে ধরা পড়তে পারে।

কিন্তু এ ঘটনা নিয়ে বলার তো কিছু নেই।

বেশ কিছুদিন পর, জামাইকে হঠাৎ একটি গলির মোড়ের কাছে দেখে থমকে দাঁড়ালাম।

মনে পড়ে গেল সেই ঠিকানাটি, গলিটা দেখে। মনে পড়ল সেই মেয়েটির মুখ। গলি দেখিয়ে বললাম জামাইকে, এ পাড়াতে গেছলে বুঝি।

জামাই অবাক! বললেন, না তো! কেন? তোমার বাড়ি কি এ পাড়ায়?

বললাম, না। আমি যাব একটু অন্যদিকে। একটু সন্দেহ করেই জিজ্ঞেস করলাম, তবে তুমি এদিকে কোথায়?

জামাই নির্বিকার সরল ভাবেই বললেন, আগের বাসটা ধরতে পারি নি। একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি বাসের অপেক্ষায়।

তবু জামাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এ পাড়ায় তোমার কেউ নেই?

জামাই আকাশ থেকে পড়লেন। গলিটার দিকে একবার ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, কই মনে পড়েছে না তো।

থাকবে কেন। কাগজের লেখা তো! হেসে বিদায় নিলাম। হয়তো কোন একদিন ওঁর মনে পড়বে। তবু আমারই সারা মন দুর্বল অভিমানে ভরে উঠল। মনে মনে বললাম, মিথ্যুক! তুমি বড় মিথ্যুক!

কিন্তু তারপর! তারপর আর কী বলবে! সকলের সব পত্রের, সব প্রীতি, ভালোবাসা, ধন্যবাদ, আশীর্বাদ আমি মাথা পেতে ও বুক ভরে নিয়েছি। কলকাতার কোন এক অখ্যাত গলির বাঁকা-চোরা অক্ষরের সে বিচিত্র প্রশ্নভরা চিঠি থেকে শুরু করে, সেই দৃষ্টিহীন ভদ্রলোক এবং লক্ষ্ণৌয়ের লেখিকার সনেট, বহু পত্রের, জবাবের প্রত্যাশাহীন অভিনন্দনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

কিন্তু অনেকের আন্ কথার কী জবাব দেব। তাতে শুধু আন্‌বাড়ির রাস্তাই খোলা হয়ে যাবে।

তাই সেসব কথা রইল। আমার নীরব হওয়ার পালা অনেক আগেই এসেছে। নীরবই ছিলাম। মাঝে এই বিচিত্রের গানটুকু বোধহয় বাকি ছিল গাওয়া। আমাকে বেশী বলিয়ে লাভ নেই। সব কথা বলা ও শোনা যায় না।

আর-একটি কথা। বিচিত্র লিখতে বসেছি, একটি প্যাকেট এল ডাকে। খুলে দেখি 'ডাকের চিঠি', পশুপতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের নতুন বই। পাতা খুলে দেখি, চিঠি লিখেছেন কালকূটকে, প্রথম পাতাতেই অমৃতকুম্ভের সন্ধানের জন্যে বিস্ময় ও ভালবাসা জানিয়ে। এ পর্যন্ত এই আমার শেষ চিঠি। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে।

মাঝে মাঝে রাস্তায় ট্রেনে এক শ্রেণীর অবাঙালী মেয়েকে ভিক্ষে করতে দেখলে ঝুসির সর্বনাশীকে মনে পড়ে। বুকে হাত দিই। মানিব্যাগের জন্য দিই কিনা জানি নে।

লক্ষ্মীদাসীর মূল গায়েনকেও দেখতে পাই, চিনতে পারি নে। ভাবি লক্ষ্মীদাসীর মন্দিরের রাধারানী আর তেমন করে হাসে কিনা।

যাকে দেখতে পাই নে চিনতেও পারি নে, সে তো আমার ভিতরের অন্ধকারেই ঢাকা রয়েছে। সেখানে আলো কোনদিন পড়বে কিনা জানি নে।

কালকূট

মাঝে মাঝে মনে হয়, মন যেন এক সর্বনেশে যন্ত্রবিশেষ। বর্ষে বর্ষে ঋতু বদলায়, তার সঙ্গে রূপ বদলায় এই পৃথিবী। কত তার রূপ! কখনো দেখি জলশূন্য রিক্ত মাঠ, সহস্র ফাটল ফেটে চৌচির হয়ে আছে। সেই ফুটি-ফাটা মাঠের উপর দিয়ে পাগল হাওয়া হা হা করে ছুটে যায়। মনে করি, রিক্তা ধরিত্রী নিঃশব্দ কান্নায় গুমরে উঠছে। অগ্নিস্রাবী আকাশ। গাছে পাতা নেই, কলকাকলী নেই বিহঙ্গকুলের। বিশ্বসংসার জলছে নিরন্তর।

আবার দেখি, কোন অদৃশ্য লোক থেকে সহস্র ধারে আসছে বন্যা। আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি। ভেসে গিয়েছে মাঠ, সবুজ শস্যে ভরে উঠেছে তার বুক। সোহাগী গর্ভবতী হঠাৎ হাওয়ার শিউরিনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে হাসিতে।

মনের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে শূন্য। লোকে বলে, মনের মানুষ মেলে না। তাই কি! মনের সঙ্গে কোন দিন বোঝাপড়া করলাম না। শূন্য মন নিয়ে আমরা দিবানিশি ছুটে চলেছি বৈচিত্র্যের সন্ধানে। কী চাই জানি নে, পাওয়ার জন্য পাগল হয়েছি। তাই কেউ বলেছেন, 'বৃথা তারে খুঁইজে মরা মাটির এই বৃন্দাবনে।' কেউ বলেছেন, 'একবার—আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনারে চেনা।' মনের এই বিড়ম্বনার কথা আর-একজন বলেছেন,

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই নে।'

বৈচিত্র্যের সন্ধান, আমাদের মনেরই সন্ধান। মানুষ খোঁজার ছলে আমরা মন খুঁজি। তাই বন্ধু যখন বিদ্রূপ করে বললে, 'কেন যাচ্ছ কুম্ভ-মেলায়? ধর্ম করতে নাকি?' ধর্মের নামে যে হিসাবে ধার্মিক বোঝায়, আমি তা নই, আবার বিধর্মীও নই। আমরা সেই মানিকবাবুর 'লেবেল ক্রসিং'-এর নায়কের মত।

বললাম, 'দেখতে।'

'কী দেখতে? লক্ষ লক্ষ ধর্মান্ধ মানুষকে?'

ধর্মান্ধ! লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ধর্মান্ধ হয়, তবে খুঁজেই দেখি না কেন, লক্ষ মনের কোন চোখে পরানো আছে সেই ঠুলি। মনে পড়ছে এক প্রৌঢ়া বিধবার কথা। বাঙালী বিধবা। কুম্ভমেলার গঙ্গার উপরে এক ভাসন্ত সেতুর কোণে বসে ছিলেন আহ্নিক শেষ করে। সন্ধ্যা নামছে। আমিও যাচ্ছিলাম জলের দিকে। মহিলাটির গায়ে পা লেগে গেল। বাঙালীর ছেলে আমি। সসঙ্কোচে ক্ষমা চেয়ে হাত বাড়ালাম ওঁর দিকে। উনি তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে চিবুকে হাত দিয়ে সশব্দে আঙুলটি চুম্বন করলেন। স্বভাবতই অনেক কথা হল। ওঁর একটি কথা এখানে বলব।

কথার পিঠে কথা দিয়ে একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলেন। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন মেলার ভিড়ের দিকে। তারপরে বললেন, 'বাবা, মানুষ মিলে মেলা, মানুষের মেলা। যখন ভাবি, এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মেলায় আমিও একজন, তখন সুখে আনন্দে আমি আর চোখের জল রাখতে পারি নে।'

এখন মনে পড়ছে সে কথা। কিন্তু তখন বন্ধুকে বলেছিলাম, 'ধর্মান্ধ কিনা জানি নে, তবে মানুষ দেখতে যাচ্ছি। আমাদের সবকিছুতে সাধ মিটতে পারে। সাধ মেটে না মানুষ দেখে, মানুষ চেখে! মানুষের চেয়ে বিচিত্র এ সংসারে আর কী আছে?'

বুঝলাম, বন্ধু খুশী হয় নি। বিদ্রূপে বেঁকে ছিল তার ঠোঁট! অনেক তর্ক সে তখন করেছিল। এখন সে তর্কের কথা তুলে লাভ নেই। তর্ক করেও লাভ নেই। আমরা যা দেখি নি, যা পাই নি, তাই দেখবার ও পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। অজানা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সত্যি, অষ্টপ্রহর মানুষের সঙ্গেই বাস করি। মানুষের মত রূপ দেখি। কিন্তু যেখানে চলেছি, সেখানে আরও কত মানুষ, কত তার রূপ! যে প্রতি-বেশীকে বছরের পর বছর দেখেও কোন দিন চোখে পড়ে নি, পরিবেশের

গুণে তার বিচিত্র রূপ দেখে আমাদের মন ভুলে যায়। কী কথা! হাজার দিন দেখেও যে মন ভোলে না, সে একদিন সব ভোলে। মন চিনি না। তাই তো বারে বারে রূপ দেখি।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

এত রূপের ফেরে ফিরি কেন আমরা। মন খুঁজি। লক্ষ রূপের আরশিতে আমরা নিজের বৈচিত্র্যকে দেখি। এই বৈচিত্র্য হল নিরিখ, যাকে বলে কষ্টিপাথর। দাগ কাটো। সোনা কি লোহা, নিমেষে তা ফুটে উঠবে।

না, আর দেরি নয়। মন চলেছে আগে আগে, এবার পা চালিয়ে দিই। ডুব দেব লক্ষ হৃদি-কুম্ভ-সায়রে।

পিঠে নিয়েছি ঝোলা, হাতে নিয়েছি ঝুলি। কিন্তু হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরম দেখে চক্ষুস্থির। তবুও উঠতে পেরেছি, একসময়ে গাড়িও ছেড়েছে।

এক ফালি ছোট কামরা। জনা আটেকের বসবার জায়গা। কলকাতাবাসী এক উত্তরপ্রদেশের ছজনের পরিবার বসেছেন প্রায় দুটো সীট দখল করে। আমিও পেয়েছি খানিকটা। আরও জনা চারেক উপরে নীচে। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে।

ছজনের পরিবারের চালক যে যুবকটি, সে গোটা তিনেক স্টীল ট্রাঙ্ক সেঁটে দিল প্ল্যাটফরমমুখো দরজায়। দিয়ে আমার দিকে বীরত্বব্যঞ্জক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল। অর্থ পরিষ্কার। হেসে জবাব দেওয়া ছাড়া উপায় কী।

আমার আজানুলম্বিত কালো ওভার-কোট আর টুপি দেখিয়ে সে ইংরেজী-মিশ্রিত হিন্দীতে বলল, 'আপনাকে দেখাচ্ছে যেন মিলিটারি সেপাই। দরজার দিকে 'সিরিফ' কটমট করে তাকিয়ে থাকবেন। তাহলেই আর কেউ সাহস করে—'

শেষটুকু তার চোখের আধাবোজা হাসিতেই পরিস্ফুট। অতএব তার নির্দেশে আমি হলাম এ কুঠুরির আর-এক দিকের দ্বাররক্ষী। সন্দেহ ছিল নিজেরই, এ চোখের কটমটানিতে কেউ ঘাবড়াবে কিনা।

এই তো আমরা। কেউ বলতে এলে মন ভারী করি। অথচ সামান্য সুখের জন্য আমরা নিয়ত এমনি অভিনয় করে চলি। নিজের সঙ্গেও করি কি-না কে জানে!

কথায় জানলাম, ছজনের পরিবারের দেশ আজমগড় জেলা। ব্যবসাক্ষেত্র কলকাতা। গন্তব্য এলাহাবাদ, কুম্ভমেলা। আমি? আমিও একই পথের যাত্রী। হ্যাঁ? শুনে ভারি খুশী। যুবকটি লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ট্রাঙ্কের উপর। নাক ডাকাতে আরম্ভ করল কম্বল মুড়ি দিয়ে।

পরিবারের মা, মেয়ে আর বউ সামলে দিব্যি এলিয়ে পড়লেন আমার উপরে। ভগবান জানেন, কী খেয়ে ওঁর গতরখানি অমন ভয়াবহ হয়েছে। আমি বেঁকে রইলাম একটা চ্যাপটানো ব্যাগের মত। ওভারকোটের মহিমায় এত যে ফৌজী কায়দায় কটমট করে তাকালাম, সেদিকে কারুর হুঁশই নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকার ঐকতান শোনা গেল। কিন্তু নথ-নোলকপরা নাকগুলিও যে এমন মেঘগর্জন করতে পারে, তা কে জানত।

কয়েক হ্যাঁচকাতেই এক্সপ্রেসখানি গজলের দ্রুত রেলার মত বাংলাদেশ পেরিয়ে গেল। মুখ বাড়িয়ে দিলাম বাইরে। অন্ধকারের বুকে অজস্র আলোর সারি, যেন কচি শিশুর হাঁসকুটে চোর্খের মত। অন্ধকার মিহিজামের আলো। যন্ত্রনগরী চিত্তরঞ্জন। সীমান্ত বাংলার। কাঁথা-মাদুর-পচা ছেলে আমরা। বাইরে বড় যাতায়াত নেই। এইটুকুতেই মনে হল, দেশ ছেড়ে এলাম। এবার মহাদেশের পথে। মহামেলার পথে, লক্ষজনের মাঝে। সেই লক্ষজনের অকল্পিত বিচিত্র রূপ বিচিত্র নাদে আমার প্রতিটি ধমনীকে ডাক দিয়ে চলেছে। পথে কী আছে, কে জানে।

মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি কালো কঙ্কালের দুটি হাত। চমকে উঠলাম। সকলে নিদ্রামগ্ন। আমি প্রহরী।

কঙ্কালসার কম্পিত হাত দুটো অতিকষ্টে একটি কমলালেবু ছাড়াচ্ছে। এতক্ষণ মুখোমুখি দেখেছিলাম, সামনের সীটে একটি কম্বলের পুঁটুলি। এবার সেই পুঁটুলির মধ্যে দেখছি একটি মুখ। লিকলিকে ঘাড়ের উপর

বসানো একটি মাথা। গোঁফ-দাড়ি-গজানো শীর্ণ মুখ। কোটরগত চোখ। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল সেই চোখের চাউনি। গেঁড়িগুগলির মত একরাশ মাদুলি ঝুলছে কণ্ঠার কাছে।

নিঃসন্দেহে মানুষ। চোখাচোখি হতেই নিঃশব্দে হেসে উঠল সে। বালকের মত তার কোটরাগত চোখেও হাসির নির্ঝর। ঘাড় বাঁকিয়ে বলল হিন্দীতে, 'আমিও যাব, হাঁ।'

আমাকেই বলছে। অবাক হয়ে বললাম, 'কোথায় ?'

'কুম্ভমেলায় ? কেন, আমি যেতে পারি নে ?'

এই সামান্য জিজ্ঞাসায় তার চোখের ব্যগ্রতা দেখে আরও অবাক হলাম। কেন যেতে পারবে না। কিন্তু তার কথা শুনে আমার যেন সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি অসুখ করেছে ?'

সে কথার কোন জবাব দিল না সে। খানিকক্ষণ ধরে চিবুল কমলালেবু। তারপর আপনা থেকেই বলতে আরম্ভ করল। তার একটানা কণ্ঠস্বর একাত্ম হয়ে গেল ট্রেনের শব্দের সঙ্গে। বলল, বাড়ি তার বালিয়া জেলায়। কাজ করত কলকাতার শহরতলীর এক কারখানায়। সেখানে আছে তার বউ, তার ছেলেমেয়ে। বউও কাজ করে। না, তার চেহারা দেখে যেন বয়স ঠিক না করে ফেলি। বয়স তার মাত্র আটাশ। বউ তার বাইশ বছরের জোয়ানী অওরত। বেচারা তাকে খাওয়া-দাওয়া সবই দিচ্ছিল। সে যে বড় ভালো লড়কী। কিন্তু—

তার রুগ্ন চোখে ফুটে উঠল অসহ্য যন্ত্রণা। বলল, 'আর সহ্য হয় না এই ব্যামোর কষ্ট, তাই চলেছি কুম্ভমেলায়।'

বললাম, 'কেন ?'

এবার তার অবাক হওয়ার পালা। তার সেই কোটরগত বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন, তুমি জান না ? তবে তুমি কেন চলেছ ? জান না, অসুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেবতারা তাঁদের অমৃতকুম্ভ প্রয়াগ-সঙ্গমে লুকিয়ে রেখেছিলেন ?'

বললাম, 'শুনেছি।'

তেমনি মিষ্টি হেসে বলল, 'শুধু শোন নি, কেন দুনিয়ার মানুষ যায় সেখানে? কেন মহাপুরুষ সাধুরা আসেন সেখানে স্নান করতে? তাঁদের চেহারা দেখ নি কী সুন্দর! কী তার বাঁধুনি! কুম্ভযোগে সঙ্গমে স্নান করলে মানুষ শত বছর পরমায়ু পায়, রোগমুক্ত হয়। সেদিন যে সঙ্গমে অমৃতমন্থন হয়। তাই তো আমি যাচ্ছি।'

বলতে বলতে আলোকিত হয়ে উঠল তার কালো কঙ্কাল মুখ। বোধহয় খানিকটা উত্তেজনাও এসেছে তার। কিসের একটা বেগ ঠেলে আসছে তার হৃৎপিণ্ড থেকে। সে তাড়াতাড়ি আবার কম্বল মুড়ি দিল। কম্বলের ভেতর থেকে শুনতে পেলাম একটা ঘড়ঘড় শব্দ, তার সঙ্গে দেহাতী ভাষায় ছন্দিত ঈশ্বরের নাম।

ঘুমন্ত কামরা। বাইরে অন্ধকার। আকাশে অস্পষ্ট নক্ষত্র। গাড়িটা হুড়মুড় করে ছিটকে চলে গেল আরেকটা লাইনে। কত রাত কে জানে!

মিথ্যে বলে নি যুবকটি। ব্যর্থ হয় নি আমার প্রহরা। ফৌজের মতই বাধা দিয়েছি জন-বন্যার পাগলা গতি।

কিন্তু এই মানুষটি, ওই কম্বলের পুঁটুলিটি কী অপূর্ব! ভাবতে গেলাম, কিন্তু ভাবা হল না। লোকটির গা থেকে খসে পড়েছে কম্বল। বুকে হাত দিয়ে কাশছে ঘংঘং করে। কাশির ফাঁকে ফাঁকে বলছে রুদ্ধগলায়:

'উঃ, বড় তখলিফ বড় তখলিফ। এখন নয়, হে ভগবান! সে যে অনেক দূর, অনেক দূর।'

কী অনেক দূর! ভীত বিস্মিত হয়ে তার অসহ্য যন্ত্রণা দেখতে লাগলাম। বললাম, 'কী বলছ?'

সে বললে, 'খুলে দাও দরজা, জিঞ্জির খুলে দাও। প্রাণ গেল হে ভগবান! এখনো অনেক দূর।'

দরজা খুলে দেব! চাবুকের আঘাতের মত ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা বাইরে। দরজা খুলে দেব কি!

সে কাশতে কাশতে চেঁচিয়ে উঠল, 'খুলে দাও বাবু, খুলে দাও।'

কথা শেষ হল না। তার কম্বলের উপর কী যেন চকচক করে উঠল। তরল পদার্থ। রক্ত! রক্ত তার ঠোঁটের কশে। রাজরোগ যক্ষ্মা।

সে যে অমৃত-কুম্ভ সন্ধানের যাত্রী। সে যে শত বছর পরমায়ু-সন্ধানী। এ গাড়ি কি পথ ভুল করেছে!

আর আমি! কত কথা বলেছি নিজের মনে। অমৃতকুম্ভকে হৃদিকুম্ভ নাম দিয়ে চলেছি ছুটে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল, কোথায় পালাই। চোখের সামনে কিলবিল করছে জীবন্ত মৃত্যুবীজাণু। পালাও পালাও। বিচিত্রের সন্ধানী, অমৃতের সন্ধানী ভুল করে পা দিয়েছি যমের দোরে।

আশ্চর্য! কেউ উঠল না ঘুম থেকে। কাশির শব্দে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে শুল কেউ কেউ। আমি খুলে দিলাম দরজা। বুঝতে পারি নি যে, একটা স্টেশন এসেছে।

ছুটে গেলাম গার্ডের কাছে। গার্ড বললেন, 'কুড়ি মিনিট দেরিতে দৌড়ুচ্ছি আর এখনো রাত রয়েছে। কাকে বলতে যাব, বলুন। আপনি তার চেয়ে কামরাটা বদলি করে ফেলুন।' সেই ভালো। ওই কামরাটি ছাড়া আর সব কামরাতেই আছে অমৃত-কুম্ভ। মৃতসঞ্জীবনী। এসে দেখি, ভয়ানক ব্যাপার। ফৌজ নেই দরজায়, বিনা বাধায় ঢুকছে সব বেনো জলের মত। প্রায় কুড়িখানেক। মাথার উপরে মাথা। অন্ধকূপ হত্যার জীবন্ত ছবি।

চেঁচিয়ে মারামারি করে কোনরকমে নেমে এলাম নিজের ঝোলাঝুলি নিয়ে। কিন্তু কেউ দরজা খোলে না। আমি এক দ্বাররক্ষী, পড়েছি অনেক রক্ষীর হাতে। কেউ কথাই বলে না। কিন্তু পড়ে তো থাকতে পারি না। মন তো আবার বলছে, চলো চলো।

গাড়ি ছেড়ে দেয়। ছুটে গিয়ে উঠলাম একটা আপার ক্লাস কামরায়। তীরের মত ছুটে এল কয়েক জোড়া আধ-ঘুমন্ত চোখের বিরক্ত সন্দেহান্বিত দৃষ্টি। গুটিকয়েক অবাঙালী মহিলা ও পুরুষ। অস্ত্র ছিল একটি। পরিষ্কার ইংরেজীতে বললাম, 'একটু বিপদে পড়ে উঠে পড়েছি। যাব এলাহাবাদ। সুযোগ পেলেই নেমে যাব, আপনাদের কষ্ট দেব না।'

চেহারা দেখিয়ে সব সময় বোঝানো যায় না। কথা শুনিয়ে অনুমান করাতে হয়। একটু একটু করে বিরক্ত চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল। তারপর একটু বা কৌতূহল। তারও পরে আপার ক্লাস গদির সামান্য একটুখানি জায়গার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেতের করুণা।

দাম আছে এই অপ্রত্যাশিত করুণার। করুণা কেন। সভ্যতাই বলা যাক না। বুঝলাম, দুটি পরিবার রয়েছে কামরাটিতে। একটি পরিবার অন্ধ্রের, আর-একটি মধ্যপ্রদেশের। জায়গা দিলেন অন্ধ্রের এক ভদ্রলোক। এঁরা তীর্থযাত্রী। কলকাতার কালীঘাট দর্শন করে চলেছেন প্রয়াগসঙ্গমের কুম্ভমেলায়। ঘুরেছেন আরও অন্যান্য জায়গায়। প্রয়াগ হয়ে চলে যাবেন দেশে। অনেক কথা হল। বললেন, 'আফসোস রয়ে গেল, কল্যাণী কংগ্রেস দেখা হল না।'

সে আফসোস ছিল আমারও। কিন্তু একটা দেখতে গেলে আর-একটা ছাড়তে হবে, উপায় কী। তারপর ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'আপনি কেন চলেছেন প্রয়াগে?'

ভদ্রলোকেরা তিন ভাই। তিনজনেই অদ্ভুত কালো। যাকে বলে নিকষ কালো। মাথার চুলও তিনজনেরই ঘন কুঞ্চিত। সঙ্গে বড় ভাইয়ের বউ। আজানুলম্বিত বেণী ঝুলে পড়েছে সীটের নীচে। দুটি কানে গুটি আটেক সোনার মাকড়ি, নাকের দুদিকে দুটি নাকছাবি। ঘোমটা নেই। কিন্তু ইংরেজী জানেন বলে মনে হল। তাঁরা তিন ভাই ও এক ভাজ, চারজনেই আমার জবাব শোনার জন্য মুখের দিকে তাকালেন।

লজ্জা পেলাম। বললাম, 'কেন, যেতে নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ইয়ংম্যানেরা তো এ সব বড় একটা—'

বললাম, 'পছন্দ করে না বলছেন তো? ঠিকই। আমিও মাথা মুড়োতে যাচ্ছি না। দেখুন, আমাদের জীবন বড় সীমাবদ্ধ। গণ্ডীবদ্ধ জীবনদর্শনের কচকচি নিয়ে আমরা দিনগত পাপক্ষয় করি। কিন্তু নিজের দেশের কতটুকু জানি। দেখেছি কতটুকু। আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ যা নিয়ে মরে বাঁচে (তা ভালো কি মন্দ জানি নে), সে তার জাতীয় বিশেষত্ব নিয়ে

যেখানে মিলিত হয়, যেখানে আমাদের সমস্ত জাতি হাসে কাঁদে গান গায়, তাকে ইয়ংম্যান হয়ে আমি অবহেলা করব কী করে। যদি আমার হাসি পায়, তবে আমি হাসব কাঁদব। যদি নুয়ে আসে মাথা, তাকে আমি মিথ্যে অহঙ্কার দিয়ে জোর করে তুলে ধরব না। আর যদি থাকতে পারি নিরাসক্ত, তা-ই থাকব। এত বড় দেশ, এত মানুষ, কত তার বৈচিত্র্য! আপনাদের দেখব বলেই তো এসেছি। না এসে পারলাম না।'

আবার সেই বিচিত্রের কথা। ধক করে উঠল বুকের মধ্যে। এই একই গাড়ির কয়েকটা বগীর পেছনে রয়েছে সেই মানুষটি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তার সেই যন্ত্রণাকাতর মুখ। এতক্ষণ কী করছে সে। কেমন আছে।

এঁরা আমার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন কি-না জানি না, বিস্মিত হয়েছেন বুঝলাম। কিন্তু আমার আর কথা বলতে ইচ্ছা করল না। এঁদের কৌতূহল ছিল অনেক, মেটাতে পারলাম না আর।

কাচের সার্শির বাইরে দেখছি আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। গাড়ি এসে দাঁড়াল মোকামাঘাটে। নেমে গেলাম প্ল্যাটফরমে। নীচু প্ল্যাটফরম। উত্তুরে হাওয়া দুরন্ত ঝাপটা মারছে। গায়ের মোটা ওভারকোটটা পর্যন্ত পাতলা কাপড়ের মত উড়তে লাগল।

বিহারের চেহারা এখন শ্যামল। দিগন্তবিসারী মাঠে ছোলা আর মটর। অড়হরের কিশোরী ডগা দোলাচ্ছে মাথা। মাথা তার হলুদ ফুলে গিয়েছে ছেয়ে।

গাড়ির পেছন দিকে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। আর-এক বার চমকে উঠল বুকের মধ্যে। লাল কাঁকরের উপর শোয়ানো রয়েছে সেই মানুষটি। অমৃতসন্ধানী। মুখটি খোলা। শরীর ঢাকা কম্বলে। সে যেন চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে।

মনে পড়ছে তার সেই বালকের মত আবদারের স্বর, 'আমিও যাব।' কেন? না, বাঁচবার জন্য।

আমার যাত্রাপথের প্রথমেই বিচিত্র এই মৃত্যুদৃশ্য। কে জানত, অমৃত-সন্ধানীর পেছনে পেছনে মৃত্যু এসে এই কামরাটায় ওত পেতে ছিল

সুযোগের অপেক্ষায়। তাই সে বার বার বলেছিল, 'হে ভগবান, সে যে এখনো অনেক দূর।'

কতদূর! গাড়ির দরজায় দরজায় কুম্ভযাত্রীর মারামারি, চিৎকার, হল্লা। সবাই যাওয়ার জন্য পাগলের মত ছটফট করছে। তুমি হেরে গেলে, তুমি পড়ে রইলে। সে যে এতদূর, তা আমিও জানতাম না। তোমার হয়ে আমি হাজারটা ডুবও যদি সঙ্গমে দিই, তাহলেও তোমার আশা আর কোনদিন মিটবে না। তুমি পড়ে থাক, আমাদের পরমায়ু নিয়ে আমরা ছুটে চলি। এটাই নিয়ম।

সত্যি, এ নিয়মও বড় বিচিত্র।

কত সুখ দুখ আসে নিশিদিন
কত ভুলি কত হয়ে আসে ক্ষীণ।

নইলে বাঁচতাম কী করে। মনে পড়ে, একটা আধপাগলের মুখ থেকে একবার শুনেছিলাম, 'শুনি, পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। জল আমাদের দুঃখ, স্থলটুকু আমাদের সুখ।'

সেই অপার দুঃখকে ভুলে থাকা ছাড়া উপায় কী? সামান্য সুখের মুখ দেখলেই দুঃখ ভুলে যাব।

তাড়াতাড়ি সেই আপার ক্লাসে এসে তুলে নিলাম নিজের ঝোলাঝুলি। অন্ধের বড় ভাই বললেন, 'কোথায় চললেন?'

বললাম, 'আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, এবার নেমে যাই।'

'কেন, বসুন না। শুধু শুধু আর কামরা বদলি করে কী হবে। একেবারে এলাহাবাদে গিয়েই নামবেন।'

ভাবলাম, উনি হয়তো জানেন না যে, আমার তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট। বললাম, 'উপায় নেই, থার্ড ক্লাসের টিকেট।'

কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই নামতে দিলেন না। মনে হল, তাঁদের সমস্ত পরিবারটিই নামতে দিতে চান না। চোখমুখ কুঁচকে ভদ্রলোক এমন একটি ভাব করলেন, যেন সামান্য টিকিটের জন্য আবার এত ভাবনা কিসের।

কিন্তু আমি তো জানি, কালো-কোটধারী একজন সামান্ত রেলকর্মচারী সময় বিশেষে কী দারুণ বিভীষিকা। অপমানের ভয়টাই বড়। তা ছাড়া আর কী।

তবু বসতে হল ভদ্রলোকের আগ্রহে। বুঝলাম, ওদিকের মধ্য-প্রদেশের পরিবারটি রুষ্ট হয়েছেন। রুষ্টতার সঙ্গে কিছুটা বিদ্রূপ।

সমুদ্রোপকূলবর্তী প্রদেশের মানুষগুলো বোধহয় একটু বেশী সেন্টিমেন্টাল। নাকি ইংরেজীতে যাকে বলে 'টাচি', বোধহয় তাই। অর্থাৎ আবেগ-প্রবণ। সেই আবেগপ্রবণতা মধ্যপ্রদেশের লোকের কাছে ন্যাকামো মনে হতে পারে। আমার উঠে যাওয়াতেই বা কী এমন ভদ্রতা প্রকাশ পেত।

কিন্তু এক-একটা সময় আসে, যখন মনকে দিয়ে যা খুশি তাই করাতে পারি নে; অন্ধ্রের ভদ্রলোক আলোচনা পেড়ে বসলেন ধর্মতত্ত্বের। অথচ মন পড়ে রইল মোকামাঘাটে। মোকামাঘাটের বিছানো লাল কাঁকরের বুকে, যেখানে শুয়ে রয়েছে আমাদের অনেকের সহযাত্রী। তা ছাড়া ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় আমার অধিকারই বা ছিল কতটুকু।

পায়ের কাছেই দেখছি ছেঁড়া কম্বলে ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে একটি মানুষ। বেরিয়ে আছে শুধু মুখটি। ঘুমন্ত মুখ। বয়স ঠাওর করা মুশকিল। মুখের উপর ছড়িয়ে আছে একরাশ রুক্ষ চুল। ভাবলাম, এদেরই কারুর চাকর-বাকর হবে।

গাড়িটা হঠাৎ লোকালের মত থামতে থামতে চলেছে। শত হলেও পশ্চিম দেশ। ভোরের আলোয় যাকে দেখেছিলাম শ্যামাঙ্গিনী, রৌদ্রালোকে দেখলাম, শ্যামাঙ্গিনী কিঞ্চিৎ রুক্ষ। যত দূরে চোখ যায়, শুধু জনহীন মাঠ আর মাঠ। অড়হর, কলাই, মুগ আর মুশুরির মাঠ ঠেকেছে গিয়ে আকাশের গায়ে। মাঝে মাঝে হঠাৎ ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে উঠছে গ্রাম। এ গ্রাম কালকাসুন্দের বনঝোপ আর আম-জাম-সুপুরি-নারকেলের ছায়াশীতল গ্রাম নয়। আমবাগান আছে বটে, থোকো থোকো কাঞ্চন-বরনী বোলে ভরে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। আর আছে তালবন। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাটির দেয়াল আর খোলার ছাউনি-দেওয়া বস্তি।

অঙ্গের ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'আপনি বোধহয় আমার কথা ঠিক ধরতে পারছেন না। না, না, আমি আপনাকে খুব বড় কথা কিছু বলছিলাম না। আমি শুধু আপনাকে—' বলতে বলতে থেমে গেলেন। নিতান্ত হুঁ হাঁ দিয়ে কাজ সারছিলাম। লজ্জা পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি, তিনি আপন মনে মাথা নাড়ছেন। মাথা নামিয়ে বসে আছেন দুই ভাই। আর তাঁর স্ত্রী তাকিয়ে রয়েছেন বাইরের দিকে। কিন্তু কিছু দেখছেন না। মন-চোখ তাঁর এদিকেই। চোখ দুটি ছলছল করছে। লজ্জিত করুণ মুখে সামান্য হাসির আভাস জোর করে ফুটিয়ে রেখেছেন তিনি।

তাঁরা চারজনেই যেন বড় বিমর্ষ হয়ে উঠেছেন। মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'হ্যাঁ, আপনি বলছিলেন, উপনিষদে যে সমস্ত প্রাকৃত—

'না, না, অত বড় কথা আমি বলতেই পারব না। আমি বলছিলাম', এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন তিনি, 'জানেন, আমাদের এই চারজনের পরিবারটি একেবারে অভিশপ্ত। আমি নিজে একজন সরকারী কর্মচারী, আমার ভাই দুজনও তাই। আমাদের অর্থের অভাব নেই। শুধু একটি অভাবে আমরা সর্বহারা হয়েছি, আমরা পাগলের মত ঘুরে মরছি সারা দেশ। এই আমাদের কুলগুরুর নির্দেশ।'

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তিনি। উত্তেজনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হু হু রক্ত ছুটে আসছে তাঁর স্ত্রী মুখে। স্বামীর দিকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। বোধহয় নিরস্ত করতে চাইছিলেন স্বামীকে। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারছিলেন না।

আমার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আশ্চর্য! মনে হল তাঁর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। তাঁর দক্ষিণী সমুদ্রের অতল ডাগর চোখে ঝিকমিকিয়ে উঠল অশ্রুর মুক্তাবিন্দু। সপ্তরশ্মি খেলে গেল তাঁর গ্রাম্য নারীর মত কানে পরা অনেকগুলি পাথরখচিত কর্ণভূষণে। ক্লান্ত কালনাগিনীর মত পিঠের উপর এলিয়ে পড়ে রইল রুক্ষ বেণী।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভুলে গেলাম কুম্ভ-সহযাত্রীর কথা। কৌতূহলপূর্ণ মন নিয়ে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলাম, তিন ভাই ও এক বউয়ের দিকে।

বড় ভাই তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই চুপ করে গিয়েছিলেন। আবার বললেন, নীচু গলায়, 'জানেন, প্রয়াগের আর-এক নাম তীর্থরাজ। এইবারই আমাদের শেষ, আমাদের আশা-নিরাশার পরীক্ষার শেষদিন এগিয়ে আসছে। এইবারই আমাদের সমস্ত সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। সংসার পাতবে আমার ভাইয়েরা আর আমার—

তাঁকে বাধা দিয়ে এক ভাই নিতান্ত দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলে উঠলেন। মনে হল, তাঁর স্ত্রীর বিষয়ে কিছু বললেন। তিনিও স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বললেন। কিন্তু মহিলাটি কোন জবাব দিলেন না।

আমি যেন এক রহস্য-নাটকের বিস্মিত নীরব দর্শক। ভদ্রলোক এবার হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'আপনি বলছিলেন অনেক কিছু দেখতে চলেছেন আপনি। আপনার দুর্ভাগ্য যে, আমার মত একজন লোকের সঙ্গেও আপনার আলাপ হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না। আমি আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত একটা কথা আমাকে বলছিলাম।'

সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে আমি বললাম, 'কিন্তু আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারি নি।'

তিনি বললেন, 'ক্ষমা করবেন। আমার স্ত্রীর বড় কষ্ট হচ্ছে। আপনি আসবেন আমাদের ক্যাম্পে।—পাণ্ডার কাছে আমাদের খবর পাবেন। আপনি এলে আমরা খুব খুশী হব।' বলে তিনি আমাকে সিগারেট দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। তাঁর স্ত্রী তাকালেন শান্ত চোখে কৃতজ্ঞতা নিয়ে। তাঁর আত্মভোলা স্বামীর দিকে, আর আমার দিকে। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধহয় আর কৌতূহল না প্রকাশ করার জন্য।

বুঝলাম, ভদ্রলোকের ধন মান ও বিলাসের তলে বুকে একটি পাথর চেপে আছে। নিজের অজ্ঞাতসারে কয়েক মুহূর্তের জন্য সরে গিয়েছিল সেই পাথর। মন পেতে বসেছিলেন এক অপরিচিত নগণ্যের কাছে।

· মন পাতা হল, মনের কথা হল না। এখানে পরস্পরকে গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কী। ভবিষ্যতের আশা রইল কি-না কে জানে। আশা এইটুকু, পথের দেখা পথেই শেষ হবে না। আমরা সকলেই চলেছি এক মহাসঙ্গমে। সেখানে হবে মিলন, তারপরে বিদায়। মিলনমুহূর্তে এক হয়ে যায় হাসি-কান্না। সেই হাসি-কান্নার কলরোলে যদি শুনে নিতে পারি তাঁর কথাটি, সেইটুকু লাভ।

এখন শুধু মনে রইল, তাঁদের পরিবারের মধ্যে একটা ট্র্যাজেডি লুকিয়ে আছে। তারই প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরছেন তাঁরা। প্রায়শ্চিত্তের শেষ দিন আগত। গরলে হবে অমৃতের উদ্ভব। ভরে উঠবে তাঁদের তিন ভাইয়ের সংসার।

এমনি ভরিয়ে তোলবার জন্য ছুটে চলেছে লক্ষ মানুষ। লক্ষ জনের লক্ষ রকম কামনা। আমিও চলেছি তেমনি এক কামনা নিয়ে।

কিন্তু আর কতদূর। পুব আকাশের কোল ঘেঁষে দেখা দিয়েছে বিন্ধ্যাচলের উঁচু-নীচু মাথা। বেলাও হয়েছে মন্দ নয়।

পায়ে মৃদু চাপ অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখি, পায়ের কাছে শোয়া সেই মানুষটি। মুখের চুল সরিয়ে ধূলি-রুক্ষ মুখ ভরে হাসছে। তাকাতেই ওই অবস্থাতেই কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলে।

অবাক হলাম! এদের কারুর লোক নয় নাকি। বললাম, 'কিছু বলছ আমাকে?'

যেন সে কতকালের পরিচিত। এমনি হেসে বলল, 'আর কাকে বলব বাবা? একটা বিড়ি দেন।'

প্রথমেই বিড়ি, তাও ভাবার প্রাণের ভাষায়। অর্থাৎ বাঙলা কথায়। বুঝলাম, এদের কেউ নয়। বললাম, 'এখানে উঠলে কী করে?'

হেসে বললে, 'উঠি নি, উঠিয়ে দিলে নোকেরা। কাল রাত্রেই আপনার মুখখানি দেখে মনে হয়েছিল, এ মুখ আমার চেনা মুখ। এখন দেখছি, ঠিক তাই!'

'চেনা মুখ? কী করে চিনলে?'

'কেন। এই তো এতগুলোন মুখ রয়েছে। আমার দেশের মানুষের মত মুখখানি আর ক্যার আছে, আপনি বলেন।'

ভাবলাম, ধন্য তোষামোদ। কী ভাগ্যি বলে নি বাড়ির কাছের মানুষ। বিড়ি তো নেই। প্রাণ ধরে দিলাম একটা সিগারেট।

তার কালা মুখের হাসিটি আরও মধুর করে বলল, 'ছিরগেট দিলেন? তবে এট্টুস নিধমের হাতটা ধরুন, উঠে বসি।'

নিধম মানে অধম করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু হাত ধরে ওঠাতে হবে কেন বুঝলাম না। বললাম, 'কেন?'

তেমনি হেসে পায়ের উপর থেকে তুলে নিল ছেঁড়া কম্বলটা। দেখলাম, পা-দুটো হাঁটুর কাছ্ থেকে বেঁকে ঠেকে রয়েছে পাছার কাছে। উঠে বসতে হয়তো পারে, তবে অবলম্বন চাই।

হাত বাড়িয়ে দিলাম। উঠে বসল সে। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'রাস্তায় বসে করে খাচ্ছিলে, আবার পথে পথে কেন?'

'রাস্তায়?' হাসতে হাসতে বলল, 'ভিক্ষের কথা বলছেন? তাই-ই, তবে রাস্তায় তো বসি নি কখনো। পড়ে থাকতেম এক কোণে। রাস্তা আর পথ, যা-ই বলেন, এই পেথম। থাকতে পাইরলাম না কিছুতেই। দ্যান, দিয়াশলাইটা দ্যান।'

দেশলাই দিয়ে বললাম, 'যাওয়া হবে কোথায়?

'যেখেনে সব্বাই চইলছে, সেইখেনে। পেরাগের মেলায়।'

'আসছ কোত্থেকে?'

'নদে জিলা। আমঘাটার নাম শুইনছেন, নবদ্বীপের কাছখেনেই? সেইখেনে নক্কীদাসীর আখড়ায় নাম গান করি। আমিই মূল গায়েন।'

বললাম, 'বৈষ্ণবেরাও কুম্ভের মেলায় যায়?'

সে কপালে তাড়াতাড়ি হাত ঠেকিয়ে বলল, 'আরে-বাপরে, বোষ্টম যাবে না তো যাবে কে? তীত্থখানি তো বোষ্টমের। ভাগাভাগির কথা যদি বলেন, অন্য মতের সাধকেরা তো জোর করে ভাগ বইসেছে। শিবভক্তরা আইসবে বটে, তবে বিষ্টুভক্তি না চাইলে পেরাগের মাটি আপনার পেন্নাম নেবে না।'

নাকমুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এটা হল ঝগড়ার কথা। এ কথা বাদ দেন। ওঁয়ার কাছে, ভাগাভাগি নাই, জাত নাই! যানার কাছে এলেম, তারে না ডেকে দলের মারামারি করে লাভ?'

বললাম, 'এলে তো, ওই পা নিয়ে যাবে কী করে?'

সে হাসল। হাসি তার মুখের ভূষণ। অনর্গল ধোঁয়ার জালের আড়ালে দেখলাম ভিজে-ওঠা চোখ দুটো মুছে নিল। বলল, 'বাবু, আমার নাম মা-খেগো বলা। অর্থাৎ কিনা বলরাম। আমারে জন্মো দিয়ে মা আর সামলাতে পারে নাই, মরে গেছিল। এই পা দুটোর জন্যেই। জন্মো-লুলা বইসে ছিলেম, কবে সেদিন আইসবে, যেদিন বেরিয়ে পড়ব। তা এই পা দুটোর জন্যে পড়ে থাকতে বলেন? বুকে হেঁটে যাব।' বলে সে গলা ছেড়ে গান ধরে দিল,

অগো আইসবে বলে
পথের মাঝে জীবন কেটে গেল,
তুমি এমনি খেলা খেল।
সবুর-মেওয়া রইল মাথায়,
চইলব এবার যথায় তথায়,
রোদবিষ্টি আশীর্বাদী
আমার মাথায় ঢেলো॥

সকলেই কিছুটা চমকে উঠেছিলেন, আমিও। কিন্তু মা-খেগো বলার গলাটি এমনি উদার ও মিষ্টি যে, ভেসে গিয়েছিলাম। লক্ষ্মীদাসীর আখড়ার মূল গায়েন বলে আর অস্বীকার করার উপায় ছিল না বলরামকে!

বোধহয় গানটা আরও বাকি ছিল। মধ্যপ্রদেশের সগুম্ফ বিরাটকায় ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ক্যায়া, অভি গানা ভি শুরু কিয়া?'

বলরাম হাত জোর করে বলল, 'আজ্ঞে, কী বললেন কর্তা?'

'উসব কতা ফতা নহি জানতা। গানা বন্দ কর।'

অজেয় হাসি বলরামের। বলল, 'আচ্ছা বাবু, আর করেগা নেই।'

আমি তাকালাম অন্ধের পরিবারটির দিকে। তাঁরা তাকালেন আমার দিকে। একটা চাপা ও অর্থপূর্ণ হাসি বিনিময় হল আমাদের মধ্যে।

বড়ভাই বললেন, 'আপনি এই বাঙালী ভিক্ষুকটিকে চেনেন?

বললাম, 'না। চেনা হয়ে গেল।'

বলরাম আমাকে আবার ডাকল, 'বাবু।

বললাম, 'বলো।'

'বাবু মুনিঋষিরা কথা না কইয়ে জীবন কাটিয়ে দেন। আর আমরা। কাল রাত থেকে মুখ বন্ধ। আর চুপ কইরে থাকতে পারি না। আমার কষ্ট হইবে, সেই ভেবে নক্কীদাসী আমারে এই বাবু-কামরায় উঠিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তুন, নক্কী যদি নরকে থেকেও সঙ্গে নিয়ে যেইত, তবে বাঁচতাম।'

বললাম, 'লক্ষ্মীদাসীকে ছাড়া বুঝি থাকতে পার না?'

বলরাম হাসল মাতালের মত। বলল, 'বাবু, পা দুইখান নাই, কিন্তুন মানুষ তো। তাই মানুষ ছাড়া থাইকতে পারি না। থাইকলে নিজে নিজে গান গেইয়ে নিজের পরান তোষ করি। যাচ্ছি পেরাগে, জাগ্রত বেণীমাধবের ঠাঁই। ওঁয়ার কাছে নক্কীদাসী, আপনি, সব্বাই যাচ্ছেন, সব্বারে পাব সেখানে। ওই যে বলে না,' বলে সে চাপা গলায় গুনগুনিয়ে উঠল,—

'মাত্তর দুদিন রইলে কাছে।
মনে কষ্ট হয় পাছে,
তাই, যাবার সময় বইলে গেলে
আরশিখানি লয়ে কোলে
দেখিস, সে তোর বুকে আছে।'

বলে সে তার নিজের বুকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

বললাম, 'বলছ বোষ্টম। গানে তো দেখছি পাক্কা বাউল।'

বলরাম খপাত করে পায়ে হাত দিয়ে বলে উঠল, 'খাঁটি কয়েছেন। আপনি জানেন, জানেন সব। যাবার কথা শোনা ইস্তক মন বাউরা হইছে। আজ পথে আসছি, আর চাইপতে পারি না মনটারে। বাবু, বৈরাগ্য এইলে

বৈরাগী হয়। আসলে আমরা সব্বাই বাউল। সব গানেতেই আপনি ওইটি পাবেন। আবাগী রাইকিশোরী যে প্রেমে পাগল হইয়ে পথে পা দিছিল, সেও তো একই ব্যাপার।'

তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে বললাম, 'পা ছাড়ো হে।'

'কিন্তুন বাবু, আপনি নিচ্চয় গুণী মানুষ। আমারে দুই-একখানা পদ শোনান।'

বলরামেরা এমনিতেই পাগল। তাদের খ্যাপালে আর রক্ষে নেই। বললাম, 'পাগলামি কোরো না বলরাম। আমি গুণী নই, গানও গাইতে জানি নে।'

কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না, বলরাম আমার এই নীরস শহুরে বস্তুতান্ত্রিক মনকে ভাসিয়ে নিয়েছে তার নিজের স্রোতে। আমার পথের ক্লান্তি, আমার এতক্ষণের ছোটখাটো সুখদুঃখ, সব ডুবিয়ে দিয়েছে সে। আমার জমকালো ওভারকোটটাকে রেয়াত করল না একটুও। বাবুর মত মানল না বাবু বলে। বিকলাঙ্গ বলরাম সমস্ত আড়ম্বর ও আবরণের ভেতর থেকে টেনে বের করে দিল আমার শুষ্ক দেহের ভেতরের মনটাকে। নিজের সঙ্গে তার তুলনা করতে গেলে কোথায় ঠাঁই পাব জানি না। কিন্তু, অন্ধ সংস্কারের বশেই কি বিকলাঙ্গ বলরাম এমনি নিয়ত হেসে গেয়ে মূর্তিমান আনন্দের মূর্তি হয়ে উঠেছে? বিশ্বাস করতে মন চায় না। কুসংস্কারের এক চিমটি বেলুনে-ঠাসা জীবন তো এ নয়। না-থাকা ও না-পাওয়ার বেদনা বলরামের প্রাণে তাড়া দিয়েছে। তাড়া দিয়েছে প্রেম-সন্ধানের, ভালবাসার। বলরাম ভালবাসে জগৎ সংসারকে।

বলরাম কিন্তু আমাকে ছাড়ল না। সে তেমনি গুনগুন করে চলেছে, 'পথের ধুলো সোনা হইল, এবার চোখের জল দিয়ে রসকলি কাটব। তোমারে ছেইড়ে তো দিব না।'

গান ছেড়ে আবার কথা আরম্ভ করল, 'আর ভাবব না, সে কতদূর। গাড়ি তো একসময় থামবে। সময় হইলে আপনি নামিয়ে দেবে। কী বলেন বাবু, অ্যাঁ?' বলে আবার গান,—

‘সবাই বলে যৈবন জ্বালা,
তবে এ যৈবন যাক চলে যাক।
কী হবে এ কালো কেশে, নীল বেশে
এই পোড়া অঙ্গ তোমার চরণ পাক।’

কী ভাগ্যি, গলা নামিয়ে গাইছিল। মধ্যপ্রদেশের ভদ্রলোকের তন্দ্রা ভাঙছিল না তাতে। অন্ধের পরিবারটি অবাক হয়ে পাগলামি ও পাগলামির দর্শককে দেখছিলেন। বললাম, ‘বলরাম, তোমার প্রথম গানটি বেশ। কার গান ওটি?’

‘বাবু, ও পদ আতাউলের। আতাউল বাউল তার নাম।’

বললাম, ‘তোমাকে একটা গানের লাইন বলি আমি শোনো। তোমার ওই গানের মতই যেন এটিও।—

‘কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে,
আমি চলব বাহিরে
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে
আর সময় নাহিরে॥’

বলরাম আবার আমার পায়ে হাত দিতে এল, ‘তবে নাকি জানেন না? আর কবে সে আসবে, সেই আশায় আমি মরা পা নিয়ে বইসে থাকব। বাবু, পেরাগের সঙ্গমে কি আর হাঁড়ি-ভরা মধু আছে? তা নেই। আছে অমর্ত। অমর্ত-কুম্ভ যে। সে অমর্ত, প্রেম-অমর্ত, ডুবলে পরান শীতল হবে। বা-বা! বা-বা! কী সোন্দর পদ! পদখানি ক্যার বাবু?’

কার পদ! আশ্চর্য! কুম্ভমেলা যাবার পথে কবিগুরুর গান নিয়ে যে এমনি এক মা-খেগো বলার সঙ্গে আলাপ করতে হবে, তা কে জানত! আর কেমন করেই বা তাকে সে কথা বলব।

বললাম, ‘পদকর্তার নাম রবি ঠাকুর।’

আলোয় আলো হয়ে উঠল বলরামের চোখ, ‘র-বি ঠাকুর! ঠাকুর তো বটেই, রবিও বটে। নইলে এমন পদ বেরোয়? তা উনি কোথাকার বাউল বাবু?’

কোথাকার বাউল! হায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ! বলরাম তোমাকে

কোথায় টেনে নিয়ে এল। তার বুকে ঠাঁই দিয়ে তোমাকে সে খাটো করল কি না বুঝলাম না। বললাম, 'কলকাতা।'

বলরাম বলল, 'তা হোক। কেঁদুরির জয়দেবের মেলায় নিশ্চয়ই দেখেছি ওঁয়ারে, এখন মনে নাই। পোষপূর্ণিমেতে সব বাউল বাবাজীকে ওখেনে আসতেই হবে কি না একবার।'

জানি, এক কথায় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে পারব না আমি। দু-কথায় রবি ঠাকুরের কল্পিত বাউল-মূর্তি অদৃশ্য হবে না বলরামের মন থেকে। আবার এও ভাবি, বলরামের ভুলই বা কোথায় যে, ভুল ভাঙব। মন যাঁর বাউল হয় নি, তিনি বাউল গান গাইলেন কেমন করে।

আচমকা ঝড় এল। ঝড়-ই বলি। হঠাৎ একটা তুমুল গণ্ডগোল আর তার সঙ্গে শিলাবৃষ্টির মত কামরাটার মধ্যে এসে পড়তে লাগল বাক্স, প্যাটরা, বোঁচকা, পুঁটুলি। প্রতিবাদের অবসর ছিল না। অবসর ছিল না তাকাবার। যে যার মাথা বাঁচাতেই ব্যস্ত। তার সঙ্গে একটা বাজখাঁই মহিলাকণ্ঠের চিৎকার, 'শ্যামা! প্রেমবতী! ইধার, ইধার মে। বূঢ়া কো উঠাও। পাতিয়া, এ পাতিয়া। ছোকরি বহেরা হো গয়ী। শুনতি কী নহি? শ্যামা, হাঁ হাঁ, তু কোণে চলা যা।'

মনে হল আমার ঘাড়ের উপর একটা দু-মোনী বোঝা পড়ল।

তারপর ব্যাপারটা যখন একটু শান্ত হল, তাকিয়ে দেখি, পিঠের কাছে মস্ত বস্তা। বস্তার উপর হয় প্রেমবতী, নয় শ্যামা কিংবা পাতিয়া। তার পায়ের কাছে জুজুবুড়ির মত এক ঘাড়-নোয়ানো বুড়ো। দরজার কাছে দুটি যুবতী আর এক প্রৌঢ়া। বুঝলাম ওই প্রৌঢ়ার-ই কণ্ঠস্বর আমি শুনেছি এতক্ষণ। তারা সকলেই মাল সাজাতে ব্যস্ত। বোধহয় উঠতে পারার আনন্দেই মহিষাসুরমর্দিনীর মত আমার ঘাড়ের উপরে মহিলাটি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'আরে বাপরে, গাড়ি মে উঠনা এক আজীব কাম হ্যায়।'

ওদিকে মধ্যপ্রদেশের পরিবারটি যুদ্ধং দেহি অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উন্মুখ। অন্ধ্রের পরিবারটিও সামলাতে ব্যস্ত।

গাড়ি ছেড়ে দিল। তারপরেই আসল যুদ্ধ শুরু। মধ্যপ্রদেশের সেই ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠতেই নতুন দলের প্রৌঢ়া গলা সপ্তমে উঠিয়ে আরম্ভ করল। যা বলল, তার বাঙলা করলে এই হয়, 'থার্ড ক্লাসের টিকিটই হোক, আর-যা-ই হোক, আমি চড়বই। নিয়ে এসো তোমার পুলিস আর মিলিটারি। আমাকে মারুক আর কাটুক, আমি কিছুতেই পড়ে থাকতে পারব না। টাকা নেই বলে কি আমি তীর্থটুকুও করতে পারব না। খালি তোমরাই যাবে। উঠেছি তো বটেই, এবার তোমার যা খুশি তাই করো।'

তার কথার ফাঁকে ওদিকে দুই যুবতী কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। আমার ঘাড়মর্দিনীও যুবতী। কিন্তু আমার শক্তির তো একটা সীমা আছে। অবাক হয়ে অবশ্য এও ভাবছিলাম যে, যাবে তীর্থ করতে। কিন্তু সঙ্গে এতগুলি অল্পবয়সী মেয়ে নিয়ে কেন। বাঙলাদেশে তো এর ব্যতিক্রমই দেখি।

বললাম, 'এই, দেখিয়ে, আপ উতর যাইয়ে হামারা ঘাড়সে।'

ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল মেয়েটি। ভাবখানা, এ আবার কে গো! তারপর হেসে পরিষ্কার গলায় বলল, 'আরে ভাই সবকোইকা তখ্‌লিফ, কিসীকো তো একলী নহি। এ দেখো, আদমিলোগ ঝগড়া কর রহে!'

বলে সে তার বলিষ্ঠ দেহটি সামান্য সরিয়ে আবার ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে হাসল। অর্থাৎ, হল তো। কতখানি হল, সে আমিই জানি। আর খানিকক্ষণ বাদে আমার উঠে পড়া ছাড়া আর গতি নেই। কিন্তু—

কিন্তু বলরাম কোথায়? বলরাম! মা-খেগো বলা? পায়ের কাছে তাকিয়ে দেখি, একরাশ মাল আমার বুকসমান উঁচু হয়ে আছে। তবে কি চাপা পড়ে গিয়েছে বলরাম? এক সহযাত্রীকে রেখে এসেছি মোকামাঘাটে। বলরামকেও রেখে যেতে হবে নাকি?

কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে যেখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম মালপত্র।

যা ভেবেছি, তাই। দেখি বলরাম হাসছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। ফুলে উঠেছে কপালটা, রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। তবুও হাসছে, কিন্তু তার হাসি আমার সমস্ত হৃদয় জ্বালিয়ে দিল। মরতে মরতেও সে হাসবে নাকি?

হাস্যক। তার মত হাসি তো সকলের নেই। মুখ গোমরা করে তুলে বসালাম তাকে। মালপত্র ছুঁড়ে ফেলতে দেখে, নতুন দলের সকলে হা হা করে তেড়ে এল আমার দিকে।—'আরে আরে, আদমি আন্ধা না কি? দিলে সব মাল চৌপাট করে।'

বললাম, 'আন্ধা তো মনে হচ্ছে তোমরাই। তোমরা যে একটা জান চৌপাট করে দিচ্ছিলে।'

জান! জান কোথায়! এতক্ষণে উঁকি মেরে দেখল তারা বলরামকে! কিন্তু বলরাম হাসছিল তার সেই কপাল-ফোলা মুখ নিয়ে। সে হাসি দেখে আমার গায়ের মধ্যে আরও জ্বলে উঠল।

এক মুহূর্তের নীরবতা। প্রথমে হেসে উঠল প্রৌঢ়া। তারপরে শ্যামা প্রেমবতীয়ার দল।

হাসির কারণ বুঝলাম না। তাকিয়ে রইলাম বিস্মিত বোকার মত।

হাসে নি ওদের দলের একজন, সেই বুড়োটি। সে হাতের লাঠির ডগায় নড়বড়ে থুতনিটি রেখে একনজরে তাকিয়ে দেখছিল আমাকে। মোটা সাদা ভ্রূর তলায় তার সেই চোখে বিরক্তিপূর্ণ অনুসন্ধিৎসা। এতখানি বেলাতেও তার আপাদমস্তক শাল দিয়ে ঢাকা। তার নাকের দুপাশের গভীর রেখা দেখে মনে হল সে বীতশ্রদ্ধ এ জগৎসংসারের উপর। জীবনে হাসির পালা তার শেষ হয়েছে। আর কোনদিন সে হাসবে না।

হাসি থামিয়ে প্রৌঢ়াই প্রথমে বলল, 'আহা, বেচারা!'

আর একজন, 'সাধু নাকি?'

পার্শ্ববর্তিনী, 'বোধ হয়।'

প্রৌঢ়া করুণ মুখে বলে উঠল, 'শ্যামা, দিয়ে দে বেচারাকে দু-চার পয়সা।' শ্যামা নামধারিণী অচিরাৎ আঁচলের বদলে ট্যাক থেকে এক আনা পয়সা বার করে ছুঁড়ে দিল বলরামের কোলে। তারপর প্রৌঢ়া আমার দিকে ফিরে বলল, 'আরে ভাই, দেখা নহি উনকো। গোসা ন করো।'

বলেই আবার তারা তাদের মালপত্র গোছাবার জন্য লাফালাফি, ঘাড়ে ওঠাউঠি শুরু করে দিল। যত না মালপত্র সাজায়, তত সামলায় বুড়োকে।

বুড়ো যেন তাদের সাত রাজার ধন এক মানিক। কেন, কে জানে! সেই সঙ্গেই স্বভাষায় কি একটা কথা নিয়ে হেসে খুন হচ্ছে সকলে। আর আড়-চোখে তাকিয়ে দেখছে আমাকে। কেন, তারাই জানে!

তারা শুধু খ্যাপা হাওয়ার মত আসে নি। খ্যাপা তারা নিজেরাও। তাদের হাসি কথা কাজ দেখে তাই মনে হয়। যেন খাঁচার পাখি খাঁচা-ছাড়া হয়েছে। মাতিয়ে তুলেছে বনপালা।

তাদের চারজনের মধ্যে প্রৌঢ়াসহ তিনজনের দেহে সাবেকী ধরনের সোনার অলঙ্কার। জামাকাপড়েও গ্রাম্য অবস্থাপন্ন পরিবার বলেই মনে হয়। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে এই বাঁধনছাড়া কলকাকলীর মধ্যে তাদের স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য।

মধ্যপ্রদেশের শার্দুল তখনো হাত-পা গুটিয়ে বসে গজরাচ্ছেন। অন্ধের পরিবারটিরও শান্তিভঙ্গ হয়েছে বিলক্ষণ। তবু মনে হল, তাঁরা উপভোগ করছেন সমস্ত ব্যাপারটা।

বলরাম বিকলাঙ্গ। পরিচয়ও তার সঙ্গে সামান্য। তবু মনটা আমার বিমুখ হয়ে উঠল তার প্রতি। কী বলে সে আনিটা নিয়ে হাসছে আমার দিকে চেয়ে! যারা অমনি আঘাত করে তার মাশুল দেয় এক আনা, দিয়ে আবার নির্লজ্জের মত হাসে, তাদের প্রতি বলরামের এত অনুরক্তি কিসের। বলরামেরা চিরকালই এমনি। ছি, ওর সঙ্গে আর কথা বলব না।

দু মিনিট গেল না। বলরাম আবার ডাকল, 'বাবু।'

যেন শুনতে পাই নি, এমনিভাবে তাকিয়ে রইলাম অন্যদিকে। কিন্তু বলরাম চাপা ও খুশী গলায় বলল, 'এতক্ষণে শুকনা খালে জোয়ার এইল। বাবা! এতক্ষণ এই বাবু-কামরাটাতে বইসে মনে হচ্ছিল না যে পেরাগে যাচ্ছি। এইবার দেখেন তো, কেমন কলর-বলর গমগম কইরছে।'

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু সে আপন মনে বলেই চলল, 'বুইঝলেন বাবু, বলে মানুষ নিয়ে কথা। বেঁইচে আছি যদ্দিন, তদ্দিন মানুষ ছাড়া গতি নাই। একলা সুখ, একলা দুখ, এ কি হয়। তবে মরণের ঘুণাইলে অত

কান্না কিসের, অ্যাঁ? ছেইড়ে যাবার ভয়েই তো। আসুক, আরো আসুক। কী বলেন বাবু, যে কয় একলা চলি, সে তো চলে দোকলার জন্যে। নইলে চইলতে যাবে কেন, অ্যাঁ?

কাঁচা কুয়োয় উপরের জল চুইয়ে পড়বেই। তা রোধ করবে কে? বলরামের কথাগুলি ঠিক কানে এসে ঠেকছিল। শুধু ঠেকছিল না, অবাক করছিল আমাকে। শাসন, রাজনীতি, নিরাপত্তাহীন জীবন, সব মিলিয়ে আমাদের মনে অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয়, অনেক সঙ্কীর্ণতা। দিবানিশি পা টিপে টিপে চলেছি চোরাবালি এড়িয়ে। এই জীবনেই ফাঁক পেয়ে আবার দৌড় দিয়েছি অমৃত-কুম্ভের সন্ধানে, ভারতের সেই বিচিত্র রূপের রসে ডুব দেব বলে। সে রূপ লক্ষ লক্ষ হৃদয়েরই; কিন্তু বলরামের এ কিসের রস। এ কি তার নিরক্ষর অন্তরেরই বিশ্বাস, নাকি শুধু কথার জাদু! মানুষের প্রতি তার এত টান! নাকি টানটা চার পয়সার!

ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল বলরামের ফোলা কপাল। লাল জায়গাটিতে এতক্ষণে বিন্দু বিন্দু রক্তও দেখা দিয়েছে। তবু সে হাসছে। অম্লান হাসি। এ হাসি দেখে সহজে মনে পড়ে শুধু বৌদ্ধ শ্রমণদেরই কথা। কিন্তু এ যুগে তা অচল ও অবিশ্বাস্য। গলায় আমার আপনিই ঝাঁজ এসে পড়ল। বললাম, 'তোমার কি একটুও চোট লাগে নি?'

বলরাম বলল, 'চোট আবার লাগে নি বাবু? কিন্তু কাঁদব ক্যার কাছে বলেন। কাঁদনে লাভ? ওনারা কইবেন, দেখি নাই বাপু। মিটে গেল। তাই বইলে পইড়ে থাকব না, চইলব। চইলতে চোট লাগে না বাবু? আপনার লাগে না?'

আবার সেই কথার ফুল ফোটানো। সে ফুলে এমন গন্ধও ছিল যে, চট করে জবাবও দিতে পারি না এই সামান্য বলরামের কথার।

সে আবার বলল, 'বাবু, নোকে সংসার চালায়! সংসারে কত ব্যথা, কত চোট। সেখেনে পেটে চোট, মনে চোট। পেটে খেতে নাই, বুক-জোড়া মানুষটি নাই, হাজার চোট খেইয়েও থেমে আছে কে বলেন?'

তর্কের অবকাশ ছিল কি না জানি নে। কিন্তু হেরে গেলাম। জানি নে,

কোন পথে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। আমাকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার স্রোতে। একটা সামান্য মুলা বলরামের কাছে হার মেনে গেল আমার বিদ্যাবুদ্ধি। অন্তত এই মুহূর্তের জন্য সে আমার মনের দুকূল ভাসিয়ে ভরিয়ে দিল।

এর পরে আরও ওই চারটে পয়সার কথা বলে তাকে আঘাত দেওয়ার কথা আমার মনে আনতে সঙ্কোচ হল। আমার মন তো বলরামের মন নয়।

তৃতীয়বার বলরামের হাত এসে ঠেকল আমার পায়ে। ছি ছি, অমন পায়ে হাত কেন বার বার। বললাম, 'কী বলছ?'

দেখলাম বলরামেরও সঙ্কোচ হয়। বলল, 'অ্যালাবাদ ইস্টিসনে এট্টুস হাত দুইখান ধরবেন, কোনরকমে একবার টেনে-হিঁচড়ে ফেলতে পারলেই হইবে। আপনি একলা মানুষ, তাই কইলাম।'

বলে সে আমার মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইল। সেই চোখে দেখতে পেলাম বোধহয় বলরামের আসল রূপ। সে রূপ এক বিকলাঙ্গের করুণ অসহায় রূপ। এ সংসারের আয়নায় বোধ হয় এটাই তার প্রকৃত মূর্তি। আর এ রূপই বুঝি তাকে দিয়েছে প্রাণ-ভোলানো সুর, গলা, কথা ও মন।

বললাম, 'পায়ে হাত দিও না। দেব, নিশ্চয় নামিয়ে দেব।'

ব্যস। আবার গুনগুন।

কথায় বলে, বানের জল একবার ঢুকলে আর রক্ষে নেই। শ্যামার দল ঢুকে আপার ক্লাসের আভিজাত্য ও গাম্ভীর্যে চিড় ধরিয়ে দিয়েছিল। এবার প্রতিটি স্টপেজ থেকে কলকল নাদে ধেয়ে এল বন্যা। এবার সাধারণ পুণ্যার্থীর সঙ্গে সাধু। গণমনের গঠনপ্রকৃতিও এমনি বিচিত্র যে, একবার যেদিকে ঢল নামে, সবাই ছুটে চলে সেদিকে। জানি নে, অন্যান্য কামরাগুলির কী অবস্থা। কিন্তু এখানে আমাদের মুখে মুখ ঠেকে গেল। যেমন ঠাসাঠাসি, তেমনি কলরব। শুধু খুশির অন্ত নেই বলরামের।

মানুষ বিরক্তিতে ও হতাশায় হাসে। অন্ধের বড় ভাই তেমনি হেসে

বললেন, 'কিছুই করবার নেই, কী বলেন? কী ভাগ্যি, আমাদের গন্তব্য আর বেশি দূরে নয় '

বললাম, 'আমাদের সকলের বোধ হয় একটাই গন্তব্য।'

বড় ভাইয়ের মধ্যেও বোধ হয় বলরামের মত একটা পাগলামি ছিল। বললেন, 'কী করে বলি বলুন। সমূহ আমাদের একটা গন্তব্য হতে পারে। কিন্তু আমাদের সকলের গন্তব্য এক হতে পারে না। আমি সম্পূর্ণ অন্য পথের যাত্রী।'

বলে তিনি চুপ করে গেলেন। ঘুরে-ফিরে তাঁর সেই পারিবারিক ট্র্যাজেডির কথাই আসছে। পথ যত সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, তাঁর পাথরের মত নিকষ কালো মুখে তত পরিস্ফুট হয়ে উঠছে গভীর ফাটলের চিহ্ন। সম্পূর্ণ অন্য পথের যাত্রী, অথচ চলেছেন সেই প্রয়াগেই।

ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের ক্ষিপ্ত অথচ অসহায় শার্দুলের। তাঁরা মহিলাপুরুষে মিলে কিছুক্ষণ রীতিমত ঝগড়া করেছেন। এমন কি ভয়ও দেখিয়েছেন, কর্তৃপক্ষকে বলে এদের নামিয়ে দেবেন।

কা-কস্য পরিবেদনা। কাকেই বা বলা। যাদের বলেছেন, তাদের ভয়ের লেশমাত্র নেই। ভয় নেই, আছে শুধু এক বিষম সংশয়। এত কাছে এসেও তাদের শুধু সংশয়, তারা যেতে পারবে কি না। ভয় তারা পেছনে ফেলে এসেছে। নিষ্ঠুরের মত এর চুলের মুঠি ধরে, ওর মুখে পা দিয়ে যেভাবে সবাই হন্যে হয়ে উঠেছে যাবার জন্যে, দেখে মনে হচ্ছে প্রাণকেও তুচ্ছ করেছে তারা। যে যার নিজের ভাবনায় নিজে উন্মাদ। পাশের মানুষটির কথা ভাববার অবকাশও নেই কারুর। সে যদি অপরের পেষণে পীড়নে আর্তনাদ করে ওঠে, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই কারুর।

পাগলা হাতি ছুটতে দেখেছিলাম কুম্ভমেলায়। লিখতে বসে সেই উপমা মনে পড়ছে। এক নির্মম প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে সকলে। কে পড়ে থাকবে, কে মরবে, সেটা বড় কথা নয়। আমি যাব। সামনে পড়ে আছে যেন তার জীবন-যৌবন, আজন্মলালিত কাম্যবস্তু, তার ধ্যানধারণা।

বৃথা দোষ ধরেছিলাম শ্যামাদের দলের। এখন আর ছোট কামরাটিতে খুঁজে পাওয়া দায় শ্যামাদের। তারা চারটি মেয়েমানুষে নিজেদের সমস্ত পেষণযন্ত্রণার মধ্যেও আগলে রেখেছে সেই বুড়োকে। আমি আগলে রেখেছি বলরামকে।

আস্তে আস্তে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে কামরার অবস্থা।

আর কতদূর। দূর নেই আর। ক্রমে এলাহাবাদ শহরের সীমানায় ঢুকল গাড়ি।

ভেবেছিলাম, সকালেই পৌঁছুব। চারটের সময় গাড়ি দাঁড়াল এলাহাবাদে। গাড়ি এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, দুমদাম করে মালপত্র পড়ছে প্ল্যাটফরমের উপর। পড়ছে আমাদেরই গাড়ির দরজা জানালা দিয়ে।

এসে পড়েছে। একটিমাত্র কথার অপেক্ষা। সত্যিই এল কি-না, সন্ধানের প্রয়োজন নেই। শোনা মাত্র সংক্ষিপ্ত স্থানে পাক-খাওয়া ঘূর্ণিজলের আবর্ত মুহূর্তে পথ পাওয়ার জন্য ফুলে ফুলে উঠল। অকস্মাৎ এই স্ফীতিতে একটা তীব্র আর্তনাদ উঠল সারা কামরাটার মধ্যে। 'মরে গেলুম, বাবারে। মেরে ফেললে, মেরে ফেললে।'

কারুর হাত ভাঙল, পা ভাঙল, গুঁতো খেয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। এরই মধ্যে বাঁদরের মত কুলিদের লম্ফ-ঝম্ফ। স্টেশনের মাইকের চিৎকার, হাজার হাজার নরনারীর কলরব। গাড়িটা ফিরোজপুর এক্সপ্রেস। যাত্রীরা নামার আগেই অন্য যাত্রীর দল ওঠার জন্য ঠেলাঠেলি করছে দরজার কাছে।

প্ল্যাটফরমের উলটো দিকে নামার সুবিধা নেই। আমার হাঁটু চেপে ধরে চুপ করে বসে ছিল বলরাম। বুঝলাম, উপায় নেই। এর মধ্যেই নামতে হবে। আমার এই ক্ষীণ দেহে কখনো শক্তির পরীক্ষা দেব, সেটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু ত্রাণ পেতে হবে।

এক কাঁধে নিলাম ঝোলা। দুহাতে বলরামকে তুলে বললাম, 'শক্ত করে গলা ধরে ঝুলে পড়ো।'

শঙ্কিত বলরাম বলল, 'পারবেন তো ঠাকুর! আমার ঠাকুরের কোন কষ্ট হবে না তো?'

বাবু থেকে ঠাকুর হয়েছি বলরামের কাছে। এর পরে দেবতা হব। নরাধম পাপিষ্ঠও হতে পারি।

সামনে তাকিয়ে মগজের সমস্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এতক্ষণ অপরকে বলেছি, এবার নিজে একটা অন্ধ ক্ষিপ্ত মোষের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম সামনের দিকে।

অন্ধের বড় ভাইয়ের উৎকণ্ঠিত গলা একবার শুনতে পেলাম, 'এ কী করছেন, মিঃ, শুনুন।'

না, শুনব না। নামতে হবে। কতটা এগিয়েছি জানি, একটা নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ শুনে তাকিয়ে দেখলাম, শ্যামা। আমার কনুই তার গলায় ঠেকেছে। প্রাণভরে চিৎকার করছে সেই মুক্ত পাখির দল। কোথায় প্রৌঢ়া প্রেমবতীয়া, পাতিয়া! কোথায় বা বুড়ো! দেখতে পেলাম না, শুধু চিৎকার শোনা যাচ্ছে!

শ্যামা আমার কনুই চেপে ধরল দুহাতে। অসহ্য ভার। প্রাণ বেরিয়ে যায়। যেতে দাও, যেতে দাও।

হুশ করে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল ঘাম-ঝরা মুখে। বাইরে এসে পড়েছি। দেখলাম একসঙ্গে অনেকে এসে পড়েছি। খসে পড়েছে বলরাম ঘাড়ের উপর থেকে। না, তার লাগে নি। সে ভগবানকে ডাকছে।

ওভারকোটটা কে ধরে রেখেছে পেছন থেকে। ফিরে দেখি শ্যামা। উৎকণ্ঠিত চোখে জলের ধারা। অসহায়ভাবে বলে উঠল, 'ওদের একটু নামিয়ে দাও বাঙালীবাবু।'

আবার! কিন্তু এবার দুজন সেপাই এসে পড়েছে। সেপাই ডেকেছেন মধ্যপ্রদেশের সেই ভদ্রলোক। অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে এল যেন।

পরোপকারের নেশা বলে কোন বস্তু আছে কিনা জানি না। মানুষের মনে মাঝে মাঝে একটা ঝোঁক চাপে। আমারও ঝোঁক চাপল তেমনি। শ্যামার হাতে ঝোলা ফেলে উঠে গেলাম আবার।

প্রৌঢ়া চেঁচিয়ে উঠল, 'এই বুড়োকে, দোহাই বাবু, এই বুড়োকে একটু নামিয়ে দাও।'

বলতে না বলতে বুড়ো দু হাতে চেপে ধরল আমাকে। যেমন করে জলে ডুবন্ত মানুষ কোন আশ্রয় খোঁজে। ভেবেও দেখে না, সে-আশ্রয়সুদ্ধ সে তলিয়ে যাবে কি-না।

নেমে এলাম। নেমে এসেছে সবাই। কোথায় গেল হা-হুতাশ, যন্ত্রণা, চিৎকার ও কান্না।

শ্যামা হাসছে। হাউমাউ করে কী সব বলছে প্রৌঢ়াকে আর আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমাকে। বুঝতে পারলাম, এমন ভালমানুষ ওরা কখনো দেখে নি। সে কথাই বলছে আর বোঝাতে চাইছে আমাকে।

বলরাম ডাকল, 'ঠাকুর!'

বললাম, 'ঠাকুর নই, জাত শুদ্দ র আমি।'

কিন্তু বলরামের আছে কথার ফুলবাগান। বলল, 'কই! আপনার গায়ে মুখে যে নেকা রয়েছে ঠাকুর বলে। তা আমি মানব কেন। ঠাকুর, অ্যাই, অ্যাই যে নক্কীদাসী।'

দেখলাম, বলরামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পেটেণ্ট বাঙালী নামাবলীধারী বৈষ্ণব, আর-এক জন কালো স্থূল চেহারার মেয়েমানুষ।

বুঝলাম, আমঘাটার লক্ষ্মীদাসী এই মেয়েমানুষটি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। থানের উপর নামাবলী। পান-দোক্তা-খাওয়া ঠোঁট ফেটে চৌচির হয়েছে। স্থূল ঠোঁট, বিস্ফারিত করে বেচারী হাসতেও পারছে না। বোধ করি তার মূল গায়েনকে রক্ষা করেছি বলেই মুগ্ধ কৃতজ্ঞতায় বাকরহিতা হয়েছে সে।

বললাম, 'বেশ, এবার চলি বলরাম।'

জবাব দিল লক্ষ্মীদাসী। সেও বলল, 'ঠাকুর—'

ফিরে তাকালাম তার দিকে। চল্লিশ বছরের লক্ষ্মীর কালো-কালো ডাগর চোখ দুটি এখনো বালিকার মত কৌতূহলিত ও নম্র। বলল, 'একবার আমাদের আশ্রমে পায়ের ধুলো দিবেন।'

'কোথায় তোমাদের আশ্রম?'

'কোথায় জানি না। দেখি নাই তো কোনদিন। আশ্রমের নাম

ছিরি নন্দগোপাল মাধবাচার্য বাবাজীর মন্দির। আমাদেরও খুঁজে নিতে হবে।'

বললাম, 'পারলে যাব। না যেতে পারলে কিছু মনে কোরো না। তবে তোমার মূল গায়েনের গলাটি বড় মিষ্টি। ওর গান শোনবার ইচ্ছা রইল মনে।'

অন্ধের পরিবারটি নেমে এসেছেন। দেখলাম, ড্রাইভারের উর্দি-পরা একটা লোক তাঁদের পথ করে দিয়ে নিয়ে চলেছে। সকলেই আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। বড় ভাই বললেন, 'আমাদের ক্যাম্পটার নাম মনে আছে তো? আসা চাই।'

সাধারণ যাত্রীদের বেরুবার পথে এগিয়ে গেলাম। জানি, আমার দিকে তাকিয়ে আছে বলরাম। জলে ভেসে যাচ্ছে তার দুচোখ। মা-খেগো বলা, মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু!

এই মহামেলার জনারণ্যে আর কোনদিন ওকে খুঁজে পাব কি-না জানি না।

মানুষের মন নদীর কূলে সৈকতভূমি, সেখানে দিবানিশি পলি পড়ছে। পলের পলি, মিনিটের পলি, ঘণ্টার পলি, মহাকাল ও যুগের পলি। একটা বেলার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে মৃত-সহযাত্রীর তীব্র স্মৃতি। এর পর হারিয়ে যাবে বলরামও।

আবার কোন ঘটনার ঢেউ আছড়ে পড়ে যেদিন জাগিয়ে দেবে এই কুম্ভ-যাত্রার স্মৃতি, সেইদিন হয়তো এই বিচিত্র মুখগুলি ভেসে উঠবে চোখের সামনে। কত কথা মনে পড়বে।

স্মৃতি যেন কণ্ঠলগ্না প্রেয়সী। প্রেয়সীর আদরে অবিমিশ্র সুখ থাকে না। সুখ ও দুঃখ, এ দুই ধারার মিলনে সেখানে নোনা জলের ধারাও গড়িয়ে আসে। স্মৃতিও তেমনি। এমন কি, কণ্ঠলগ্ন হয়েও তীব্র দহন সময়ে সময়ে অনুভব করি আমরা। তবুও স্মৃতি বিনা প্রাণ বাঁচে না।

মাইক অনবরত বলে চলেছে, 'কলেরার ইনজেকশন নিতে ভুলবেন না। ভুলবেন না সার্টিফিকেট নিতে। বিনা সার্টিফিকেটে আপনার মেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

তার ব্যবস্থাও হয়েছে কম নয়। সমস্ত স্টেশনটি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে একটি অস্থায়ী কারাগার সৃষ্টি হয়েছে। দরজায় দরজায় ডজন ডজন পুলিস।

স্টেশনের খোলা আঙিনাতেই ছাউনি পড়েছে মহামারী প্রতিষেধক-ওয়ালাদের। কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ বাগিয়ে ধরে আছেন চকচকে সিরিঞ্জ আর তুলো।

শ্যামার দল এখানেও হট্টগোল পাকিয়েছে। ইনজেকশন তারা কিছুতেই নেবে না। শুধু শ্যামারা কেন, অনেক শ্যামার দলই মূর্ছিতের মত পড়ে আছে ছাউনির পাশে। ভগবানের কাছে হত্যে দেওয়ার মত অসহায়ভাবে পড়ে আছে।

পুণ্যার্থী নারীবাহিনীর কোন কোন দল তো কান্নার রোল তুলেছে।—'হে ভগবান, হে মহাদেব, তোমার রাজত্বে এ কি কাণ্ডকারখানা চলছে।'

অবাক হয়ে দেখি পাশে একজন মস্ত মরদ জোয়ান পাগড়ি নিয়ে চোখের জল মুছছে। বললাম, 'কাঁদছ কেন ?'

সে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, 'বিনা সুঁইসে ইনলোগ হম কো যানে নহি দেগা।'

সত্যি, ভগবানের রাজত্বেরই কাণ্ডকারখানা বটে। মরদটিকে দেখে মনে হচ্ছে, সে রাজস্থানের কৃষক। শরীর তার আমার চার ডবল। তার চওড়া থাবাটাই আমাকে বোধহয় টিপে মেরে ফেলতে পারে। সে যে সামান্য একটি ছুঁচ হাতে বেঁধাবার ভয়ে রীতিমত কান্না জুড়েছে, এ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা দায়।

কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছি, শুধু সে কেন, এমনি কয়েকজনেরই চোখ ছলছল করছে। অথচ এই মানুষই হয়তো সামান্য আলপথের জমি নিয়ে দাঙ্গা করে নিজের ও পরের মাথা ফাটায় অনায়াসে। তখন সে রক্ত দেখেও ভীত নয়। হয়তো ধর্মের নাম করে তার নাক কান ফুটো করে দিলেও সে সহ্য করবে। কিন্তু ইনজেকশন। সে যে বড় সাংঘাতিক।

কিন্তু তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবী ভোলবার নয়। ইনজেকশনরূপী দেবতাটি বড় নির্দয়। ছুঁচ হয়ে না ঢুকে সে ছাড়বে না আর তার পরোয়ানা

না পেলে স্বর্গের দরজাও বন্ধ। যারা ভীত অথচ বুদ্ধিমান, তারা কেউ দেরি করছে না। নিচ্ছে আর পালাচ্ছে। ভাবখানা, যা হয় পরে দেখা যাবে। এখন তো যাওয়া যাক।

শ্যামার দল শেষটায় টাকা বের করছে। কিন্তু টাকা নিয়ে যারা নিষ্কৃতি দেবে, এ দিনের আলোয়, সহস্র চোখের সামনে তাদের ইচ্ছে থাকলেও লজ্জা বলে একটা বস্তু তো আছে।

বৃথা দেরি করা। যেতে হবে। এদিকে বেলা যায়। ইনজেকশন নিয়ে, এক টুকরো কাগজের সার্টিফিকেট পকেটে পুরে বেরুতে গেলাম।

সামনেই দেখি শ্যামা ও প্রৌঢ়া। পেছনে প্রেমবতীয়া, পাতিয়া ও বৃদ্ধ।

শ্যামা উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'চোট লাগে নি ?

ভাবলাম, বলরামের মত জবাব দিই যে, চোট ছাড়া চলা যায় নাকি ? হেসে বললাম, 'সামান্য। ও কিছু নয়।'

শ্যামা বলল, 'সচ বলছ ?'

'ঝুটা বলে লাভ কী আমার। নিয়ে দেখো।'

এত ভয় যে, শ্যামা আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। বলল, 'আমাদের এই বুড়া মানুষটি নিতে পারবে তো ?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই। একশোটা নিতে পারবে।'

বলে হাসতে হাসতে বাইরে এসে দাঁড়াতেই এক কাণ্ড। একটি বাঙালী বৃদ্ধা শণ-নুড়ি চুল উড়িয়ে ভাঙা গলায় খনখন করে উঠল, 'দাঁত বের করে নিয়ে তো এলে বাছা। এমনি করে তোমরা প্যাঁক-প্যাঁক করে নিলে মড়ারা কি আর আমাদের ছাড়বে ? একটু বলেকয়ে ব্যবস্থা তো করতে হয়।'

অবাক হয়ে বললাম, 'আমাকে বলছেন ?'

'তবে আর কাকে বলব ?

'কিন্তু বলেকয়ে কাকে বোঝাব, বলুন তো ?'

'কেন, হিন্দীমিন্দিওলাদের বলে দাও, আমাদের এই বুড়িসুড়িদের সাতকাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে। মরি মরব। আমরা সব ইঞ্জিশন ফিঞ্জিশন নিতে পারব না '

তাই ভাল। ভেবেছিলাম, না জানি কী করেছি। দেখলাম বুড়ির পাশে একটি বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়সের যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যেই সে আপাদমস্তক মোটা শালে ঢাকা দিয়েছে। শীত আছে সত্যি। কিন্তু যুবকটিকে শীতের জুজুবুড়িতে ধরেছে বলে মনে হল। ঠেলাঠেলির ঠেলায় আমাকে তো সব গরম জামা খুলে ফেলতে হয়েছে।

যুবকটির পাশে দেখলাম একটা অবগুণ্ঠিতা বালিকা। বালিকা উৎকণ্ঠিতা। আমার চোখে চোখ পড়তেই যুবকটি বলে উঠল, 'কী করা যায় বলুন তো?'

আমি বললাম, 'কেন, আপনিও নেন নি নাকি?'

যুবকটি লজ্জিত হল না একটুও। মুখটা আরও করুণ করে বলল, 'মানে কথা, কখনো নিই নি কি-না, তাই বড় ঘাবড়ে যাচ্ছি। দেখুন না, আমার পরিবারটি তো একেবারে মরিয়া হয়ে গেছে দাদা। আর দিদিমার কথা তো শুনলেনই।'

পরিবার অর্থাৎ বালিকাটি। বুড়ি হল দিদিমা। লোকটির অবস্থা সব-দিকে দিয়েই কাহিল হয়ে পড়েছে, বুঝতে পারলাম। কিন্তু অবাক হলাম ওর কাণ্ড দেখে। ইনজেকশন যে এমন করালরূপে এখনো দেশে বিরাজিত, তা জানতাম না।

বললাম, 'জানতেন তো আসবার আগেই। ব্যবস্থা একটা করলেন না কেন?'

যেমনি বলা, অমনি যুবকটি শাল খুলে একেবারে রুদ্র মূর্তিতে জ্বলে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'মোশাই, এই বুড়ি যত নষ্টের মূল। পইপই করে বলেছিলুম, ছটা টাকা দে দিমা (অর্থাৎ দিদিমা), মিউনিসিপালের হেলথ্ অফিসারকে মাথা পিছু দুটাকা করে দিয়ে সার্টিফিকেট নিয়ে নিই। তখন বলে কত কথা। ছটা টাকা! এখন কোন শালা এ বোত্‌রনি পার করবে, অ্যাঁ?'

যুবক স্বমূর্তিতে বিরাজিত। দিদিমাও কম যায় না আদুরে নাতির চেয়ে। সেও গলা চড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ রে, একলষেঁড়ে, দুপয়সা কামাবার মুরোদ নেই, ছটা টাকা আসে কোত্থেকে। আর তখন কি অত জানতুম যে, মিনসেরা এমনি করে ধরবে।'

যুবক আরও উগ্র হয়ে উঠল। শাল কোমরে বেঁধে জামার আস্তিন গুটিয়ে বলল, 'আমি শালা এখুনি ইনজেকশন নেব, যা খুশি তুই কর।'

সর্বনাশ! বুড়ি একেবারে ক্ষেপে উঠল। বলল, 'মাথা কুটে মরব পেল্লাদ, তোর দিমার তালে আজ এখেনেই মিত্যু আছে। খবরদার।'

কিন্তু পেল্লাদ আস্ফালন করতে ছাড়ে না।—'হোক মরণ তবু নেব।'

বলে, কিন্তু এগোয় না। আর আমিই কি জানতাম যে এলাহাবাদে স্টেশন-প্রাঙ্গণে এমনি একটি নেহাত বাঙলা নাটক দেখব!

দর্শক অনেক ছিল। বোধকরি ভারতের প্রতিটি প্রদেশের নরনারী দেখছিল এই নাটক। প্লাটফরম থেকে জনতা ক্রমে আঙিনাতে ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। মহামারী ক্যাম্পের লোকেরা তাড়া দিলেন ভিড় কমাবার জন্য।

ইতিমধ্যে অনেকেই বেরিয়ে গিয়েছে। বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা। জানি না দিদিমা-নাতির এ নাটকের যবনিকা কি ভাবে কখন পড়বে। সরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এলাহাবাদ শহর। প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের প্রয়াগ প্রদেশ। শুধু সঙ্গম-স্থলটুকুই আজ প্রয়াগ নামের মহিমায় উজ্জ্বল, হিন্দু পুণ্যার্থীর স্বর্গভূমি। কিন্তু প্রয়াগ-প্রদেশের সীমা বলতে অনেকখানি বোঝাত। তখন প্রয়াগ ছিল হিন্দু রাজার রাজধানী।

শুধু হিন্দুর তীর্থভূমি বলে নয়, যে-কোন ইতিহাস-কৌতূহলিত ব্যক্তি রোমাঞ্চিত হবেন আজকের উত্তরপ্রদেশের এই শহরের ইতিহাস শুনলে।

দলবদ্ধ তরুণীদের কলহাসির মত অনেকগুলি বেল বাজছে সাইকেল রিক্সার। এখানে কর্ণবিদারী ভেঁপু নেই। ঘাড় নুইয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে উত্তরপ্রদেশের রিক্সাওয়ালা। সময় নেই। আজ তাদেরই পৌষ মাস। এক টাকার জায়গায় চার টাকা চাইলেও না বলার মত কেউ নেই। রথ যাদের চাই, তাদের আজ রথীদের মনোমতব্যবস্থায় রাজী হতেই হবে।

কিন্তু সেকথা বলছিলাম না। বলছিলাম এ দেশের কথা। বাঙলা থেকে

খুব দূরে বলব না এ দেশকে। বিশেষ এই বিজ্ঞানের যুগে। তা ছাড়া বাঙালী বাসিন্দার সংখ্যাও এখানে কম নয়।

আজ এই দেশের রাজপথের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখছি পিচ-ঢালা রাস্তা, দুপাশে ইমারতের সারি। ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে মোটর লরি আর প্রাইভেট কার। সাইকেল রিক্সা আর রকমারি টাঙ্গা। টাঙ্গাগুলিই বোধহয় প্রাচীন ভারতের ঘোড়ায় টানা রথের স্মৃতি বহন করছে। মানুষ চলেছে অসংখ্য।

শহরের চেহারা বাঙলার মফস্বল শহরের মত। বিশেষ, বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরের ছাপ এলাহাবাদে সুপরিস্ফুট।

কাল থেকে কালান্তর, যুগ থেকে যুগান্তর। কাল যায়, যুগ যায়। যাওয়ার সময় সে তার ছাপ রেখে যায়। সবই মানুষের কীর্তি। মানুষই ভাঙে, আবার মানুষই গড়ে। তবু পেছন দিকে তাকালে আমাদের দু চোখ জলে ভরে আসে। এ চোখের জল অবস্তুবাদীর নয়, নয় ইতিহাস-বিমুখের। বরের গৃহে মেয়েকে পাঠাবার জন্য পিতা কত সুন্দর অনুষ্ঠান করেন। মেয়ের প্রতিষ্ঠা, তার নারীত্বের মহিমা-প্রকাশের জন্য এক নতুন জীবনে তুলে দিয়ে আসেন তাকে। তবুও যাকে লালন করেছেন, জন্মের পর থেকে যার বিকাশের জন্য প্রতিদিন কষ্ট করেছেন, তারই নবজীবনের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদে ভাসান।

প্রয়াগ নাম আমাদের তেমনি মুগ্ধ করে। হাজার হাজার বছর আগে থেকে ভারতের নামের সঙ্গে প্রয়াগের নাম জড়িত। যখন ভাবি, যে পথের উপর দিয়ে আজ রিক্সায় চেপে চলেছি, একদিন এখানকারই ভয়াবহ বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে অযোধ্যার দশরথ-পুত্র রাম, ভাই লক্ষণ ও স্ত্রী সীতাকে নিয়ে বনবাসের পথে গিয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন দূর-আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছিল ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম থেকে।

কাব্য নয়, বাস্তবে কি একবার চোখ বুজে ভাবতে পারি না, সৎমায়ের তাড়নায় দুই ভাই আর এক বউ বহুকাল পূর্বে একদিন ঘর ছেড়ে এ-পথে এসেছিলেন। তাঁদেরই নিয়ে আমাদের রাজকথা, কাব্য, গৌরবগাথা, রূপকথা, আমাদেব ইতিহাস।

চমকে উঠলাম। হঠাৎ কানে এল, 'এই যে বাঙালী ভাই!'

কথার সঙ্গেই জলতরঙ্গের চড়া স্বরের মত এক ঝলক হাসি। হাসি, ঘোড়ার পদশব্দ, ঘোড়ার গলায় বাঁধা বক্‌লেশের ঘুঙুরে ঝুম-ঝুম বাজনা।

চোখ চেয়ে ছিলাম, কিন্তু মন-চোখ হারিয়ে গিয়েছিল রামায়ণ কাব্য-লোকের স্বপ্নরাজ্যে। স্বপ্নোত্থিতের মত চমকে তাকিয়ে দেখি, মাত্র দুহাত দূরে শ্যামা। টাঙ্গার প্রান্তে বসেছে পা ঝুলিয়ে। একটা টাঙ্গারই স্বল্পপরিসর জায়গায় তারা সকলে বসেছে বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো রয়েছে মাঝখানে। তাদের টাঙ্গা চলেছে আমারই রিক্সার গায়ে গায়ে। এত গায়ে গায়ে যে ঠেকে না যায় আবার।

সামনে পিছনে টাঙ্গা ও রিক্সার ভিড়। পথের দু পাশে ভিড় মানুষের। মেয়ে, পুরুষ, শিশু ও বুড়ো। সারবন্দী চলেছে সকলে। চলেছে সাধুর দল।

ক্রিং ক্রিং নয়, রিনি-রিনি করে বাজছে রিক্সার বেল। তাড়া দিচ্ছে আমার রিক্সা শ্যামাদের টাঙ্গাকে।

শ্যামা হাসছে, হাসছে ওদের সমস্ত দলটা। বুড়োটিও কি হাসছে? হাসছে না, কিন্তু নাকের পাশের গভীর রেখা দুটিতে তার প্রসন্নতার আভাস।

প্রৌঢ়া কী বলল শ্যামাকে। যাত্রী ও যানবাহনের কল-কোলাহল ছাপিয়ে গলা চড়িয়ে শ্যামা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাঁহা যানা হ্যায়?' বাংলা করলে বোধহয় অর্থ দাঁড়ায়, 'কোথায় যাওয়া হবে?'

বললাম, 'মেলা। কুম্ভমেলা।'

সচ্? সত্যি! চকিত বিস্ময় ও মুহূর্তের নীরবতা। আবার হাসি। সে-হাসিতে পথচারী নরনারী চমকায়, জানোয়ার চমকায়। বোধহয় চকিতের জন্য থমকে যায় অবিরাম বয়ে-চলা এই জনসমুদ্রের পায়ের তলার মাটি, উত্তরপ্রদেশের হালকা মেঘ-ছাওয়া বেলাশেষের রক্তিম আকাশ, উত্তরের সর্বনাশী বাতাস। কেন-না, এ-হাসিতে মুক্তির স্বাদ নেই।

কেন এত হাসি, জানি নে। বলরামের যেন দেখলাম, হাসি প্রাণ, হাসি গান, হাসি আমার বসন-ভূষণ। বুঝি এদেরও তাই। কিন্তু বলরামের নীরব হাসিতে খুলে যায় প্রাণের বদ্ধ দরজা। নীরব, অথচ এক প্রাণখোলা

মানুষের মুক্তির উদার ডাক। আর এই চড়া হাসির লহরে লহরে অনুভূত হয় এক চাপা-পড়া বন্দীর নিঃশব্দ যন্ত্রণার ছটফটানি।

রিক্সার সামনের চাকা গিয়ে ঠেকেছে শ্যামার পায়ের কাছে। ঠেকে ঠেকে, তবু ঠেকে না। শ্যামার একটি খেলা আরম্ভ হয়েছে দেখছি। কার সঙ্গে? আমার সঙ্গে, না রিক্সাওয়ালার সঙ্গে, তা জানি নে।

বাঙালী ছেলে বলে ভাবি, দেশের মেয়েরা ছাড়া বুঝি কেউ আলতা দিয়ে পা রাঙায় না। কিন্তু শ্যামারও দেখি আলতারাঙানো পা, প্রজাপতির নকশা-কাটা স্যাণ্ডেল, আবার বাঁকা মল। মলের উপরেই পেখম-উন্মুক্ত-ময়ূর-ছাপা শাড়ি। তার বলিষ্ঠ অঙ্গ জুড়ে ছড়াছড়ি নৃত্যরত ময়ূরের। খুলে গিয়েছে ধূলিরুক্ষ চুল, সিঁথিতে মেটে সিন্দূর। কাঁচা সোনার স্থূল কাজ-করা কঙ্কণ-শোভিত দুহাতে কোলের উপর জড়িয়ে ধরেছে একটা পেতলের কলসীর গলা। বসেছে বেঁকে, ঘাড় হেলিয়ে। মুখে তার খেলার হাসি।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোন আশ্রমে থাকবে?'

বললাম, 'জানি নে।'

'জান না?' বোধহয় নিজেদের মধ্যে সেই কথাটি বলাবলি করে আবার তারা সকলে হেসে উঠল। কী করে জানব। সেখানে কোন দিন যাই নি, দেখি নি কেমন জায়গা, কী রকম আশ্রয়, সেখানে কোথায় থাকব, সেই ভেবে তো বেরুই নি। কি ভেবে বেরিয়েছিলাম, আজ পথ চলতে সব যেন ঘুলিয়ে গিয়েছে। বক্তৃতা আর যুক্তি গিয়েছি ভুলে। ভেঙে পড়ি নি ক্লান্তিতে, তবু মনেও হচ্ছে না, কখন কেন বেরিয়েছিলাম।

মনকে জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। বেরুবার জন্য মন অস্থির হয়েছিল। অস্থিরতা ঘুচেছে, এখন মন পাগল হয়েছে। নিজের সেই পাগল রূপটি দেখতে কেমন জানি নে। এখন চলা নামের মদ খেয়ে মাতাল হয়েছি। মনের বুকে কান পাতলে শুনি শুধু, চলো চলো চলো। এত মানুষ চলেছে, অবিরাম চলেছে। বন্যার জলে আমিও জল হয়ে মিশে গিয়েছি।

কোথায় গিয়ে ঠেকব জানি নে। ঠেকব কি ভেসে যাব, তাও জানি নে। আশ্রয়ের কথা কে ভেবেছে!

পথের দুধারে চলেছে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, গুজরাট, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ। কী বিচিত্র তার রূপ। কোথাও রঙীন পায়জামা পাঞ্জাবি ও ওড়নার সঙ্গে ঘাড়ের উপর এলানো খোঁপা, দোলানো বেণী। বাঁকা খোঁপায় ফুল গুঁজে রঙীন রেশমী শাড়িতে টেনে দিয়েছে কাছা। গলায় ঝোলানো বেল্টের সঙ্গে খাপে-ঢাকা ছুরি, কোমরে তলোয়ার নিয়ে চলেছে পাঞ্জাবী শিখ। হাজার কুচি-ঘেরা ঘাগরায় ঢেউ তুলে চলেছে দিল্লীওয়ালী, বিচিত্র বর্ণবহুল চৌদ্দ হাত শাড়িতেও সর্বাঙ্গ উদাস করে চলেছে রাজপুতানী। মাথায় সোনার টিকুলি, হাতে পায়ে সোনা। কারুর বা রুপোর হাঁসুলি, কান-ছিঁড়ে-পড়া ছ-ইঞ্চি-ভারী কর্ণাভরণ। নাকের দুপাশে নাকছাবি, কপালে দেশী গোলাপী রঙের সিঁদুরটিপ; সামনে কুচি দিয়ে বাঁ দিকে আঁচল এলিয়ে চলেছে দক্ষিণ-দেশীনী। বাবরি-কাটা, লুঙ্গি-পরা, মুখে-চুরুট পুরুষবাহিনী। কোথাও চোস্ত পাজামা আর চুড়িদার পাঞ্জাবি, কোথাও নকশা-ফোটানো নাগরা জুতো, ধুতি আর ঝোলা পাঞ্জাবি-পরা গোঁফ-পাকানো হিন্দুস্থানের পুরুষ। এরই মাঝে চোখে পড়ে কস্তাপেড়ে বাংলা শাড়ি আর বাংলা সিন্দূরের আগুনের মত লাল উজ্জ্বল টিপ ও শাঁখা। সর্বহারা শুভ্রবেশিনী বিধবা। ক্বচিৎ বাঙালী কুমারীর মস্ত বড় আঁট খোঁপা, স্নিগ্ধ মুখে উত্তর প্রদেশের ধূলি-রুক্ষতা। আর কোঁচা-ঝোলানো, কিংবা পায়ের গোড়ালি অবধি মালকোঁচা-দেওয়া পুরুষ, আমারই মত সব টাইপ চেহারার বাঙালী।

দেখে শেষ হয় না, আশ মেটে না পথের এই বিচিত্র রূপ দেখে। ভাবি, যার বেশ এত বিচিত্র, তার হৃদয় ও চরিত্রের গতিবিধি না জানি আরও কত বিচিত্র। সে বিচিত্রকে জানব কেমন করে। মন ভারী হয়ে উঠল। এত মানুষ, এত রূপ। এ রূপের শেষ রূপ কোথায়। সে রূপকে খুঁজব, সেই অপরূপকে দেখব। ভুলি নি তো। ডুব দেব সেই হৃদিকুম্ভে। রূপে তাকে চিনব না, প্রাণে প্রাণে বুঝব বলে ডুব দিতে চাই। প্রাণের দরজা যদি থাকে বন্ধ, করাঘাত করব। চাবি হয়ে ঘুরব কুলুপ ছিদ্রের মধ্যে।

কেন এলাম ছুটে উদ্‌ভ্রান্তের মত। দেখব বলেই তো। ভারতের এই

বিচিত্র আরশিতে নিজের মুখটি ভাল করে যাচাই করব বলেই তো এসেছি। সে মুখ আমার মন। আমার ধর্ম।

চলো চলো, আর কত দূর। নিজের মনের কথা নিজে বলতে পারি নে, মা-খেগো বলা হলে হয়তো গান গেয়ে শুনিয়ে দিত আমার মনের কথা।

এরই মাঝে আর-এক রূপ যেন মসলিনের ওড়নার সর্বাঙ্গে ধূলিমলিন ন্যাকড়ার তালিতে ভরা। ভারতের দরিদ্র নরনারী এই সমারোহপূর্ণ মিছিলের সবচেয়ে বড় অংশ। জীর্ণ কম্বল, ছিন্ন কাঁথা, ময়লা জামা-কাপড়, উসকো-খুসকো চুল, ধুলো-মাখা মুখ। তাদের ঘাড়ে মাথায় বোঝা! শত শত মাইল, শত গ্রাম গ্রামান্তরের ধুলো তাদের সর্বাঙ্গে ছাওয়া। তবুও নিজের প্রদেশ-পরিচয় লেখা রয়েছে তার মলিন পোশাকে।

এই রূপের স্রোত চলেছে টাঙ্গায়, রিক্সায়, পায়ে হেঁটে। দূর-গ্রামের মানুষ এসেছে মেষের গাড়ি, বলদের গাড়ি নিয়ে। ভারতের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য, ভারতের মলিন ছাইচাপা সোনা। আমি দু-হাতে কুড়িয়ে নেব এই সম্পদ।

চারিদিকে কলকোলাহল। গাড়ির ঘর্ঘর, ঘোড়ার খুরাঘাত, ঘুঙুরের বাজনা, রিক্সার জলতরঙ্গ। পথচলতি মেয়েরা গান ধরেছে। মেয়েদের দেখে মনে হয় তারা মাড়োয়ারের ঝি-বহুড়ি। হাত দিয়ে নথ নোলক সাপটে ধরে গান করছে তারা। গান চলেছে একটি টাঙ্গায়, মোষ-বলদের গাড়িতে। এই তো বিরাট মেলা। চলন্ত মেলা। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে হাতে হাত ধরেছে, আঁচল আঁচল বেঁধেছে সকলে।

তৃষ্ণার্ত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, কোথাও হাসি, কোথাও গান, কোথাও কান্না, কোথাও বিবাদ। ভাষা বুঝি নে, ভাব বুঝি নে সকলের।

সব যখন এমনি ভাঙা রেকর্ডের বিকৃত শব্দের মত তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে, তখন শুধু স্তব্ধ বনের মাঝে যেন একটি ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ভেসে এল 'ও নিধিরাম, বাবা নিধিরাম, কোথায় গেলি। আমি যে হাতছাড়া হয়ে গেছি বাপ। আমার হাত ধর, তোর কাছে টেনে নে।'

একটি ক্লান্ত মোটা গলার জবাব শোনা গেল আরও দূর থেকে, 'এই যে

পিসি, আমি এখানে। ভয় নেই, চলো। আমি তোমাকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি, তুমি হারাবে না। ভয় নেই !'

ভয় নেই। নির্ভয়ে চলো। কারা কথা বলছে। মানুষ দেখার যো নেই। কথা বলছে ভিড়। এক গানের ভাষা বুঝতে পারি নি, আর-এক গানের ভাষা বুঝতে পারছি। শুনতে পাচ্ছি খোলকরতালের ঝিমানো বাজনা, তার সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ।'

শুনেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বলরামের মুখ। কারা গাইছে। লক্ষ্মীদাসীর দল নাকি।

রাস্তার বাঁ দিকে একটা প্লেটে লেখা রয়েছে, কমলা নেহরু রোড, রাস্তার দু-পাশের কাঁচা অংশে ঝাঁট দিচ্ছে ঝাড়ুদারনীরা। বাঁশের ডগায় ঝাড়ু বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাঁট দিচ্ছে, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে যাত্রীদের। এক ফোঁটা জল নেই, ঝাঁট দিয়ে শুধু কেন ধুলো ওড়ানো হচ্ছে বুঝি নে। ধোঁয়ার মত ধুলো ছেয়ে ফেলল সারাটা রাস্তা। ঝাপসা হয়ে গেল হাজার হাজার মুখ।

এই রাস্তায় আজ আমরা চলেছি, কুম্ভের যাত্রীরা। যদি খুলে দিই এই রাস্তার পুরানো ইতিহাসের পাতা, তবে খুঁজে পাব বুঝি গৌতম বুদ্ধের পদরেণু। কান পাতলে শুনতে পাব বিজয়ী মৌর্যবাহিনীর পদশব্দ। দেখতে পাব মুগ্ধচিত্ত গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিসকে, চীন-পর্যটক ফা-হিয়েনকে। শুনতে পাব সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের রথচক্রের ঘর্ঘরানি। পদচিহ্ন খুঁজে পাব হিউ-এন সাঙ আর শঙ্করাচার্যের।

তবে, সে ইতিহাস প্রয়াগের। এলাহাবাদের নয়। গবেষকদের মতে, একসময়ে এই প্রয়াগের নাম ছিল বৎসদেশ। ত্রিশ মাইল দূরে, যমুনাকূলে ছিল তার রাজধানী কৌশাম্বী নগরী। প্রয়াগেরই নাম বৎসদেশ। তারপর মুঘলযুগের দুর্ধর্ষবাহিনী ছুটে এসেছে এই পথের উপর দিয়ে। মুঘলের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর প্রয়াগে এসে তার নাম রাখলেন ইলাহাবাস। ভিত্তি স্থাপন করলেন ইলাহাবাস দুর্গের। ক্রমে বাদশাহের রম্যভূমি হয়ে উঠেছে এই ইলাহাবাস। জাহাঙ্গীর তৈরি করলেন তাঁর শখের খসরুবাগ। শাজাহান ইলাহাবাসের নাম দিলেন ইলাহাবাদ।

তার পরেও ইলাহাবাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিদ্রোহী বুন্দেল। আর মারাঠাদের নির্ভীক অশ্ববাহিনী। আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণে রক্তে ভেসে গিয়েছে এলাহাবাদের মাটি। কখনো মুঘলের গোলা আর কখনো মারাঠীদের তলোয়ার অধিকার করেছে এই দেশ।

তারপরে অন্ধকার। অযোধ্যার নবাব দেনার দায়ে বিকিয়ে দিল এ দেশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে।

আর আজ চলেছি আমরা। আমরা ঐতিহাসিক যাত্রী নই; কিন্তু ইতিহাস রচিত হচ্ছে আমাদের মনে। আমাদের ইতিহাস আমরা।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উলটে পড়বার মুখে সামনে হাত বাড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করলাম। সামনে হাত বাড়িয়ে যে বস্তুটি ধরলাম, সেটি শ্যামার কলসী। রিক্সার সামনের চাকা খানিকটা বেঁকে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেছনে সর্বত্র আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে চলন্ত মিছিল। পুলিশ হাত তুলেছে মোড়ে।

তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। তাকিয়ে দেখি শ্যামা হাসছে খিলখিল করে।

বললাম, 'একেবারে দেখতে পাই নি।'

শ্যামা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। বলল, 'ঘরের কথা ভাবছিলে বুঝি?'

বলে আবার হাসি। আশ্চর্য। হাসি মেয়েটার রোগ নয় তো?

প্রৌঢ়া জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

শ্যামা আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে এবার নিঃশব্দে হাসল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কিছু না, বাঙালী ভাই আমার কলসী বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

কলসী বাঁচিয়ে দিলাম কেমন করে? কলসী ধরে তো নিজেকে বাঁচালাম। অবাক হয়ে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে শ্যামার দিকে তাকিয়ে আমার পথচলা মন চমকে উঠল।

অমন করে কী দেখছে শ্যামা? ঠোঁটের কোণে তার সেই সর্বক্ষণের হাসি চমকাচ্ছে। তার শাণিত চোখের খর তারা দুটি নেচে নেচে যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে আমার মুখে। সে চোখের দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মনের এক গোপন খেলার দুষ্টামিতে ভরা।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। নিজেই অপ্রতিভ হলাম। পথে লজ্জা পেতে হবে, সেকথা ভেবে বেরুই নি। পথে আবার লজ্জা কিসের। পথের দেখা পথেই শেষ হয়ে যাবে। জানি নে শ্যামা কতখানি নির্লজ্জ। জানি নে, শ্যামার এই উদ্ধত চটুলতার মধ্যে তার হৃদয়ের কোন গোপন লীলা নিহিত রয়েছে। তার নিজের লীলা নিয়ে সে চলে যাবে এক পথে, আমি ভেসে যাব অন্য পথে। আমি কেন লজ্জা পাব।

লজ্জা নয়, লোকলজ্জা। সামনে মানুষ, পেছনে মানুষ। মানুষ দিগন্ত-জোড়া। তার মধ্যে শ্যামা ভিন্ন হয়ে উঠছে, লোকলজ্জার কারণ সেইটুকুই।

উচ্চকণ্ঠের হাসি একরকম। নীরবে হেসে তাকিয়ে থাকা আর একরকম। অস্বস্তিও তো হয়।

বললাম, 'কী দেখছ ?'

বাতাসে ঝরা চুলের গুচ্ছ মুখ থেকে সরিয়ে দিল শ্যামা। তেমনি হেসে গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'আমি কোথায় দেখছি। দেখছ তুমি।'

তা বটে। আজ সকাল থেকে অনেকবার দেখেছি তাকে। ভেবে দেখি নি দেখব বলে। যে দেখা দেয়, তাকে না দেখে উপায় কী। পথ চলতে আকাশ না দেখে কে। বাগানে ফুল চোখে পড়ে না কার। শূন্যে ডিগবাজি খাওয়া, গান-পাগলা বিহঙ্গ কে না দেখতে পায় !

শুনেছি, তাও অনেকে দেখতে পায় না। আমি যে দেখব বলেই এসেছি। আর শ্যামাকে দেখতে পাব না, তা কেমন করে হয়।

কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিলাম এক কথা একরকম ভাবে। জবাব পেলাম আর-এক কথা, আর-এক রকম ভাবে। উপরন্তু পালটা অভিযোগ। এ অভি-যোগ, অভিযোগ না হয়ে যদি খেলা হয়, তবে শ্যামার কাছে হার মানা ছাড়া উপায় নেই। এই ব্যাপারে শ্যামাদের কাছে আমরা চিরকাল হার মানি।

আমাকে জবাব না দিতে দেখে শ্যামার চাপা হাসি ফেটে পড়তে চাইল। খানিকটা ঝুঁকে আবার জিগ্যেস করল, 'এবার বল, তুমি কী দেখছিলে ?'

শুধু শ্যামাকে দেখছি, সে তো মিছে কথা। তবু বললাম, 'তোমাকেই। তোমার আলতা-রাঙানো পা, তোমার ময়ূর-ছাপা শাড়ি···'

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল শ্যামা। এই সামান্য কথায় অন্যমনস্কতার ভান করতে হচ্ছে উদ্দাম রহস্যময়ী শ্যামাকে? জনতার মাঝে কি দেখবার জন্য মুখ ফেরাতে হল তাকে! আমাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে সেই অনুশোচনা, নাকি লজ্জা পেয়েছে?

কিন্তু অপ্রতিভ হতে চায় না শ্যামা। যেন আমার আগের কথা শুনতে পায় নি, এমনি ভাবে ফিরে বলল, 'গলাটা আমার এখনো ব্যথা করছে। গাড়ির ভিড়ে তুমি আর-একটু চাপ দিলে আমাকে মরতে হত।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইছে শ্যামা নিজেই। কিন্তু রহস্যের আভাস যায় না তার মুখ থেকে তবু। আবার বলল, 'ওই বাঙালী লুলা সাধুকে তুমি অমন করে ঘাড়ে নিয়েছিলে কেন? তোমার জান-পহ্‌চন নাকি?'

'না।'

'তবে?'

বললাম, 'তুমি আমার মত এই ক্ষীণ মানুষটার কনুই ধরে ঝুলে পড়েছিলে। কিন্তু তুমি তো আমার জান-পহ্‌চন নও।'

হাসির সঙ্গে বিস্ময়ের বিদ্যুৎলেখা খেলে গেল শ্যামার মুখে। তারপর হেসে উঠে বলল, 'আজীব আদমী।'

হাত উঠেছে পুলিসের। যানবাহনের মিছিল চলতে আরম্ভ করেছে আবার। এক হ্যাঁচকায় শ্যামাদের টাঙ্গা এবার এগিয়ে গেল অনেকখানি। কানে শুনতে পেলাম না, দেখলাম শ্যামা তার তিন সঙ্গিনীর সঙ্গে কী কথায় হাসিতে মেতে উঠল।

সামনে তাকিয়ে দেখি উত্তর-দক্ষিণের লম্বালম্বি রাস্তার পোস্টে লেখা রয়েছে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। আমরা চলেছিলাম পশ্চিম থেকে পুবে। কিছুটা অবশ্য কোণাকোণি। জনসমুদ্রের কলরোলের সঙ্গে মাইক-যন্ত্রের সেই চির-পরিচিত কান-পচা গান ভেসে আসছে।

মাথা তুলে দেখি বিস্তৃত মাঠের উপর তাঁবুর সারি। ভাবলাম, এই কি মেলা। বীচিবিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের মত তাঁবু আর চালাঘরের দিগন্তহীন সমুদ্র একদিকে। কিন্তু কি বিপদ! ঝাড়ুদারনীরা এখানে ধুলো নিয়ে যেন হোলি

খেলায় মেতে উঠেছে। বাঁ দিকে বিশাল প্রান্তর। একগাছা ঘাস নেই, একচ্ছত্র ধুলোর রাজ্য। জানি নে, কি সুখে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঝাড়ুদারনীরা, আর কি ভেবে তাদের হুকুম দিয়েছেন শহরের স্বাস্থ্যরক্ষী কর্তা। এদেশে কি একফোঁটা জল নেই!

বেলা যায়। কিন্তু অন্ধকার হয় নি। অথচ সামনে ধুলোয় অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভারী কুয়াশার মত ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সম্মুখ দিগন্ত। মানুষ তো দূরের কথা, ঘোড়াগুলি ঘড়ঘড় করে নাক ঝাড়তে আরম্ভ করেছে। অনেকে চলেছে গাধার পিঠে করে। সে বেচারীরাও ভেপু ফুঁকতে আরম্ভ করেছে।

আর কি নিদারুণ ব্যাপার! গাড়িঘোড়াগুলি সব ঢালু পথ বেয়ে হুঁ হুঁ করে নেমে চলল সেই ধুলো-মাঠের দিকে। জিজ্ঞেস করলাম রিক্সাওয়ালাকে, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

বলল, 'বাবু, এখানে সব গাড়ি দাঁড় করাতে হবে। গাড়ির টিকেট নিতে হবে। ছ-আনা পয়সা দিন।'

'এ আট আনার পথটুকু দুটাকায় রফা করেও আবার ছ-আনা কিসের?'

রিক্সাওয়ালা তার ঘর্মাক্ত ধুলোমাখা মুখে একগাল হেসে বলল, 'কানুন বাবুসাহেব। বাঁধ পর্যন্ত যেতে হলে টিকেট কাটাতে হবে। নইলে রিক্সা নিয়ে যেতে দেবে না।'

বলে সে এদিক ওদিক একবার দেখে, সোজা একটা টাঙ্গার কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল আমার রিক্সা। আবার সেই হাসি। ধুলোয় অন্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি টাঙ্গাটা শ্যামাদের। রিক্সাওয়ালার দেখছি নজরটা পরিষ্কার। কিন্তু এর জন্য বকশিশ দেওয়ার মত মনে আমার কোন প্লাবন আসে নি।

ছ-আনা পয়সা দিয়ে বললাম, 'জলদি আসবে।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে-মুখে চাপা দিলাম। বীজাণুর ভয়ে নয়। কেন-না, এখানে খারাপ বীজাণু থাকলে, দেবতারও সাধ্য নেই দেহে প্রবেশ করা তিনি রোধ করবেন। কিন্তু দম যে বন্ধ হয়ে আসছে।

কানের কাছেই একটি শব্দ শুনতে পেলাম, 'আহা, বেচারী!'

মুখ ফিরিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দেখি শ্যামার মুখ; কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি, সঙ্গিনীদের মধ্যে আর-একজনও এদিকে তাকিয়ে আছে। ধুলো তাদের চোখ বন্ধ করতে পারে নি। সেই সঙ্গিনীর পেছনের দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেলাম। সর্বনাশ! বুড়ো আমার দিকে প্রায় একটা ক্ষিপ্ত বাঘের মত এক নজরে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম, লোকটির দোষ নেই। অভিভাবক হয়ে আর কতক্ষণ এ আলাপন সে সহ্য করবে।

শ্যামাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই বুড়ো মানুষটি কি তোমার বাবা?'

'বাবা! হট্‌! বাবা কেন হবে?'

কথা কটি অত্যন্ত দ্রুত ছিটকে বেরিয়ে এল শ্যামার গলা থেকে। ঠাওর পেলাম না, মনে হল হেসেই মুখটা সরিয়ে সে অন্য দিকে তাকাল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে?'

জবাব না পেয়ে মুখ তুলে দেখি, শ্যামা দূরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এমন গাম্ভীর্য ও অন্যমনস্কতা তার! আশ্চর্য! একি ধুলোর ধাঁধা দেখছি, না সত্যি একটা ছায়া ঘনিয়ে এসেছে শ্যামার মুখে। আর কিছু না জিজ্ঞেস করাই উচিত ছিল। কী-ই বা পরিচয়। তবু কৌতূহল চাপতে পারলাম না! বললাম, 'বললে না?'

অন্ধকারে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তীক্ষ্ণ হাসি চমকে উঠল শ্যামার মুখে। বলল, 'আমার স্বামী।'

স্বামী! ওই অশীতিপর বৃদ্ধ! এও শ্যামার রহস্য নয় তো। কিন্তু ফিরে আর সে বিষয়ে প্রশ্ন করার সাধ্য ছিল না আমার।

প্রৌঢ়াকে দেখিয়ে বললাম, 'উনি?'

তেমনি হেসে শ্যামা বলল, 'আমার সতীন।'

'আর এরা দুজন?'

'একজন আমার সতীনের বোন, আর-এক জন নোকারনী।'

আমার ঠোঁটের ডগায় হু হু করে একরাশ প্রশ্ন ছুটে এল। কিন্তু একরাশ এলেই তো হয় না। রাশ টানতে হয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কী জাত?'

শ্যামা বলল, 'ভুঁইহার।'

ভুঁইহার। জানা ছিল আমার। ভুঁইহারেরা ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মতই বর্ণহিন্দু। শুনেছি, তাহাদের কৌলীন্যপ্রথা বড় প্রবল। মনের মত পাত্র না জুটলে মেয়েকে অনেক সময় আজীবন কুমারী থেকে বাপের ঘরে কাটাতে হয়। বাঙালীর ছেলের কাছে এ জিনিস নতুন নয়। কৌলীন্যপ্রথার কাছে অনেক বাঙালী কুমারী নিজেকে আহুতি দিয়েছেন। ভুঁইহারদের কথা যখন শুনেছিলাম, তখন বাঙলার কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে তুলনা করতে পারি নি। আজ চোখের সামনেই দেখছি সেই বাস্তব চিত্র।

কিন্তু শ্যামার এমন কি বয়স হয়েছে যে, কুমারীত্ব ঘোচাবার জন্য ওই লোলচর্ম বৃদ্ধের অঙ্কশায়িনী হয়েছে সে। ভুল ভাবলাম! অঙ্কশায়িনী হয় নি, করা হয়েছে। শুনেছি, এদের অর্থের অভাব নেই। অধিকাংশ ভুঁইহার পরিবারই ধনী। সান্ত্বনা বোধকরি সেইটুকুই।

কিন্তু তাকাতে ভরসা পেলাম না আর শ্যামার দিকে। একবেলার পরিচয়। পুণ্যার্থী নয়, বোধহয় সামান্য একজন মুসাফির ছাড়া তার কাছে আমার আর-কোন পরিচয় নেই। আমরা কেউ কারুর জীবনধারণের রীতি জানি নে। পথ চলার সামান্য হৃদ্যতা। এই হৃদ্যতা চলতে থাকলে বন্ধুত্ব জন্মায়। বোধ-করি, তার-ই ক্ষীণ সূত্রপাতও হয়েছে। তা ছাড়া শ্যামার মত মেয়ের অপরিচয়ের বাধা ভেঙে ফেলতে বেশী সময় লাগে না।

তবু তাকাতে পারলাম না। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত যে হাসি তার মুখে দেখেছি, সে হাসি যে সমস্ত পুরুষ জাতির হৃদয়ই পুড়িয়ে দিতে পারে। আকাশের বিদ্যুৎ যখন বজ্র হয়ে নেমে আসে, তখন রূপবতী সৌদামিনী আগুন হয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে।

চাপা ও তীব্র কণ্ঠে শ্যামা বলে উঠল, 'কই, আর-কিছু জিগ্যেস করলেন না?' বলে হেসে উঠল খিলখিল করে।

কিন্তু আর ও-হাসিতে ভোলার কিছু নেই। যে বলিষ্ঠ ঘোড়ার দুরন্ত দৌড়ের কান-ফাটানো টকাটক শব্দ শুনে ভেবেছিলাম প্রসন্নময়ের মুক্ত দূত ছুটে আসছে, এখন দেখি সে সার্কাসের ঘোড়া। সে আছে তারের বেড়ার ঘেরাওয়ের মধ্যে। গতি নির্ধারিত তার চাবুকের নির্দেশে।

তার হাসি শুনে প্রৌঢ়া আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে শ্যামা ?' মুহূর্তে মুখভঙ্গী বদলে শ্যামার ঠোঁট বেঁকে উঠল। আমার প্রতি বিদ্বেষের বাঁকা কটাক্ষ করে বলে উঠল, 'দেখ না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে কত কথা জিগ্যেস করছে। ও কে, সে কে, কী জাত। কেন রে বাবা ?'

'তাই নাকি ?'

তারা সকলে হেসে উঠল। যেন আমাকে অপমান করবার জন্যই শ্যামা একটি নিতান্ত গ্রাম্য মেয়ের মত হঠাৎ ন্যাকা হয়ে উঠল। যেন প্রতিশোধ নিতে চাইল আমার কোন কৃত অপরাধের।

আমার অপ্রতিভ হওয়ার কথা। কিন্তু শ্যামার এই চকিত রঙ বদলানোর বহুরূপিণী রূপ আমাকে একটুও বাজে নি। তাদের সশব্দ হাসির সঙ্গে আমিও হেসে উঠলাম নীরবে।

শ্যামার বিদ্বেষ তো আমার প্রতি নয়। বিতৃষ্ণা তার এ সংসারের প্রতি। অসতর্ক মুহূর্তে নিজেকে সামান্যতম প্রকাশ করে ফেলতেও মর্যাদাহানি ঘটেছে তার। সেই অপমানের জ্বলুনিটুকু সে রেখে গেল।

আর কিছু বলবার সাধ ছিল হয়তো শ্যামার। কিন্তু তাদের টাঙ্গা দুলে উঠল। টিকেট কেটে এনেছে টাঙ্গাওয়ালা।

মনে মনে প্রার্থনা করলাম, বলুক, বলে যাক শ্যামা যা তার প্রাণ চায়। এই জনারণ্য হয়ে উঠুক তার কাছে দুর্গম বন-জঙ্গল, আমি রইলাম সেই বনের বিষডোবা হয়ে। সেখানে তার সঞ্চিত বিষ ফেলে দিয়ে সে চলে যাক অমৃতকুম্ভে ডুব দিতে। পুণ্যসঞ্চয়ে ভাসুক প্রাণসঞ্চারের সঙ্গম।

কিন্তু তা হয় না। তাদের টাঙ্গার চাকা ছুটো। একটা তীব্র আর্তনাদ করে এগিয়ে চলে গেল। ধুলোরাশির উপর ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে গেল আরও খানিকটা।

কিছুক্ষণের জন্য জনারণ্যের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল আমার কানে। উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম শ্যামার দিকে। এবার সেই মিলিত হাসির ঝঙ্কার শুনব বলে।

শ্যামা এদিকেই তাকিয়ে ছিল। গাড়ি চলতে চলতেই ঠোঁটের কোণের

বিদ্বেষটুকু অদৃশ্য হয়েছে। বিদ্বেষ নেই, আনন্দ নেই, হাসিও নেই। মুখ তার হঠাৎ ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি চলে গিয়েছে শূন্যে। চোখে তার তীব্রতা নেই, জ্যোতি নেই। সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার পেছনেই চকিতের জন্য জলতে দেখলাম, বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের ভ্রূ-ঢাকা একজোড়া চোখ। তারপর ধুলো-আস্তরণের ভাঁজে ভাঁজে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই টাঙ্গা।

আর হাসি শোনা গেল না। ধূলি-ধূসরিত এই যানবাহন ও জনতাপূর্ণ প্রান্তর যেন পাতালের বদ্ধ জলের আবর্তের মত নিঃশব্দে পাক খেয়ে ছটফট করে উঠল।

উঃ, কী ধুলো! ধুলোয় অন্ধ হয়ে গিয়েছে আমার চোখ। মুখ বিস্বাদে ভরে গিয়েছে, কিচকিচ করছে ধুলোয়।

জীবনযুদ্ধে প্রাণ তিক্ত হলাহলে পূর্ণ। পথে বেরিয়েছি নিতান্ত একান্তে নিজের হৃদয়-একতারায় সুর তুলে। সেখানেও একটানা আনন্দ থাকবে কে বলেছে? সুরে যদি বেসুর না বাজে, তবে আর বাজিয়ে বেড়াবার কী প্রয়োজন ছিল। কিছুক্ষণ পরেই এল রিক্সাওয়ালা। ধুলোমাঠ থেকে ছুটে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল রিক্সা। বাঁধের পথের দুদিকে বিপণি সাজিয়ে বসেছে ব্যবসাদারেরা। একটি একটি করে আলো জ্বলে উঠছে এখানে-সেখানে। কোলাহল ক্রমে আরও বাড়ছে।

চোখ ভরে দেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এতক্ষণে ক্লান্তি এসে গ্রাস করছে। বুজে আসছে চোখ। বুঝেছি গন্তব্য আগতপ্রায়। তবু মন বলছে আর কতদূর।

রিক্সা থামল। বললে, 'বাবু এই যে বাঁধ।'

তাকিয়ে দেখি, সামনেই পথ বন্ধ। বাঁধের উঁচু জমি আড়াআড়ি চলে গিয়েছে উত্তর-দক্ষিণের কোণাকোণি। যেতে হবে বাঁধের ওপারে।

রিক্সাওয়ালাকে পয়সা দিয়ে বাঁধে উঠে এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম। অদূরেই গঙ্গা। উত্তর থেকে দক্ষিণে তীব্র স্রোত ছুটে চলেছে। বারো মাসের অন্ধকার গঙ্গার তীর আজ বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছে। তারই আলোর ঝলক গঙ্গার পূর্বতীরের বাঁকা স্রোতে শাণিত বঙ্কিম অস্ত্রের মত ঝিকমিকিয়ে উঠেছে।

ওপারের আধো আলো, আধো অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তাঁবু-সমুদ্রের ঢেউ। সন্ধ্যার গাঢ় ধূসরতায় ঢেকে গিয়েছে পেছনের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। আর পূর্বে মাথা উঁচিয়ে উঠেছে উঁচু ভূমির বুকে গাছপালা-ঘেরা গ্রাম। হয়তো ওখানেই আছে কোথাও সমুদ্রগুপ্তের উঁচু টিলার বুকে কাটানো কূপ।

আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না এখন। দক্ষিণে দেখতে পাচ্ছি ঘষা রুপার পাতের মত একটা চলন্ত জলের ধারা।

এই প্রয়াগ (প্র = প্রকৃষ্ট, যাগ = যজ্ঞ)। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট স্থান হল প্রয়াগ। পুরাণ শাস্ত্রের প্রজাপতি-ব্রহ্মার যজ্ঞদেবী, যজ্ঞের মধ্যবেদী এই প্রয়াগ। প্রজাপতের্যজ্ঞ আসীৎ প্রয়াগে। ভারতের আদিম যুগের ধর্মীয় ইতিহাসের লীলাক্ষেত্র। পৃথিবীর প্রথম যজ্ঞের ধূম সঞ্চারিত হয়েছে এখানকার মাথার উপরের আকাশে। প্রয়াগ সেই পুণ্যভূমি।

সিতাসিতে সরিতে যত্র সঙ্গতে
তত্রাহপ্লুতাসো দিবমুৎপতন্তি।
যে বৈ তন্বং বিসৃজন্তি ধীরাঃ
তে বৈ জনাসোহমৃতত্বং ভজন্তে॥

কিন্তু তা তো হল। ঘরবাসী মানুষ, পথে বেরিয়েছি। মাথা গুঁজব কোথায়! ঠাঁই নিশানা করে বেরুই নি, খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু এই মুক্ত আকাশের বুকে, উত্তরঙ্গ তাঁবু-সমুদ্রের কোথায় ঠাঁই পাব, সে কথা তো একবারও ভাবি নি। মন বাউল হোক, হৃদয় হোক বৈরাগী, তবু ইতিমধ্যেই শীতে যে রকম কুঁকড়ে উঠেছি, আচ্ছাদন না পেলে তো নিছক বাউলের মতই মরতে হবে।

সব ছাড়তে পারি, কিন্তু প্রাণ ছাড়তে পারি নে। তাড়াতাড়ি ঠাঁই খোঁজার জন্য নেমে গেলাম বাঁধের নীচে।

বাঁধের নীচে নেমে দেখলাম, জমকালো ব্যবস্থা। সে জমকালো ব্যবস্থা দেখবার মত চোখ বা মন কোনটাই এখন নেই। কালকে এ সময়ে প্রায় ঘর

ছাড়ার উদ্‌যোগ করেছিলাম, আজ এখনো মাথা গুঁজতে পারি নি কোথাও। চোখ আর মনের দোষ দিতে পারি নে।

সামনে লোক, পেছনে লোক, লোক ডাইনে বাঁয়ে। এখানে কারুর গতি একমুখী নয়। বহুমুখে চলেছে জনতার মিছিল। সকলেই চলেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। আমি ঝোলাঝুলি নিয়ে একবার এদিকে ধাক্কা খেয়ে ওদিকে যাই, .ওদিক থেকে এদিকে। বেশীর ভাগই যেন চলেছে গঙ্গার ওপারে।

ওপারে যাওয়ার জন্য রয়েছে অস্থায়ী সেতু। ভাসন্ত সেতু। আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের জন্যই এই সব সেতুর প্রয়োজন। পাশেই রয়েছে সামরিক বাহিনী ও পি. ডব্লিউ. ডি.-র ক্যাম্প। উর্দি-পরা সৈনিকেরা দেখলাম পুলের উপর যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছে। সারি সারি আলোকমালা জ্বলে উঠেছে পুলের উপর। তীব্র স্রোতে তার প্রতিবিম্ব হারিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কাছাকাছি মনে হল, দুটো মাত্র পুল রয়েছে।

কিন্তু ওপারে গিয়েই বা কী করব। যাব কোথায়। দেখতে পাচ্ছি, ওপারের হালকা কুয়াশার আড়ালে জ্বলছে অজস্র আলো, অজস্র ধূসর বর্ণের তাঁবু। মানুষ আসছে শত শত, যাচ্ছে হাজার হাজার। এপারে ওপারে মাইক-নিনাদিত স্তোত্র, ভজন, কীর্তন ও পুণ্যার্থীর কোলাহলে দিগন্ত মুখরিত। কিন্তু আমি যাই কোথায়।

মন পাগল হয়েছিল, কিন্তু এখন পাগল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় কী করে। সামনেই একটা বটতলায় দেখলাম, থরে থরে খাবার সাজানো রয়েছে। সর্বনাশ! সারা দিনটাতে যে চা-সিক্ত প্রাণ বাউল হয়েছিল সে প্রাণ খাবার দেখেই মুহূর্তে ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল। সেই তেলসিঁদুর আর ভবীর ব্যাপার। পোড়া পেট যে বাউল হয় না, বৈরাগ্যও মানে না। খাবার দেখা মাত্র চকিতে ক্ষুধার্ত চোখ পড়ে ফেলল, 'খাঁটি ঘিউকে পুরী, দুধকে মালাই, লাড্ডু, প্যাঁড়া, সন্দেশ···।' থাক থাক, আর পড়ে লাভ নেই। ইতিমধ্যেই চোখের ভিতর দিয়ে সে মরমে পশেছে। এবার মরমের রস জিভ দিয়ে গড়াবার যোগাড় হয়েছে। তবে এই প্রয়াগ কা লাড্ডু এখন দিল্লী কা

লাড্ডুর সমান। খেলে ভেদবমি হবার আশঙ্কা খুবই, না খেলেও জিভের জল তো কারুর হাতধরা নয়।

এদিকে 'ইদ্‌ধে যাও' 'উধার হটো', নানান প্রাদেশিক বুলি ও ধাক্কা খেতে খেতে সরে এসেছি অনেকখানি। সামনেই দেখলাম, একটি তাঁবুর গায়ে সাইনবোর্ড ঝুলছে, এনকোয়ারি। দেখি, এনকোয়ারিতে এনকোয়ারি করে কিছু মেলে কি না।

আগে থাকতে শুনি নি কিছুই। ভেবেছিলাম ভারতবর্ষের ধর্মীয় পীঠস্থান প্রয়াগ। পাণ্ডাদের জ্বালায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারব না। আপনিই আশ্রয় যোগাড় হয়ে যাবে। কথায় বলে, ধরলে যম ছাড়তে পারে, পাণ্ডা ছাড়ে না। কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা না ছিল এমন নয়।

বছর কয়েক আগে একবার অসময়ে পুরী যেতে হয়েছিল। অসময় মানে, মরসুমের বাইরে। শুনেছি কোন কোন সময়ে, বনগাঁযের ইয়ে রাজা থেকে শুরু করে ভুতো-গদা-পুঁটিরা, স্বপ্না-শিপ্রা-শুভ্রা বাহিনী, আওয়ারা গ্যাং, কলমদ্বেষী কেরানী, বাগ্মী অধ্যাপক ও জাদুকরী কলমবাজ সাহিত্যিক বিদগ্ধজনেরা সকলেই পুরীর সমুদ্রসৈকতে মরসুমী ফুল হয়ে ফুটে থাকেন কিছুদিনের জন্য। মরসুমী ফুল হওয়ার সুযোগ পাই নি। মেঘভারাতুর আকাশ আর নিয়ত-ক্ষিপ্ত ভয়ঙ্করমূর্তি সমুদ্রের দারুণ ঝাপটায় আমার মত অনামী ফুলের সব পাপড়িগুলি ঝরে গিয়েছিল।

যাক সে কথা। পুরী স্টেশনে দেখেছিলাম, যাত্রীর দ্বিগুণ পাণ্ডাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের উপর। যেন একরাশ মানুষের উপর ক্ষুধার্ত সিংহবাহিনী। কে কাকে সাপটে নেবে সেই চিন্তা। আমি একলা মানুষ কোন রকমে যদিও বা পাণ্ডাব্যূহ ভেদ করে রিক্সায় উঠেছিলাম, খানিকটা এগুতেই দেখি এক আধ-বুড়ো চলন্ত রিক্সাতে উঠেই আমার পাশে বসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? সে একগাল হেসে তার নাম ধাম পরিচয় দিলে। বুঝলাম, সে পাণ্ডা। আরও বুঝতে হয়েছিল, বাঙলাদেশের অনেক নামী ও মানী পরিবারের সে পাণ্ডা। অতএব তার নিজস্ব মন্দিরেই আমার প্রথম প্রবেশ। কিন্তু কোনরকমে যদিও বা তার এঁটো-কাটা-

ছড়ানো ভয়াবহ পিছল পাতকুয়ো-তলা থেকে ফিরে এসেছিলাম, খেতে বসে কান্না পেয়েছিল।

হলুদ-গোলা ফ্যান হল ডাল, আর কচুর তরকারি দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে আলুর তরকারি। কাছে বসে আত্মীয়তা করছিল পাণ্ডা আর হাতির মত ফোলা দুটি পা নিয়ে তার বউ। খেতে দিচ্ছিল একটি কলা বৌ। ঘোমটার নীচে দেখা যাচ্ছিল তার দোলানো নোলক আর ছুঁচলো স্থূল ঠোঁট।

সে রকম হলে, পরিবেশ একটি বাঙালী গৃহস্থের দ্বিপ্রাহরিক রান্নাঘরের সুখে দুঃখে ভরে উঠতে পারত। কিন্তু এখানে স্নেহ ও অনুরাগ-ভরা উপরোধ ও এক হাতা ঘণ্ট থপাস করে পাতে ফেলে দেওয়ার ব্যাপার নয়। কচু দিয়ে আলুর দাম নেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র।

শুনলাম দেড় টাকা এর দাম। দুবেলায় তিন টাকা হয় বটে, আট আনা গ্রেস দেওয়া হবে। এ ছাড়া জগন্নাথের মন্দির দর্শন করবার দর্শনী তো আছেই।

মাথায় থাকুন আমার জগন্নাথ ঠাকুর। জানি না কচুকে আলু করতে পারেন কি না তিনি। মাথায় দিই তাঁর লীলাভূমির ধুলো নিয়ে। দেড়খানি রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে গলার জ্বলুনি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম সমুদ্রতীরে। কপাল ভাল, আকাশে ছিল মেঘলা ভাঙা রোদ। দিগন্তহীন শান্ত সমুদ্র প্রাণ-ভোলানো হাসির লহর তুলে সম্বোধন ও সংবর্ধনা জানিয়েছিল আমাকে। সেই ছিল আমার সান্ত্বনা, আমার কচুজ্বলুনি গলায় অমৃতের প্রলেপ, আমার জগন্নাথ দর্শন।

যাক। একেবারে গল্প ফেঁদে বসেছি। প্রয়াগ থেকে ছুটে গেছি সমুদ্রে। গল্প বলার নেশা ছাড়তে পারি নে। কথা হচ্ছিল পাণ্ডা নিয়ে। কিন্তু এখানে পাণ্ডার প্রাদুর্ভাব অন্তত আমার চোখে পড়ল না। পড়লে সদগতি হোক আর দুর্গতি হোক, গতি একটা হত।

'এনকোয়ারি' ক্যাম্পে ঢুকে দেখলাম, এক জন পুলিশের অফিসার বসে কী লিখছেন আর সেপাই একজন রয়েছে দাঁড়িয়ে। বললাম, 'দেখুন মশাই, আপনাকে একটা কথা—'

অফিসারটি লেখনী বন্ধ করে চকিতে একবার আমার আপাদমস্তক দেখেই আবার নিজের কাজে মন দিয়ে বললেন, 'আপ ফোটো খিচনে মাংতা হ্যায় না? আই অ্যাম সরি, মেলা-কা ফোটো খিচনা বিলকুল মনা হ্যায়।'

মেলা-কা-ফোটো! সামনে আয়না নেই, তবু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার। ধূলি-ধূসরিত জামা-কাপড়ের আসল রঙ চেনা দায়। তাহলে মাথা-মুখের অবস্থা কী হয়েছে, সেটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। কাঁধে ওভারকোট, দুহাতে ঝোলা। গলায় ক্যামেরাও ঝোলানো নেই, পোশাকটাও যা হোক আর ট্রাভেলারের মত রম্য নয়। ফোটোর কথা কেন এল ভেবে বিস্মিত হলাম। বুঝে নিলাম, মেলার ফোটো তোলা নিষিদ্ধ হয়েছে। বললাম, 'ফোটোর কথা বলছি না। বলছিলাম, এখানে কোথায় আশ্রয় পেতে পারি, বলতে পারেন?'

এবার অফিসারটি বিস্মিত হয়ে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'কেন, আপনি যেখানে খুশি আশ্রয় নিতে পারেন। কোন আশ্রমে কিংবা পাণ্ডাদের ক্যাম্পে। নয় তো আপনি নিজেই বেড়ার ছাউনি দিয়ে আশ্রয় তৈরি করে নিতে পারেন। কোত্থেকে এসেছেন?'

বললাম, 'কলকাতা।'

অফিসারটি এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'আপনি রামকৃষ্ণ আশ্রম কিংবা ভারত সেবাশ্রমের ক্যাম্পে খোঁজ করলে আপনার সুবিধা হতে পারে।'

কেন সুবিধা হতে পারে, সেটা উহ্য রেখেই তিনি আবার কাজে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু আবার আমাকে জিজ্ঞেস করতে হল, 'আচ্ছা, বলতে পারেন, সেবাশ্রম সংঘটা কোথায়? কিংবা রামকৃষ্ণ আশ্রম?'

মুখ না তুলেই তিনি বললেন, 'একটা বাঁধের ওপারে, আর-একটা গঙ্গার ওপারে।'

বলে তিনি অত্যন্ত দ্রুত গলায় সেপাইটিকে কী নির্দেশ দিতে লাগলেন। বুঝলাম, আমার এনকোয়ারির পালা শেষ। এবার আমাকে বাঁধের ওপার অথবা গঙ্গার ওপার বেছে নিতে হবে। যে কোন ওপার ছাড়া গতি নেই।

কতদূর চলে মনে মনে হাঁপিয়ে মরছিলাম। ভেবেছিলাম, এসে পড়েছি। কিন্তু সে যে কতদূর এখনো, কে জানে।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই, মনে হল শিস দিয়ে উঠল একটা চাবুক আর সর্বাঙ্গে কেটে বসল তার আঘাত। একবার শিউরে উঠে সামলাতে না সামলাতে আর-একটা ঝাপটা। সর্বনাশ! শীতের প্রকোপ যে এত ভীষণ তা জানতাম না। তাড়াতাড়ি ঝোলা নামিয়ে ওভারকোট চাপালাম গায়ে।

সন্ধ্যার পরমুহূর্তের এই সময়টা অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। ধুলো আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে চারদিক। আলো থাকা সত্ত্বেও আপাদমস্তক ঢাকা মানুষগুলি ছায়ামূর্তির রূপ ধরেছে। আধা-অন্ধকার মঞ্চের এক গোপন রহস্য দৃশ্য হয়ে উঠেছে সঙ্গমের উন্মুক্ত আকাশতলে। তারই মাঝে ছায়ামূর্তির খেলা।

এ-সবই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত মস্তিষ্কের আজগুবি স্বপ্ন কি-না বুঝতে পারছি না। কাছে এত ভিড় ঠেলাঠেলি, এত কল-কোলাহল। তবু মনে হচ্ছে সবই অনেক দূরে। যেন শীতের নিশীথে আমি দাঁড়িয়ে আছি এক গ্রামের সীমান্ত মাঠে। আমার কানে ভেসে আসছে সেই গ্রামের কোলাহল। অস্পষ্ট, অথচ কত স্পষ্ট। ঝাপসা, অথচ সবই দৃশ্যমান।

হঠাৎ আমার মন বেঁকে বসল। থাক, যাব না কোন আশ্রয়ের সন্ধানে। একবারও নিজের মন খোঁজার চেষ্টা করলাম না। একটু ছলও খুঁজলাম না। কেবল মনে হল, এইটুকু দেখবার জন্যই তো এসেছিলাম। এইটুকু আরও প্রাণভরে দেখব। কী করে মনে এ ভাবের উদয় হয় জানি নে। এ কিসের হতাশা, কিসের গ্লানি, বুঝি নে। এ কি নিজের মন থেকেই কোন অভিমানের সৃষ্টি, না কি নিজেকে পীড়ন করার এক ভয়াবহ বিলাস-বাসনা সুপ্ত রয়েছে আমার মনের মাঝে, তাও আন্দাজ করতে পারি নে। দূরে ফেলে এসেছি জীবনধারণের সংগ্রাম। সেখানে প্রতি মুহূর্তে বাঁচার অভিযান। এখানে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার তেমন কোন নির্দয় ইচ্ছা নেই, তবুও ভাবলাম, পড়ে থাকব এই বালুপ্রান্তরে। কেন আবার নিজের ভাবনায় অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করব এখানেও। রাত কেটে যাবে, সম্ভবত কেটে যাবে এখানে থাকার অঙ্ক-কষা দিনগুলিও। যে মনকে ফাঁকা ভেবে এসেছি ছুটে

তাকে ভরে নিয়ে যাব চলে। তবু আর টেনে নিয়ে যেতে পারি নে। দেহের চেয়ে মন ভারী। এর বাড়া ভারী সংসারে আর কী আছে।

আমি নয়. হঠাৎ চমকে উঠল আমার কানের পর্দা। কী শুনলাম! কার গলা শুনলাম! চকিতে শিথিল দেহ ঝাড়াপাড়া দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ভিড়ের দিকে ধুলোভরা দুচোখ তুলে ধরলাম আকুল আগ্রহে।

দেখতে পেলাম না, কিন্তু আবার শুনতে পেলাম ফাটা বাঁশের চেরা গলা, 'আর জ্বালাস নি আমাকে পেল্লাদ। এবার আমি গঙ্গায় ডুবে প্রাণটা দেব।'

জবাবে পেল্লাদের ক্রুদ্ধ হেঁড়ে গলা শোনা গেল, 'যা খুশি তাই করগে যা। আমি আমার পরিবারকে নিয়ে কাল চলে না যাই তো—'

'খবরদার পেল্লাদ, দেবতার থানে দিব্যি কাটিস নে।'

'কাটব। হাজারবার দিব্যি কাটব। দেখি আমাকে কে কী করতে পারে।'

'কাট, কাট তাহলে। ছ্যাখ, আমিও গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে পারি কি-না।'

কিন্তু পেল্লাদের সেই এক কথা, 'কাটবই তো। তুই দে ঝাঁপ। শালা, জন্মে অবধি গায়ে কোনদিন ছুঁচ ফুটাই নি আর তার কিপটেগিরির জ্বালায় আমাকে তো নিতেই হল, আমার পরিবারকেও কিনা ছুঁচ ফোটালে। এখন যদি একটা কিছু হয়?'

'আর আমার এই বুড়ি হাড়ে বুঝি ছেড়ে দিয়েছে রে ড্যাকরা?'

এবার কার মোটা গলা শোনা গেল, 'আঃ, তোমরা এবার থামো দিকি নি বাপু।'

উঃ, সেই নাটক। এখনো তার শেষ হয় নি। এর দেখছি বিরাম নেই, অঙ্ক নেই, বোধ হয় যবনিকাও পড়বে না। শুধু বহির্দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে মাত্র।

কিন্তু আমার মনটা হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল। আহা, ফাটা বাঁশের চেরা গলা ও প্রহ্লাদের হেঁড়ে গলা যে এমন মিষ্টি, তা কে জানত। এ যে ডুবন্ত মানুষের খড়-কুটার আশ্রয়। কেন পড়ে থাকব এই বালুপ্রান্তরে। কিসের গ্লানি, কিসের হতাশা।

ওই তো! ওই তো দেখতে পাচ্ছি প্রহ্লাদ ভিড় ঠেলে চলেছে। তার অত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো শাল খুলে পড়েছে। এক হাতে ধরেছে দিদিমাকে, আর-এক হাতে বউকে। বউ তো নয়, প্রহ্লাদের ভাষায় পরিবার। বাবা, হারিয়ে যাবার ভয়ে এত হাত ধরার কষাকষি, তার মধ্যেই গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ও দিব্যি কাটার ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা চলছে। তাহলে তাদের তিনজনকেই ইনজেকশন নিতে হয়েছে। যাক বাঁচা গেল। রুগীকে কোন কোন সময় ওই ভাবেই জোর করে ওষুধ দিতে হয়।

ভিড় ঠেলে তাদের কাছে গেলাম। প্রথমেই নজর পড়ল দিদিমার। আর যাই কোথায়? অমনি খেঁকিয়ে উঠলেন, 'থাক, আর দাঁত বের করে হাসতে হবে না।'

সত্যি। তাড়াতাড়ি দাঁত ঢাকবারই ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কী করব। তাদের আগ বেড়ে ইনজেকশন নিয়েছি, অপরাধ তো আমারই।

প্রহ্লাদ বলল, 'অ্যাই যে মশাই, ব্যাটারা ছাড়লে না কিছুতেই। কুট করে দিলে ঢুকিয়ে।' বলেই গলার স্বর পরিবর্তন করে বলল, 'উঃ, কী ব্যথা! নির্ঘাত আমার জ্বর এসেছে।'

অমনি দিদিমা বলে উঠলেন, 'ফের সেই অলক্ষুনে কথা। কখখনো তোর জ্বর আসে নি।'

'আমি বলছি এসেছে। আমার যদি কিছু হয়······'

হঠাৎ একটা গোঙানি শুনে তাকিয়ে দেখি বুড়ি দিদিমা উদ্গত চোখের জল চেপে বিড়বিড় করে বলছে, 'ভগবান, ওর কথা যেন মিথ্যে হয়। আমি এত দুর থেকে ছুটে এসেছি, আর আমার পেল্লাদের তুমি জ্বর করে দেবে?'

কী জানি প্রহ্লাদ টের পেয়েছে কি-না। সে কিন্তু গলার স্বর একটু নামিয়েছে। জ্বর আসে নি, প্রহ্লাদের ওটা মন-জ্বর। একবার যখন পেয়ে বসেছে, ও সারতে দেরি হবে। সে আমাকে উদ্দেশ করে বকবক করেই চলল, 'মোশাই, এমন কিপটে বুড়ী, রোজ দুআনা করে পয়সা দিতে আমার কালঘাম বার করে ছাড়ে। রোজ নয়, মাসে নয়, বছরেও নয়, একবারের জন্য ছটা টাকা। দিলে তো কাউকেই এ ভোগ পোয়াতে হত না।'

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'রোজ দুআনাটা কিসের ?'

হিক্কা তোলার মত সরু গলায় হি হি করে হেসে উঠল প্রহ্লাদ। পরমুহূর্তেই আবার বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'আর জিজ্ঞেস করবেন না মোশাই, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওঃ, দু দুটো দিন নিরম্বু উপোস যাচ্ছে। আগে জানলে কোন শালা আসত এখানে।'

কথাটা না বুঝে তার দিকে তাকালাম। সে আমার দিকে একটু ঝুঁকে গলা নামিয়ে বলল, 'বুঝলেন না ? আপনি দেখছি নেহাত অকম্মা। আরে মোশাই, বাবার পেসাদ, বুঝলেন, বাবার পেসাদ। যাকে বলে কলকে সেবা।'

'মানে, গাঁজা ?'

প্রহ্লাদ জিভ কেটে বলল, 'ছি, ও কথা বলতে নেই।'

পাশ থেকে দিদিমার গলা শুনতে পেলাম, 'মরণ! ওর মুণ্ডু বলতে নেই। নেশাখোর যম, তীর্থ করতে এসেও আমার হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছে। বলি ও পাঁচ-বখ্খি, কোমর যে ভেঙে গেল বাবা, আর কদ্দুর ?'

এতক্ষণে সামনের লোকটি মুখ ফেরাল। অর্থাৎ পাঁচ-বখ্খি। পাঁচ-বখ্খি কেন, অত বড় চেহারাটার নাম দশ-বখ্খি হলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু মুখটা দেখে শিউরে উঠলাম। মনে হল, নিষ্ঠুর লগুড়াঘাতে কেউ ফুলিয়ে দিয়েছে লোকটার মুখ। মাথাটা সামনে পেছনে নোড়ার মত লম্বা। কপালটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনের দিকে, চোখের কোল দুটো ঢুকে গিয়েছে ভেতরে। থ্যাবড়া নাক, মোটা ঠোঁট। নাম পাঁচ-বখ্খি। কেন, তা জানি নে। কিন্তু পরনে রয়েছে ফুলপ্যাণ্ট আর বুশ শার্ট। কোট চাদর কিছুই নেই। তবু এই শীতে সে একটুও কুঁজো হয়ে পড়ে নি। বলল, 'এই পুলটা পার হয়ে খানিকটা যেতে হবে।'

বলে একবার আমার দিকে ফিরল। চোখ না দেখলেও বুঝলাম, আমার দিকেই তাকিয়ে দেখল সে।

পুল পার হতে গিয়ে দেখি বাধা। সেপাই ছুটে এসে বলল, 'এ পুল দিয়ে ওপার থেকে আসা যায়। ওই দক্ষিণের পুল দিয়ে যেতে হবে।'

তাই গেলাম। ভিড় ঠেলাঠেলি করছে পুলের মুখে। যারা এসেছে রিক্সায়, টাঙ্গায়, তাদের নামিয়ে দিচ্ছে সেপাইরা। পুলের উপর দিয়ে মানুষ নিয়ে যেতে পারবে না কোন যানবাহন। হেঁটে যেতে হবে। তাই নিয়ে লেগেছে চীৎকার আর গণ্ডগোল।

ভাসন্ত পুল। মানুষের পায়ের চাপে চাপা আর্তনাদে ক্যাঁ কোঁ করে উঠছে। দুলে দুলে উঠছে। বাধা পেয়ে ফুলে ফুলে উঠছে পুলের নীচের জল। চাপা গর্জন ভুলে ছুটে চলেছে নিয়তবাহী গঙ্গা।

এখানে শুধুই চলা, শুধুই যাওয়া। যাওয়া-আসা নেই। আমরা সমুদ্রোপ-কূলের বাঙালীরা গঙ্গায় যাওয়া-আসা দেখতে অভ্যস্ত। এ-বেলার জলে আমরা ও-বেলা পলিমাটি দেখতে পাই। কিন্তু এখানে নিরবধি সুদূরের ডাক। অজানা ও অচেনার পথে নিরন্তর রোমাঞ্চকর অভিযান। সে অভিযানের প্রত্যাবর্তন নেই।

গঙ্গা পার হয়ে এসে শীতের ডিগ্রী যেন আর-একটু চড়ল। পুলের নীচেই সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে কতকগুলি লোক। চেঁচাচ্ছে, 'ঘিউ-কা-দীয়া। চার চার পয়সা। গঙ্গা মায়ী কী সেবা করো বাবু।'

দেখলাম, অনেকগুলি জ্বলন্ত প্রদীপ গঙ্গাকিনারের নিস্তরঙ্গ জলে চলেছে ভেসে। ঘৃত-দীপ। জলের বুকে প্রতিবিম্ব পড়ে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে তার সংখ্যা।

এই দীপ গঙ্গা কীভাবে গ্রহণ করেছেন জানি না। চোখে দেখতে পাচ্ছি, ন্যাংটো, আধ-ন্যাংটো হা-ভাতে ছেলের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে। দুহাতে সন্তর্পণে নিয়ে চলেছে হয়তো নিজেদের অন্ধকার ডেরায়। কেউ মেতে উঠেছে খেলায়। ঢেউ দিয়ে প্রদীপ সরিয়ে দিচ্ছে গঙ্গার দূর অকূলে।

মাতালের মত চলেছি। ঠাণ্ডা বালুর মধ্যে গোড়ালিসুদ্ধ পা ডুবে যাচ্ছে। গাঁয়ের বাড়িঘরের আগ-দুয়ার পাছ-দুয়ার দিয়ে চলার মত চলেছি তাঁবুর এ-পাশে ও-পাশে। ধুনুচি জ্বালিয়ে এখানে সেখানে বালুর উপর বসে আছে সাধুর দল।

প্রহ্লাদ ডাকল, 'ডাক্তারমামা।'

জবাব দিল পাঁচ-বত্থি, 'বল।'

'আর কত দূর?'

'এই এসে পড়েছি। ওই যে দক্ষিণপুবে দেখছিস অনেকগুলো আলো জ্বলছে, উইটে আমাদের আশ্রম।'

প্রহ্লাদ খুশী হয়ে বলল, 'বাঃ, বেড়ে আশ্রমটি দেখছি। মাইকে গানও হচ্ছে নাকি ডাক্তারমামা?' বুঝলাম, ফ্রাঙ্কেস্টাইনের মত পাঁচ-বত্থির আর এক নাম ডাক্তারমামা। যেরকম গম্ভীর দেখছি, ডাক্তার বলেই মনে হয়।

বলল, 'হুঁ হুঁ, এ আর যার তার কাজ নয়। দেখেশুনে এমন জায়গা করেছি, বুঝলে খুড়ি, মনে হবে নিজের ঘরে রয়েছি।'

খুড়ি হল প্রহ্লাদের দিদিমা। বলল, 'গুণের শরীল তোমার বাবা। তুমি না থাকলে আর আমার এ যাত্রা আসা হত না। তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল?' আফসোসের মধ্যে বোধহয় প্রহ্লাদের প্রতি অভিযোগ প্রকাশ করল দিদিমা।

কিন্তু তাতে প্রহ্লাদের কিছু যায় আসে বলে মনে হল না।

বুড়ি হাঁপাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। হাঁপাচ্ছে বোধহয় প্রহ্লাদের পরিবারও। প্রহ্লাদের পরিবার কিন্তু জোর তেরো-চোদ্দর একটি বালিকা মাত্র। একে ক্লান্তি তায় শীত। বেচারীর ঘোমটা খুলে গিয়েছে। প্রহ্লাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চলেছে অন্ধের মত টলতে টলতে।

পাঁচ-বত্থি না ফিরেই জিজ্ঞাসা করল, 'খুড়ি, ওই ছোঁড়াটা কে?'

ছোঁড়া? আশে পাশে তাকিয়ে দেখলাম। কই, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিদিমা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি জানি, আমি তো জানিনে বাবা।'

আমাকেই বলছে নাকি? সর্বনাশ, প্রথমেই একেবারে ছোঁড়া। তা হলে যা আশ্রয় পাব, বুঝতেই পারছি।

পাঁচ-বত্থি আমার দিকে ফিরে নীরস গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় কোথায় যাওয়া হবে?'

বললাম, 'কোথাও একটু আশ্রয়ের দরকার।'

ঠেলে-ওঠা কপালটা এগিয়ে নিয়ে এসে প্রায় ধমকে উঠল, 'তা আমাদের সঙ্গে কেন?'

অভ্যর্থনার বহর দেখে প্রায় থেমেই পড়লাম। বললাম, 'কোথাও থাকতে হবে তো। অন্তত আজকের রাতটার মত।'

পাঁচ-বখ্যি তেমনি গলায় বলে উঠল, 'যাক, ও-সব চালাকি ঢের দেখেছি, এখন কেটে পড়।'

নতুন জায়গা। নিয়মকানুন জানি নে। জানি নে এখানকার হালচাল। কিন্তু পাঁচ-বখ্যির ভাষায় কেটে পড়ে, নিজেকে খণ্ডিত করে যাব কোথায়।

একটু আশা নিয়ে তাকালাম প্রহ্লাদের দিকে। প্রহ্লাদ হেসে বলল, 'দিব্যি আসছিলেন, বাগ্রা পড়ে গেল। যান, কেটেই পড়ুন।'

এমনভাবে বলল, যেন কেটে পড়াটা তার কাছে কিছুই নয়। দিদিমার দিকে তাকালাম। দিদিমা আমার দিকে ফিরে অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'ঝাড়া হাত-পা নিয়ে তো ছুটে এসেছ, তা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করতে পার নি?'

সত্যি। ভগবানকে পাব বলে দিদিমার মত পাগল হয়ে আসি নি। আসি নি পুণ্যসঞ্চয়ের কথা ভেবে। মাততে আসি নি তীর্থ নিয়ে। বৈষয়িক বুদ্ধি-বিবেচনা থাকা উচিত ছিল আমারই। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছে বিপরীত। কিছু বললে, উলটো উৎপত্তির লক্ষণ।

চেরা গলা মোলায়েম করে বলল দিদিমা, 'পাঁচুগোপাল, বলছিলুম, দেশের ছেলে। তীর্থক্ষেত্রে কুকুর-বেড়ালকেও তাড়াতে নেই। ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিবি?'

পাঁচ-বখ্যি বলে উঠল, 'ও-সব তুমি বুঝবে না খুড়ি। এর নাম কুম্ভমেলা, বুঝলে? মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে মানুষসুদ্ধ চুরি হয়ে যায়। রাত্রে যদি গ্যাঁড়াফাই করে ভাগে, তখন?'

কথাটা অপমানকর। কিন্তু প্রতিবাদ নিরর্থক। এদিকে এসে পড়েছি আশ্রমের গেটে। আশ্রম বলতে, সুদীর্ঘ ঘেরাওয়ের মধ্যে দেবতার মঞ্চ, আর গোটা দশেক যাত্রীদের তাঁবু। মঞ্চের উপরে কয়েকজন গেরুয়াধারী গান করছেন মাইকের সামনে বসে। জটাজুটধারী ভস্ম-আচ্ছাদিত একজন

সাধু বসে আছেন কাঠের সিংহাসনের উপর। কয়েকশো মেয়ে-পুরুষ বসে শুনছে গান।

ঢোকবার মুখে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে নমস্কার করলে দিদিমা। নমস্কার করে উঠে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল, 'পাঁচু, ছেলেটাকে নিয়ে নে। রাত করে যাবে কোথায় ?'

'যেখানে খুশি যাক, তোমার অত ভাবনা কিসের খুড়ি ! এখানে ও থাকবে কোথায় ?'

বলে সে এগিয়ে গেল। দিদিমা শণনুড়ি মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এস, চলে এস। আমার যেন মরণ নেই, সব হয়েছে একতরো।'

পাঁচ-বখির হুঙ্কারের কাছে এই চেরা-গলার আশ্বাস ও বিশ্বাস অনেক বেশী। কে ভেবেছিল, এলাহাবাদ স্টেশন-প্রাঙ্গণের সেই বুড়ি এমন মহীয়সী মূর্তিতে দেখা দেবে আমার কাছে। ইচ্ছে হল, তখুনি পায়ের ধুলো নিই। কিন্তু আবেগ বাগ মানাতে হল। কেন না, এখনো সংশয় দূর হয় নি।

এবার প্রহ্লাদও বলে উঠল, 'চলে আসুন না মোশাই, ডাক্তারমামা ওরকম বলেই থাকে। মাথা খারাপ কি-না।'

জানি নে কার মাথা খারাপ। খানিকটা যেতেই পাঁচ-বখি একজন সাধুকে নিয়ে এসে হাজির। মনে হল বৈষ্ণব। নাকের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত পুণ্ড্ররেখা টানা। ঘাড় অবধি চুল। পরনে গেরুয়া কাপড়। বোধহয়, এ আশ্রমের অধ্যক্ষ। আমাকে বললেন পরিষ্কার বাংলায়, 'একলা পুরুষের জন্য কোন তাঁবু আমাদের নেই। আপনি সপরিবারে এলে আমরা ব্যবস্থা করতে পারতাম। এখানে সকলেই বউ-ঝি নিয়ে আছেন। আপনাকে তো আমরা থাকতে দিতে পারি নে।'

জানি নে কেমন করে বুড়ি-বুকে ঠাঁই পেয়ে গিয়েছিলাম। দিদিমা আশ্রমের মধ্যেই গলা চড়িয়ে বলে উঠল, 'পাঁচু, এ তোর বড় অন্যায় কিন্তু বাপু ! ছেলেটা একলা কোথায় দেখলি তোরা ? ও কারুর বউ-ঝিকে উঁকি মেরে দেখতে চায়, তখন বলিস। এখন ও আমাদের তাঁবুতে আমাদের সঙ্গেই থাকবে। এতে যদি না হয়, তবে বলে দে, আমরাও পথ দেখি।'

পাঁচ-বখ্‌শির ভয়ঙ্কর মুখটা অপ্রতিভ হয়ে উঠল। সাধুও অবাক হয়েছিলেন। তারা দুজনে বিস্মিত হয়ে পরস্পর মুখ দেখাদেখি করল। বিস্মিত আমিও কম হই নি। দিদিমা যে এতখানি এগুবে, তা আমিও জানতাম না।

প্রহ্লাদ মাঝখান থেকে বলে উঠল, 'হ্যাঁ বাবা, বলে দেও, তাহলে আমরাও কেটে পড়ি। দেখছ ছেলেটা আমাদের চেয়ে ভদ্দরলোকের মত দেখতে।'

সাধু বললেন দিদিমাকে, 'না, আপনার সঙ্গে যদি থাকে, তবে আর আমাদের আপত্তি কি?'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি এদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নেবেন। আমি সাধারণ নিয়মের কথা বললাম মাত্র।'

বলে তিনি চলে গেলেন। সকলেই চুপচাপ। পাঁচ-বখ্‌শি আমার দিকে এক-বার ক্রুদ্ধ চোখে দেখে দিদিমাকে বলল, 'এস, তোমাদের তাঁবু দেখিয়ে দিই।'

একটি তাঁবুর মাঝখান দিয়ে ভাগাভাগি করে এক-একটি পরিবারের আস্তানা করা হয়েছে। মাটির উপর বিছিয়ে দিয়েছে বিচুলি। ব্যবস্থা আছে ইলেকট্রিক আলোর। সত্যি, বাড়ির মত অবস্থাই বটে।

মনে মনে খুব সঙ্কুচিত হলেও দিদিমার সঙ্গে ঢুকে আগে ঝোলামুক্ত করলাম নিজেকে। তারপর ধপাস করে বসে পড়লাম বিচুলির গদিতে।

সকলেরই সেই অবস্থা। সকলেই বসে পড়েছে। কেবল পাঁচ-বখ্‌শি যাবার আগে বলে গেল, 'ঘাট হয়েছে আমার তোমাদের আনা। আগে জানলে এ আপদ আমি আনতুম না। বাট, ইও ছোকরা, —'

আমাকেই বলছে। তাকালাম তার দিকে। পাঁচ-বখ্‌শি একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বুক ঠুকে বলল, 'মাই নেম ইজ ডক্টর পাঁচুগোপাল রায়। একটু এদিক ওদিক করবে তো, ঘাড়টি মটকে ছেড়ে দেব, মনে থাকে যেন। থাক আজকের রাতটা, তার পরে তোমাকে কাল আমি দেখছি।' বলে সে চলে গেল।

আমি বসেছিলাম একটি ভীত সন্ত্রস্ত বালকের মত। সবই সময়ের ব্যাপার। পাঁচ-বখ্‌শিকে জবাব দেওয়ার সময় পাবই একদিন। আপাতত আমি তার চোখের বিষ। সেই বিষ বুকে নিয়েছে দিদিমা।

তাকিয়ে দেখি দিদিমা দিব্যি নাতবউ নিয়ে ঘর গোছাবার উদ্‌যোগ করছে। সে সব আমার কানে গেল না। দিদিমাকে দেখে ভাবছিলাম একটা কথা। সেই কথা, রূপে তাকে চিনব না। ডুব দেব তার হৃদিসায়রে। রূপের পরে যে রূপ থাকে লুকিয়ে। মনের অন্ধকারে। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত দেহ। তবু চোখ ভরে জল এসে পড়ল। উঠতে চাইলাম। আড়ষ্ট হয়ে রইল হাত-পা। বোধহয় এই-ই দেখতে এসেছি। যা দেখতে এসেছি, তাই তো দেখছি নিজের অপমানের মধ্যে, অসহায়তার মধ্যে, আমার চোখের জলে।

একটু জলের জন্য হাঁপিয়ে উঠলাম। কোনরকমে এলাম বাইরে বেরিয়ে। ঘুরে পেছন দিকে গিয়ে দেখি জলের কল রয়েছে। সেখানে ভিড় করেছে মেয়ে-পুরুষ। বাসন মাজছে, হাত-পা ধুচ্ছে।

কে বলছে, 'বিনু, তরকারিটা পোড়ারমুখী পুড়িয়ে ফেলেছিস।' কে হেসে উঠল খিলখিল করে। বোধহয় বিনুই। কে চেঁচিয়ে উঠল, 'নেও নেও, বাসনকোসন নিয়ে সর বাপু, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

পাশের তাঁবুতেই নারীকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি, 'অনিলের শ্বশুরের কথা বলছ তো? সে মিনসে নাকি মস্ত চাকরি করে। ওই গোমরেই তো অনিলের বউ অত বাপ-সোহাগী।'

হঠাৎ আমার মনে হল যেন বাঙলার কোন মফঃস্বল শহরের এঁদো গলির বস্তি অঞ্চলে ঢুকে পড়েছি। সন্ধ্যেবেলার বস্তি। চারদিকে কলকোলাহল, ঝগড়া, গান, ফুটকাটা, সাংসারিক প্যাঁচাল। তারই মাঝে জলের ছড়ছড়, বাসনের ধাতুর খনখন শব্দ।

ভুলে গেলাম তীর্থক্ষেত্র। দাঁড়িয়ে আছি বাঙলাদেশের কোন এক পাড়ায়। মনটা তাজা হয়ে উঠল। তাজা হয়ে উঠল আরও জল দেখে। উঃ, যেন কতদিন গায়ে জল দিই নি। থাক শীত, তবু গায়ে জল না দিলে বাঁচব না।

আর থাক পাঁচ-বস্তি। কে জানে, রূপে তাকে চিনলাম না। মনের মাঝের অন্ধকারে তার রূপ আরও কত ভয়ঙ্কর, সেটুকু না দেখে গেলেও যে দেখা আমার পূর্ণ হবে না।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নীচু হয়ে আবার ঢুকলাম তাঁবুর মধ্যে।

তাঁবুতে এসে তাড়াতাড়ি ঝোলা হাতড়ে বার করলাম সাবান আর গামছা। আগে দেহটি আবর্জনামুক্ত করি, তারপরে অন্য কথা।

কিন্তু বেরুতে আর পারলাম না। দিদিমা বুড়ির চেরাবাঁশের গলা আচমকা তাঁবু কাঁপিয়ে থরথর করে উঠল, 'ওমাঃ! একি মেলেচ্ছ কাণ্ড গো বাবা।'

কাকে বলছে। ওরে বাবা, তাকিয়ে দেখি শ্বেত-পিঙ্গল শণ-নুড়ি উঁচিয়ে, বুড়ি কুঞ্চিত অগ্নিকটাক্ষ আমার দিকেই হানছে। শরীর আমার শুধু সিঁটিয়েই গেল না, আবার একটা কেলেঙ্কারির লজ্জায় ও ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, 'কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে?' বলে দিদিমা আবার গলা চড়াল। অর্থাৎ যা আমি সবচেয়ে ভয় পাচ্ছিলাম। বলল, 'প্যাট প্যাট করে ইস্তিসন না হয় নিয়ে এলে। নইলে যমে ছাড়বে না। কিন্তু দেবতার থানে সাবাং মাখতে যাচ্ছ কী বলে। তীর্থক্ষেত্র তেল সাবাং-এ অপবিত্তর হয়, তাও জানো না বাছা?'

জানা ছিল না এত বড় কথা। প্রতিবাদও নিরর্থক। কে জানত যে তেল-সাবানে দেবতার মাহাত্ম্যও ধুয়ে যেতে পারে।

কিন্তু মানুষ চেনার বড়াই আর এ জীবনে করব না। কয়েক মুহূর্ত আগেও যার পায়ে হাত দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম, এখন তার কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। স্নেহ ও ভালবাসা, রাগ ও বিরাগ, এই উভয় ভাব প্রকাশের মধ্যে কি এদের ভাবেরও তারতম্য ঘটে না? অনেক মানুষেরই ঘটে না। সে উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু নিজে বড় একটা সে বিষয়ে ভুক্তভোগী নই। তাই মন বড় সহজেই দমে যায়।

ইচ্ছে থাকলেও এখান থেকে আর পালাবার উপায় নেই। এইটুকুই তো আমার পরম ভাগ্য যে, বুড়ির চেঁচানি শুনে ডাক্তার পাঁচুগোপাল রায় তার ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে আসে নি ছুটে।

বিশ্রামের আরামে প্রহ্লাদের রসভরাট গলা গদগদ হয়ে উঠেছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানলি দিমা, ছেলেটা একেবারে ভদ্দরলোক।'

দিদিমা বলল, 'তাই না বটে।'

সেইটাই অপরাধ। সাবান রেখে গামছা নিয়েই বেরিয়ে গেলাম। গায়ে জল লাগিয়ে আর ফিরে আসতে পারি না। দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার যোগাড়। উঃ, বড় ভুল করেছি। এ যে কম্প দিয়ে জ্বর আসার মত। ম্যালেরিয়ার সর্বনাশা কাঁপুনির মত হৃৎপিণ্ড ছরকুটে যাবে দেখছি। উত্তর প্রদেশের শীত না ব্যক্ত করতে পারি, বাঙলা দেশের জল হাওয়ায়, এই ম্যালেরিয়া-প্রুফ ক্ষীণ দেহের অভিজ্ঞতাটুকু জাহির করতে পারি খুব। মাসের পর মাস ঘড়ি না দেখে সময় বলে দিতে পারি জ্বর আসার ক্ষণটি লক্ষ্য করে। এ অভিজ্ঞতা কম নাকি। বেশ বড়-সড় একটি পিলেযুক্ত নিটোল পেট আর কাঠি-কাঠি হাত-পা নেড়ে, ভাসা-ভাসা টানা-টানা চোখে বাঙলার জল আকাশের দিকে তাকিয়ে তবু আমরা দিব্যি কবিত্ব করি, 'আয় লো আয় রাই বিনোদিনী, রসের হাটে কালো মানিক করব বিকিকিনি।' হাড়কাঁপুনিকে বলি, ওদিক থাক। দোষ ধোরো না ভাই। পিলের গৌরব করছি নে। ওই রূপ দেখেও তো শুনেছি, বাউরী বাঙালিনী নাকি 'নিশি নিশি গুঞ্জরে'।

মধুর মধুর রসরাজ,
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।

থাক, রসিকতা আর পোষায় না। উত্তর প্রদেশের হাওয়া পারে নি, জল যে একেবারে কাবু করে দিল। কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুতে এসে মনটা একেবারে ভরে উঠল। বাঃ! প্রহ্লাদের ক্যাটকেটে দিমা দেখছি টার্কি মুরগীর মত বহুরূপিণী। আমার ধারণা ছিল ওটা তরুণীদেরই একচেটিয়া। ক্ষণে ক্ষণে রং বদলানো। দিব্যি দেখছি, আমার ঝোলা উজাড় করে বিচুলির উপর পাতা হয়েছে কম্বল। ঝোলা শিয়রে রেখে হয়েছে বালিশ। গায়ের কম্বলটিও ভাঁজ করা রয়েছে পায়ের দিকে। এবার শুয়ে পড়ার ওয়াস্তা।

যাক, আর কিছু চাই নে.। দেখেই মন গরম হয়ে উঠেছে। শরীর গরম হতে আর কতক্ষণ। তাড়াতাড়ি গা হাত পা মুছে গায়ে দিলাম ওভারকোট। সেটি গায়ে নিয়েই বিচুলির উপর কম্বল শয্যায় অঙ্গ পেতে টেনে নিলাম আর-একটি কম্বল।

কিন্তু এতক্ষণ প্রহ্লাদ সপরিবারে, অর্থাৎ দিদিমা সহ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল বিস্ফারিত চোখে। তারপরেই বুড়ির শ্লেষ্মাজড়িত গলার হাসি। হাসি তো নয়, হাসির হিক্কা। কিন্তু এও যে সম্ভব, তা জানতাম না। বুড়ি বলল, 'বলি ও ভাল মানুষের ছেলে, সাবাং তো মাখতে যাচ্ছিলে, তোমার আবার এত ছুঁচিবাই কিসের বাপু?'

বললাম, 'কিসের ছুঁচিবাই?'

'এই যে গায়ে জল ঢেলে এলে। বারো জেতের ছোঁয়া নিয়ে আমরাও এসেছি, কিন্তু এই শীতে কি আমরা জল ঢালতে গেছি?'

এখন সত্য বলে বোঝানো নিরর্থক যে ছুঁচিবাই নয়, পরিষ্কার হওয়ার জন্যই জল ঢেলেছি। হয়তো বিশ্বাসই করবে না। তবু এমনি অবিশ্বাস ভাল। কিন্তু চেঁচামেচি যেন না হয়। কিছু না বলে শুধু হাসলাম।

দিদিমা আবার বলল, 'দেখো বাপু, শেষে নিমুনি বাধিয়ে বোসো না। ওসব ঝক্কি পোয়াতে পারব না।'

কি দরকার পারবার। রাত পোহালে যাদের রেহাই দেব, তাদের ভাবনার প্রয়োজন নেই। ওদিকে খাবার বন্দোবস্তও হচ্ছে বলে মনে হয়। রান্না করা তো এখন আর সম্ভব নয়। চিড়েমুড়কি বেরুচ্ছে টিনের পাত্র থেকে। অস্বস্তি ঘিরে ধরল আমাকে। অন্তত খাওয়ার সময়টাও বাইরে থাকতে পারলে হত। শুয়ে পড়েছি যে।

আবার দিদিমার গলা, 'নেও, দুটো চিবিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।'

এরা না জানুক, নিজে তো জানি, কিছুই চিবোবার স্পৃহা এখন আর আমার একটুও নেই। গতকাল সকালে বিছানা ছেড়েছিলাম। পথের ধকল কাটিয়ে এবার গা পেতেছি। এই বিশ্রামের ভোগ এখন খাওয়ার চেয়ে বড় ভোগ। কিন্তু পরিস্থিতি আমার এ সত্য-ভাষণের মর্যাদা দেবে না।

কথা না বাড়িয়ে, যতটা পারলাম, চিবিয়েই শুতে হল। এখনো এ আশ্রমের মাইকে দেবমাহাত্ম্য আলোচিত হচ্ছে। সারা কুম্ভমেলা জুড়েই এখনো কল-কোলাহল চলেছে পুরা দমে। শুধু আমি রয়েছি যেন অনেক দূরে। শুনতে পাচ্ছি আশপাশের তাঁবুগুলিতে বিচিত্র গুঞ্জন। কিন্তু সবই

অস্পষ্ট। এটুকু না থাকলে হয়তো গাঢ় ঘুমের আলিঙ্গনে অচেতন হয়ে পড়তাম।

এমনি অর্ধচেতন অবস্থায় আমার কানে এল ভাঙা-ভাঙা অর্ধস্ফুট একটি গলার গুঞ্জন,

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু-বাছাধন॥

দিদিমার গলা। বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন গলা। আমার কানের শিরাগুলি চকিত মুহূর্তে একেবার জেগে উঠল। তারপর কানের পর্দা থেকে একটা বিচিত্র শিহরণ আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করে তুলল।

কৃষ্ণের শতনাম। কোনদিন জীবনে মুখস্থ হয় নি। মহিমাও কিছু বুঝি নে ও নামের। কিন্তু ভাঙা জড়িত গলার এই বিচিত্র স্বর, আমার শৈশবের নিদ্রাহীন চোখের উদ্ভট স্বপ্নের, আমার দুষ্টামির, আমার বিশ্বজোড়া কৌতূহলের সমাপ্তি এনে দিত। আমার শিশুরক্তের শিরায় শিরায় ঘুমের মায়া হয়ে থাকত লুকিয়ে। না-ছোঁয়া থাকলেও সর্বাঙ্গ ভরে থাকত, জড়িয়ে থাকত আমার মায়ের আলিঙ্গন। এমনি ছিল রাত্রের ঘুমে, ভোরের জাগরণে। যে স্বরে ঘুম আসত, আবার সেই স্বরেই একটু একটু করে খুলে যেত চোখের পাতা।

তারপরে জীবনের স্রোতে আমি ভেসে গিয়েছি একটি বৃন্তহীন ফুলের মত। যৌবন এসেছে অসহ্য বেদনা ও সংগ্রামের ডাক নিয়ে। পায়ের তলার মাটি বাঁচাতে কবে হারিয়ে গিয়েছে সেই স্বর। মায়ের রূপ ধরেছে এই কঠিন পৃথিবী।

কিন্তু সেই হারানো স্বর যে আমার এই দীর্ঘ জীবনের রক্তপ্রবাহে অজান্তে অনুসরণ করছে, তা জানতাম না। সমস্ত কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। গাঢ় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম আমি। তখনো একটু একটু কানে আসছে,

কালোসোনা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী,
কুব্‌জা রাখিল নাম·········

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। খসখস শব্দ হচ্ছে ঠিক কানের কাছেই। কত রাত হবে, কে জানে। শুয়ে ছিলাম বাইরে পর্দার সামনে। প্রথমটা চোখ মেলতে পারলাম না। পর্দার তলা দিয়ে তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত এসে বিঁধছে কনকনে হাওয়া। কাঁটা দিয়ে উঠছে গায়ের মধ্যে। মনে হল সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। রক্ত জমে গিয়েছে হাতপায়ের। বিচুলি-শয্যা বরফের মত ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে। দূরাগত মেঘগর্জনের মত গুড়গুড় করে উঠল বুকের মধ্যে।

বোধহয়, এই ভয়ানক শীতেই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। মেলা নিস্তব্ধ। কোলাহল নেই। হঠাৎ দু-একটা সংক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে দূর থেকে। আচমকা শোনা যাচ্ছে স্খলিত ঘণ্টাধ্বনি। আবার নীরবতা। কেবল কানের কাছে খসখস।

চোখ মেললাম। চোখ মেলেই চমকে উঠলাম। পর্দার কাছেই এক-জোড়া বুট। তাঁবুর মধ্যে আলো জ্বলছে। একটু একটু করে বুট বেয়ে বেয়ে দৃষ্টি তুললাম। বুটের উপরেই মোটা, খাকি প্যাণ্ট। হাঁটুর উপর থেকে ভারী কালো কম্বল।

সর্বনাশ! ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ছবির মন্স্টার! পাঁচ-বত্তি! ভয়ঙ্কর মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডক্টর পাঁচুগোপাল। টের পায় নি যে, আমি জেগে আছি। হাত আড়াল করা আমার চোখের কোলে ছায়া। দেখলাম, ডক্টর পাঁচুগোপাল রীতিমত রাত-প্রহরীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে চারদিক। কী দেখছে কে জানে। কিন্তু একটা বুট যদি চাপিয়ে দেয় গলার উপর।

কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কাটল বুকের ধুকধুক তালে। তারপরে কানে এল চাপা চীৎকার, 'শালা, নো জায়গা নট কিচ্ছু। চলো বাহার।'

পরমূহূর্তেই পর্দাটা তুলে বেরিয়ে গেল সে। আর-এক ঝলক কুচো বরফ কে ছুঁড়ে মারল আমার গায়ে। কোনরকমে হজম করলাম ঠাণ্ডা চাবুকের কশাঘাত।

কিন্তু ডক্টর কেন এই শীতনিশীথে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'নো জায়গা নট কিচ্ছু'র বাংলা মানে তো তাই বুঝায়। বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। ঘুম আর এল না। অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম। চব্বিশ ঘণ্টার ক্লান্তিতে এখনো

চোখ জুড়ে আসারই কথা। কিন্তু আশ্চর্য! এপাশ ওপাশ করেও ঘুম আর কিছুতেই আসছে না। অনেক সময় অতিরিক্ত ক্লান্তিতে দেহতন্ত্রী যেন টান-টান হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে মনটিও। এই হঠাৎ ঘুম-ভাঙা মনেও আমার কোন শৈথিল্য নেই। সেখানে অনেক তাড়া, অনেক কৌতূহল। মন যেন ছেঁড়া পালের টুকরো-ফালির মত থরথর করে কাঁপছে। হয়তো এর কোন অর্থ নেই, আশা নেই। তবু মন মানে না। মানে নি বলেই তো এসেছি ছুটে। হোক উদ্ভট, অদ্ভুত, অবাক কাণ্ড। তবু আর শুয়ে থাকতে পারি নে। উঠে পড়লাম। উঠে দেখি প্রহ্লাদকে মাঝখানে রেখে একপাশে তার পরিবার আর-এক পাশে দিদিমা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এই ঘুম দেখে হঠাৎ বোঝার উপায় নেই, এরা এসেছে ঘর ছেড়ে দূরে। এসেছে তীর্থ করতে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম ওভারকোটের বোতাম এঁটে। কিন্তু এসে কয়েক মুহূর্ত চলৎশক্তি রহিত হয়ে গেল। মনে হল, মনের আশা মনে নিয়ে ঢুকে পড়ি তাঁবুর মধ্যে। শুনেছি, ইওরোপ শীতপ্রধান দেশ। সেখানকার শীতে জল জমে বরফ হয়। পথে ঘাটে উঠোনে ছাতে বরফ। লোকে পথে বেরুতে ভয় পায়। কিন্তু আমার বাঙালী হাড় যে উত্তরপ্রদেশের গঙ্গার পাড়েই জমে যাওয়ার দাখিল।

পকেটে ছিল মাফলার। বার করে জড়ালাম মাথায়। জুতো মোজা পরেই শুয়েছিলাম। সুতরাং দরকার থাকলেও শীত আটকাবার আর কোন উপায় ছিল না।

আশ্রমের বাইরের আলোগুলি নেভানো। মঞ্চের পেছনেই অস্থায়ী মন্দির হয়েছে মাটির দাওয়ার উপরে, গোলপাতার বেড়া ও ছাউনি দিয়ে। মন্দিরের ঝাঁপ বন্ধ। মঞ্চের উপরে ও নীচে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুঁটলির মত দেখাচ্ছে আপাদমস্তক মুড়ি-দেওয়া ঘুমন্ত কতকগুলি মানুষকে। মনে হল না কেউ জেগে আছে।

আশ্রমের প্রধান গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম। শিশির-ভেজা বালি খস-খস করছে। চলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হচ্ছে খসখস করে। আটকে যাচ্ছে পা।

রাশি রাশি ভেজা বালি জুতোর মধ্যে ঢুকে মোজাসুদ্ধ পা সিক্ত করে তুলছে। অন্ধকারে চিকচিক করে উঠছে বালির বুকে অভ্রকুচি।

পশ্চিমদিকে মুখ করে চলেছিলাম। ওপারে অস্পষ্ট এলাহাবাদ দুর্গপ্রাকার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। দুর্গের মাথায় পতাকাটিও লক্ষ্য করা যায় একটা গাছের ফাঁক দিয়ে। নজরে পড়ে না শুধু সতর্ক প্রহরী।

সম্ভবত, কিছুক্ষণ পূর্বেই চাঁদ ঢলে পড়েছে দুর্গের আড়ালে। তাই পশ্চিমের আকাশে কিঞ্চিৎ আলোর আভাস। কিংবা এলাহাবাদ শহরের আলোকমালার হালকা আভাস মাত্র।

লক্ষ মানুষের মেলা এখন নিঃশব্দ। এই নিঃশব্দের মধ্যে মিশে গিয়েছে ঝিঁঝির ডাক, আমার পদশব্দের খসখসানি। নিয়ত ধাবিত গঙ্গার কলকল ধ্বনি এই নিঃশব্দ রাত্রির সঙ্গীতপ্রবাহের মত চলেছে ভেসে। যেন অদৃশ্যে বসে কোন এক নিঃশব্দের সঙ্গীতবিলাসী নিয়ত জলের বুকে ঢেলে চলেছে ধাতব বস্তু।

সন্ধ্যার সেই আলোর ছড়াছড়ি নেই। এখানে সেখানে দু-একটা আলো জ্বলছে। দিগন্ত জুড়ে তাঁবুগুলি দেখাচ্ছে যেন সমুদ্র-সৈকতে নিশ্চল নীরব অসংখ্য পাখির মত। যেন ধূসরবর্ণের পাখা মেলে বসে রয়েছে বাদুড়ের দল।

আবার সেই স্খলিত ঘণ্টাধ্বনি। কানের কাছেই শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, কয়েক হাত দূরেই একটা হাতি বাঁধা রয়েছে। সুরের মাঝে ডুবে গিয়ে মানুষ যেমন করে দোলে, হাতিটা তেমনি দুলছে সামনে পেছনে। তারই তালে তালে বাজছে ঘণ্টা।

অদূরেই কিছু পোড়া কাঠ থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে। আগুন জ্বালা হয়েছিল, নিভে গিয়েছে। সেই অগ্নিকুণ্ডের গা ঘেঁষেই বালির উপরে কয়েকজন শুয়ে আছে আপাদমস্তক ঢেকে। ভাবাও দুষ্কর এই ভয়াবহ শীতের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলে কেমন করে মানুষ শুয়ে আছে।

দূরে দূরে কোথাও দু-একটি প্রজ্বলিত আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে আগুনের চেয়েও পুঞ্জীভূত ধোঁয়ারাশি।

আচমকা কানফাটানো দুম-দুম ঝম-ঝম শব্দে চমকে উঠলাম। উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, গঙ্গার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে রেলওয়ে ব্রীজ। ট্রেন চলেছে তার উপর দিয়ে। মনে হল, জমাট নৈঃশব্দ্য ভেঙে সেই ঝম-ঝম শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এখুনি জেগে উঠবে লক্ষ মানুষের মেলা।

কিন্তু ট্রেনের বিলীয়মান শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বালুচর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। ট্রেন দেখবার জন্যই দাঁড়িয়েছিলাম। এই গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে একটি ভাঙা ভাঙা গলা শুনতে পেলাম। যেন কাকে কী বলছে। এই তাঁবু-সমুদ্রের মধ্যেই কোথাও কেউ কথা বলছে। কিন্তু কোথায়। মানুষ তো দেখতে পাই নে।

একটু কৌতূহল হল। কান পাতলাম। কথাগুলি হিন্দী ভাষায় বলছে। কী বলছে? আর-একটু এগিয়ে আবার থমকালাম। কথা তো নয়, কে যেন কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'বহুত, বহুত পাপ কিয়া ভগবান! হে ঈশ্বর, আমার অর্থ নাও, আমার সোনা নাও, আমার খাওয়া নাও, আমাকে বিবস্ত্র কর। আমার সব নিয়ে, আমাকে মৃত্যু দাও। আমার এই পাপের প্রাণ আমি তোমার পায়ে দিচ্ছি। গ্রহণ করে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।'

আমার হাতপা একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আমি কার পাপের স্বীকারোক্তি শুনছি। মৃত্যুকামনা শুনছি কার। আমি কোথায় এসেছি, যেখানে মানুষ অসঙ্কোচে প্রকাশ করছে তার পাপ। নিবেদন করছে প্রাণ।

ভুলে গেলাম, আমি এক সভ্য দেশের সৃষ্টি- ও কৃষ্টি -ভরা নগরের নাগরিক। আমি যেন হাজার বছরের অতীতে এসেছি ফিরে। কোন অদৃশ্য থেকে আমাকে দুহাতে আলিঙ্গন করল এই বালুচরের নিশি। নিশি-পাওয়া অন্ধ ও বোবার মত আমি চারিদিকে হাতড়ে ফিরতে লাগলাম।

ওই যে দূরের অগ্নিকুণ্ড ও ধোঁয়া, হয়তো ভরদ্বাজ মুনির যজ্ঞের কাঠ পুড়ছে ওইখানেই। দিনের পর দিন শত শত মানুষ প্রয়াগের গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ নাশ করছে। প্রাণনাশের সেই ভয়াবহ মহাপুণ্যলীলা আজ ঘিরে ধরল আমাকে। অনেক মানুষ, অনেক মানুষের ছায়া চারদিক থেকে ঘিরে

আসছে আমাকে। ভারতের এক বিস্মৃত যুগের ছায়ারা ভিড় করেছে আমার চারপাশে। ওভারকোট-পরা একটি ক্ষীণ মানুষরূপী জীবের দিকে তারা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, এ কোন দেশের মানুষ। গঙ্গাতীরে তাদের শত শত বছরের এই নির্জন বিচরণক্ষেত্রে রাত্রি নিশীথে এ কোন রক্তমাংসের জীব। অনেক পরিবর্তন তারা দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছে। যে অক্ষয়বট গাছের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ভগবানের কাছে তারা প্রাণদান করেছে, তাদের সেই অক্ষয়বট অসঙ্কোচে কেটে দিয়েছেন আকবর বাদশা। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দাঁড়িয়ে তারা দল বেঁধে সবাই সেই নিষ্ঠুর কাজ দেখেছে। তারপরেও শত শত বছর ধরে তারা দেখে আসছে, মরজগতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে, তাদের সেই অক্ষয়বটের স্মৃতিচিহ্নে মাথা ঠুকতে। দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে তারা। সে হাসি কেউ শুনতে পায় না। গঙ্গা ও যমুনার তলে চাপা পড়ে থাকে সেই হাসি। বিদ্রূপে বেঁকে উঠেছে তাদের চোখ, যখন দেখেছে মরজগতের মানুষগুলি বেঁচে থাকতে কত ভালবাসে। পাপকে গোপন করতে তাদের কত আয়াস। মুদ্রা নিক্ষেপ করে কত সহজে সে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে চাইছে। তারা দেখেছে, তাদের অক্ষয়বটের পরিবর্তে একটা অন্য বটের ডাল দেখিয়ে পাণ্ডা পয়সা নিচ্ছে মানুষের কাছ থেকে।

তারা ফিসফিস করে কথা বলেছে আর হাওয়ার গায় ভেসে বেড়িয়েছে। কেউ জানে না, কিন্তু তারা জানে প্রয়াগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভারতের কি ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

কিন্তু তাদের এই অবাধ মুক্ত বিচরণ সময়ে এ কোন জীব! গঙ্গার কোল থেকে একে একে তারা সকলে উঠে এসেছে। তারা কেউ হাজার বছরের, কেউ পাঁচশো বছরের, কেউ দুশো বছরের।

আমি কথা বলতে গেলাম। কিন্তু আমার কথা হারিয়ে গিয়েছে। তারা পরস্পরের গা টিপে হাসছে। আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমাকে। তারপর, তাদেরই সমবেত কণ্ঠের হাসির মত আমার কানে এসে বাজল গঙ্গার কলকল ধ্বনি।

তাকিয়ে দেখলাম, আমার পায়ের কাছে জল। গঙ্গার তীরে এসে পড়েছি। দূর-গঙ্গার বঙ্কিম স্রোতে হঠাৎ কারা হেসে উঠছে নিঃশব্দে। বাঁকা স্রোতের আলোর ঝিলিকে হেসে হেসে, আবার সেই হাসি হারিয়ে যাচ্ছে স্রোতেরই বুকে। ছায়ারা সব গুপ্ত শত্রুর মত চোখের সামনে অতলে ডুব দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

কে যেন গান করছে। নারীকণ্ঠের গান। নিশি-পাওয়া মন ভেসে গেল আর-এক দিকে। বেহালার চাপা সুরের মত মিষ্টি গলা অকস্মাৎ এক নতুন স্বপ্নজাল বিছিয়ে দিলে বালুচরে।

না, গান তো নয়। সুর করে আবৃত্তি করছে,

চিরং নিবাসং ন সমীক্ষতে যো
হ্যুদারচিত্তঃ প্রদদাতি চ ক্রমাৎ।
কল্পিতার্থাংশ্চ দদাতি পুংসঃ
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ।

কণ্ঠ লক্ষ্য করে কয়েক পা অগ্রসর হয়েই থামলাম। দেখলাম, গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী। মনে হল শাড়ি পরে আছে। আলুলায়িত কেশরাশি ছড়িয়ে পড়েছে তার পিঠ জুড়ে। দূরের অস্থায়ী ভাসন্ত পুলের সামান্য আলোর রেশ এসে পড়েছে তার মুখে। সে আলো সামান্য। তার মুখাবয়বটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাতে। তার সু-উচ্চ নাক, কম্পিত ঠোঁট, নিষ্পলক চোখের ঘনপল্লব।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখলাম, আপাদমস্তক-আবৃত একজন পুরুষ এসে দাঁড়াল তার পাশে। সেও কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল প্রয়াগস্তোত্র।

আরও খানিকক্ষণ পরে আর-একটি মেয়ে এল, একটি বালকের হাত ধরে। আগে যাকে দেখেছিলাম, তার চেয়ে এর বয়স কম মনে হল। পুষ্ট যৌবনের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে বঙ্কিম রেখায় উদ্ভাসিত। মুখে তার হাসির আভাস। বালকের সঙ্গে সেও একই আবৃত্তিতে যোগ দিল।

তাদের নীচু ও চাপা গলার মিশ্রিত আবৃত্তির স্বর একাত্ম হয়ে গেল গঙ্গার কলকল ধ্বনিতে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারা সকলে চলল দক্ষিণে সঙ্গমের দিকে।

আমি সেইদিকেই এগুলাম। যত সময় যাচ্ছে, উত্তুরে হাওয়া তত যেন খেপে উঠছে। ওদের মিলিত গলা থেকে থেকে ঝাপটা মারছে আমার কানের পর্দায়।

মানুষের দেখা পেয়ে আমিও অনেকখানি যেন নিশিমুক্ত হয়ে উঠেছি। আবার চারদিক পরিষ্কার হয়ে উঠছে আমার কাছে।

হঠাৎ মনে হল, কে যেন আমার পেছনে আসছে। তাকিয়ে দেখলাম। মনে হল, একটা মূর্তি সরে গেল তাঁবুর অন্ধকার কোলে। হয়তো কোন মানুষ বেরিয়েছে পথে। বেরুক। সামনে ফিরে আমি ওই চারজনের পিছে পিছে আবার চললাম।

এখনো কত রাত্রি অনুমান করতে পারি নে। কেল্লার পেছনের আকাশ ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। পূর্বাকাশের কোলে দূর ঝুসির পাহাড়ের মত উঁচু ভূমির অস্পষ্ট রেখা ফুটছে ধীরে ধীরে। । বিশাল নিকষ কালোপটে কোন এক অদৃশ্য শিল্পী যন্ত্র দিয়ে খুঁটিয়ে ফুটিয়ে তুলছে নতুন দৃশ্য।

মন্থর গতিতে আমার আগে আগে চলেছে তারা চারজন। দুটি নারী, একটি বয়স্ক পুরুষ, বালক একটি। তারা মিলিতকণ্ঠে সুর করে আবৃত্তি করে চলেছে প্রয়াগমাহাত্ম্য। চাপা স্বর, আবৃত্তিও মন্থর। তাদের চলার মত। সুস্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ। এই দারুণ শীতে একটুও বিকৃত শোনাচ্ছে না তাদের গলা।

আমি দূরে থেকে, চলেছি তাদের পেছনে পেছনে। কেন চলেছি, তার সঠিক অর্থ জানি নে। জানি কিঞ্চিৎ প্রয়াগের ইতিহাস। মাহাত্ম্য জানি নে তার অলৌকিক কীর্তির। আসা মাত্র গণ্ডুষে-ভরা গঙ্গা জল নিয়ে দিই নি মাথায়। রাশি রাশি ধুলো নিয়ে ছড়িয়ে দিই নি নিজের গায়ে। তবুও চলেছি তাদের পেছনে পেছনে।

নিশির দলে নিশি পেয়েছে আমাকে। সুরে আমাকে ডাক দিয়েছে। ইতিহাস কথা বলছে আমার কানে কানে। আমি মন্ত্র বুঝি নে প্রয়াগের। বুঝি নে পুজো।

শ্রাবণ মাসে বাঙলার গাঁয়ের গৃহস্থ মেয়ে-বউরা পুজো করে 'ঢ্যালা প্যালা'। পুজো করে মাটি ও বনপালার। তার অর্থ বুঝি। হে ধরিত্রী, তুমি উর্বর হও। তোমার প্রতিটি মাটির টুকরো ভরে উঠুক সবুজ শস্যে। আমার পুজো নিয়ে তুমি তৃপ্ত হও, তুমি সিক্ত হও, আমি জীবনভর তোমার সেবা করব।

এই আদিম সংস্কারের মধ্যে দেখি মানুষের বাঁচার অভিযান। নবান্ন উৎসবে শুনি জীবনের জয়গান। ফসলের গুণকীর্তন।

কিন্তু এই বালুচর। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের লীলাভূমি। ধর্মীয় ইতিহাসের স্মৃতিভূমি! কিন্তু কেউ এখানে ডুব দেয় না সেই স্মৃতিসায়রে। সন্ধান করে না জ্ঞানের। জনপদ ও তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই বালুচরের গুণকীর্তন তাহলে কেন, বুঝি নে। মানুষের রূপে মুগ্ধ হই। অলৌকিকের অনুভূতি নেই মনে। কি করে বুঝব।

তবুও আমি মোহপাশে আবদ্ধ হয়েছি। মোহ নয়, মুগ্ধ প্রাণ নিয়ে চলেছি আমি। এই মৌন রাত্রি, আলো-আঁধারিতে ওই নারী ও পুরুষ, আর কী বিচিত্র তাদের মিলিত গলার হারমনি। এই সঙ্গীতে নেই যন্ত্র-সঙ্গত। যন্ত্র হয়ে উঠেছে তাদেরই বিভিন্ন গলার স্বর। সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে নিয়তবাহী গঙ্গা।

ক্রমে শেষ হয়ে এল তাঁবুর সারি। যেন পিছনে ফেলে এলাম লোকালয়। এবার শুধু বালু আর বালু! বালুপ্রান্তর। পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে গভীর বালুতে। মনে হল, অনেক দূরে ফেলে এসেছি কুম্ভমেলা। হারিয়ে গিয়েছে বালুর উপরে আঁকাবাঁকা পথের দিশা। বালুর নীচে কোথাও ভেজা মাটির ইশারা। জেগে উঠেছে টুকরো ঘাসবন। জলো ঘাস। আবার বালু।

হাওয়ায় নুয়ে পড়ছে ঘাসের মাথা। ক্রমে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠেছে। পবন উন্মাদ হয়েছে। শিস দিয়ে চলেছে কানের কাছে। আর কানে ভেসে

আসছে ওই স্বর। স্বর চড়ছে। বেহালার চাপা স্বর হয়ে পড়ছে মুক্ত ও ব্যাপ্ত। তারে টান পড়েছে। উচ্চতর গ্রামে মিশেছে হাওয়ায়।

বয়স্ক পুরুষটির কম্বল উড়ছে ফরফর করে। মেয়ে দুটির আলুলায়িত কেশপাশ শূন্যে আছাড় খাচ্ছে হাওয়ার দমকে।

হাওয়া নয়। নিষ্ঠুর চাবুক। আমার হাত আর পা ফেটে পড়তে চাইছে টনটনানিতে। শিউরে শিউরে উঠছে গায়ের মধ্যে।

একটু পরেই গতি মন্দ হল সামনের চারজনের। সামনেই ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে বালুচর। ছিলাম প্রায় বিশ-ত্রিশ হাত দূরে। বুঝতে পারলাম না কতটা নীচু। নীচেও খানিকটা সমতল চর। তারপরই দূর-আলোকের অস্পষ্ট রেখায় চকচক করছে জল।

তারা চারজন নেমে গেল নীচের সমতলে। আমি দূরেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারা চারজনও দাঁড়িয়েছে। এবার স্তিমিত হয়ে এসেছে গলার স্বর। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি ও চাপা গুনগুনানি।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল দুজন। চর বাঁদিকে বাঁক নিয়ে সরে গিয়েছে। কম্বলধারী চলে গেল সেই দিকে। বুঝতে পারলাম না, ওদিকটা আরও নীচু কি-না। কিন্তু তাকে আর দেখা গেল না। তারপরে একটি নারী গেল। সেও হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

বালকটিকে নিয়ে রইল আর-এক জন নারী। কিন্তু আর দাঁড়াল না। বালকটি এই ভয়াবহ শীতে জামা-কাপড় খুলে এগিয়ে গেল জলের দিকে।

শিশু বালকের এই দুঃসহ পীড়নে হৃদয় বিস্মিত ব্যথায় চমকিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই, নতুন দৃশ্যে আমার সর্ব চেতনা আড়ষ্ট হয়ে গেল। দেখলাম, সেই মেয়েটিও বিবস্ত্রা হয়েছে। এত শীতেও কোন তাড়া নেই। সবই মন্থরভাবে চলেছে। বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়াল সে কয়েক মুহূর্ত।

একেবারে স্পষ্ট নয়, কিন্তু অস্পষ্টও নয়। আমার সভ্যতাগর্বী মন থমকে গেল। নিজেকে আড়াল করার কিছু নেই এখানে। চোখের পাতা একবার চকিতে আনত হয়েও, মনের পাতা উঠল অবাধ্য হয়ে। কোন পাপ তো করি নি। পালাব কেন!

কিন্তু সে-ও কি আমাকে দেখতে পায় নি! মুক্ত আকাশের তলে, দারুণ হিমেল হাওয়া-মুখরিত চরে, মনে আমার অস্পষ্ট ভয় ঘিরে এল।

শূন্যে-ওড়া কালনাগিনীর মত তার উড়ন্ত দীর্ঘ কেশরাশি, তার বলিষ্ঠ দেহের সুস্পষ্ট রেখা, তার চাপা গুনগুনানি, সব মিলিয়ে পৃথিবীর চেহারা বদলে গেল আমার চোখের সামনে।

সে নেমে গেল জলের দিকে। চাপা পড়ে গেল গুনগুনানি। কিন্তু আমি তেমনি আড়ষ্ট, স্তম্ভিত। তাকিয়ে দেখি, চারদিকে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। আলো, এত আলো এল কোথা থেকে। পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পূর্বের প্রতিষ্ঠানপুরের আকাশের কোল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। দূর-পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দেখি, কালো অথচ তীব্র আলোকময়ী জলের স্রোতরেখা ছুটে আসছে আমার দিকে। আসতে আসতে আচমকা বাঁক নিয়ে চলে যাচ্ছে দক্ষিণে। যাচ্ছে এই প্রাক-উষা-মুহূর্তে গঙ্গার অস্পষ্ট হিম-বিধু-মুক্তা ধবল তরঙ্গের গায়ে গায়ে। এই মুহূর্তে নীল যমুনার রং হয়েছে নিকষ কালো। দূর পশ্চিমে তার ঝাপসা রেলওয়ে সেতু। উত্তর কোলে জলের বুক থেকেই উঠেছে দুর্গের পাথুরে ইমারত। কী হাওয়া! প্রাণনাশী ঠাণ্ডা হাওয়ায় যমুনার উত্তর তীরের উঁচু গাছের মাথা দুলছে। যেন ঝাঁপ দিতে চাইছে যমুনায়। ব্যাকুল হাওয়ার শনশন; যেন কোন অদৃশ্যচারিণীর ব্যাকুল গুনগুনানির মত আসছে ভেসে। আর মুরারিকায় কালী যমুনার বাঁকা স্রোতে ঝলকিত বাঁকা হাসি। সে হাসি গোপনে হেসে ভেসে চলেছে দূরে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার গঙ্গার কোল থেকে ভেসে এল সেই কণ্ঠের বাঁশির সুর:

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে।

গঙ্গার অদৃশ্য কোল থেকে উঠে এল সেই বালক। সে কাঁপছে থরথর করে। দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার ফাঁক দিয়ে এবার বিকৃত শোনাচ্ছে তার উচ্চারণ। শুকনো কাপড় থাবা মেরে তুলে নিল সে গায়ের উপর। বালকের পেছনেই

উঠে এল সে। সর্বচরাচরের মত সে আরও সুস্পষ্ট। সম্মুখ তার পূর্বদিকে। উষার সিন্দুরকণা ছড়িয়ে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। ভেজা চুলের রাশি এলিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে। তার শরীর অকম্পিত নয়। কাঁপুনি রয়েছে তারও গলার স্বরে।

চোখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। নিলামও তাই। ধার্মিকের ভক্তি নেই। চোখে আছে কিঞ্চিৎ নিতান্ত মানুষিক মোহের অঞ্জন। এসেছি যেন বানের জলে ভেসে যাব বলে। ডুব দেব বলে। কিন্তু সত্তা তো পেছন ছাড়ে নি। নিজেকে ভুলি কেমন করে।

তবু, আমার নগরসভ্য চোখ দেখেছে অনেক ছবি। বিদেশী শিল্পীদের অসংখ্য ভেনাস, মনের মানসী, নগ্ন নাগরী। দেখেছে দেশী শিল্পীর আঁকা হৃদয়মাধুরী-মেশানো নগ্ন-বিচিত্রার ছবি। তা ছাড়াও এ সভ্য চোখ বিষে আচ্ছন্ন দেশের দিগন্তজোড়া দেয়ালের ছবি দেখে। সেলুলয়েডের বুকে বীভৎস নগ্নতা দেখে।

কিন্তু এই নগ্নতা! ওই আকাশের মত, এই চরের মত, ওই গঙ্গা ও যমুনার মত দ্বিধামুক্ত নগ্নতা। নগ্নতা পরিবেশ-অন্ধ। নগ্নতা কী ভয়ঙ্কর অথচ কী অপরূপ!

বুঝি পথ ভুল করেছি। কিন্তু ভুল করে এসেছি কোন যুগে। ভারতের কোন বিগত শতাব্দীতে। বিষের ধোঁয়া নিয়ে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছিলাম সেই বিষের ফোঁটা কপালে নিয়ে। যখন থেকে দেখতে শিখেছি, দেখেছি বিষ-ক্ষতে ভরা দেশ। নিরন্নের মিছিল, অবিশ্বাস, ভয়, নিষ্ঠুরতা আর হাহাকার।

তবু আরও দেখি দেখি করে ছুটে এলাম। কিন্তু কোন যুগের হাত ধরে এসে এ ছবি ভাসল আমার চোখের সামনে। এও তো দেশেরই রূপ। বাছ-বিচারের কী ধার ধারি। যা ভাবতে পারি নি, তাই দেখলাম। তাই তো দেখব। ঘুরে ফিরে এ যে নিজেকেই দেখা। না দেখলে চিনব কী করে? বিস্ময় আর সন্দেহ? তার নিরসন তো পরে।

এবার তারা মিলেছে আবার চারজন। বস্ত্রে আবৃত করেছে নিজেদের। গঙ্গাস্তোত্র শেষ করে নতুন সুরে আবৃত্তি ধরেছে:

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড়বাহনমব্জনাভম্……

আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে আসছে তারা। নিশ্বাসের তালে তালে যেন ফুটছে দিনের আলো। পুরুষটিকে দেখে খানিকটা ভড়কেই গেলাম। এ যে একমাথা রুক্ষ চুল আর বিরাট গুঁফো পুরুষ। চোখও বেশ লালবর্ণ। লজ্জা যে কিছু ছিল না মনে, তা নয়; কিন্তু এ যে ভয় ধরিয়ে দিল। ধমকালে যাব কোথায়। তা ছাড়া কুম্ভমেলা সম্পর্কে নানান কথা শুনে একটা শিউরোনি ছিলই মনের মধ্যে।

কাছাকাছি এসে বয়স্ক পুরুষটি আমার দিকে বারকয়েক দেখল। সন্দিগ্ধ ও সপ্রশ্ন দৃষ্টি। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা। লোমশ বুক ভরে ছড়িয়ে পড়েছে। ডানায় ও মণিবন্ধে রুদ্রাক্ষের মণিবন্ধনী। কানের ছিদ্রে পরানো রয়েছে রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল।

তার পেছনে মেয়েদেরও তাই। মনে হল, দুজনেই যুবতী। তাদেরও রুদ্রাক্ষের অলঙ্কার রয়েছে গায়ে। ছেলেটিরও তাই। কিন্তু দেখবার অবসর ছিল না।

আমার কাছে দাঁড়িয়ে যেন অবাক বিস্ময়ে ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করল পুরুষটি। অবিশ্বাস্য হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখের ভাঁজে ভাঁজে। সঙ্কোচের হাসি। মোটা গলায় জিজ্ঞেস করল, একেবারে ঠেট হিন্দীতে, 'আপনি কি সেপাই নন?'

আমি? কোন দুঃখে? তাই ভেবেছে বুঝি লোকটি? ওভারকোটটার গুণ আছে দেখছি। বললাম, 'না তো।'

সে তার বড় বড় দাঁতগুলি বের করে বলল, 'মহারাজ, আমি ভেবেছিলাম আপনি সেপাই। নমস্কার মহারাজ, নমস্কার। সন্ন্যাসীকে কিছু দান করুন।'

কী ভেবেছিলাম, কী হল। এ যে দান চায়। কিন্তু নারী-শিশু-পরিবৃত, এ আবার কোন রকমের সন্ন্যাসী, তা তো বুঝলাম না। বললাম, 'তু-আপ-আপনি সন্ন্যাসী?'

সে হা হা করে হেসে উঠল। বাবা! এ যে অট্টহাসি। মনে হল, মেয়েরা ও শিশুটি মনে মনে মন্ত্র আবৃত্তি করছে।

সে হেসে বললে, 'জী মহারাজ, আমি সন্ন্যাসী। অবধূত আমি।'

অবধূত। কথাটি শুনেছি জীবনে কয়েকবার। কিন্তু অর্থ জানি নে। তবু অবধূতের সঙ্গে, এরা কারা? জিজ্ঞেস করলাম, 'সন্ন্যাসীজী, অবধূত কাকে বলে বুঝলাম না তো।'

সন্ন্যাসী হেসে পেছন দিকে তাকাল। আমিও সেদিকেই দেখলাম। মেয়েদের মধ্যে যে বালকের হাত ধরে ছিল, সে মাথা নীচু করে হাসছিল। সলজ্জ মিষ্টি হাসি তার মুখে। কুণ্ঠাজনিত লজ্জা। তার বয়স আমার মনে হল সতেরো-আঠারোর ঊর্ধ্বে নয়। আর-এক জন, সেও হাসছিল। তার লজ্জা নেই। সে তাকিয়ে ছিল অকুণ্ঠ হাসি নিয়ে। তার বয়স অনুমান করতে পারি নে। সে কিঞ্চিৎ খাটো, কিন্তু বলিষ্ঠ শরীর। একটু স্থূলতার লক্ষণও আছে। আর-এক জনের চেয়ে তার বয়স কিছু বেশীই মনে হয়। ছেলেটি নিতান্ত শিশু। বোধহয় আট-ন বছরের বেশী নয়। তার কাঁপুনি, তার মন্ত্র, তার বিস্ময়, সব মিলিয়ে সে একটি নিপীড়িত বেচারী মাত্র।

রুদ্রাক্ষ খুলে নিয়ে কাপড় পরিয়ে দিলে এরা যে গৃহস্থের বউ আর ছেলে হয়ে উঠবে এখনি। ওই হাসি-উচ্ছলিত মুখের উপরে ঘোমটা টেনে দিলে, এ মুখের পরিচয় যে বদলে যাবে মুহূর্তে। সন্ন্যাসী বলল, 'মহারাজ, আমার তো এখন সময় নেই। অবধূতের অনেক কথা। চলতে চলতে দুকথায় কিছু বলতে পারি।'

কৌতূহল দুর্নিবার। পেট থেকে পড়েই শিশু অন্ধকারে চেয়ে দেখে অবাক চোখে। দেখে দুর্বোধ্য মনের কৌতূহল নিয়ে, কুতকুতে চোখ বিস্ফারিত করে।

ছাড়ব কেন। শুনেই নিই, কী বলে। তাদের সঙ্গে আবার চললাম উত্তরের দিকে।

ইতিমধ্যে মেলা জেগে উঠেছে। কল-কোলাহল শুরু হচ্ছে আস্তে আস্তে।

এর মধ্যেই কোন কোন আশ্রমের মাইকে গীতা পাঠ ও প্রাতঃস্তোত্র আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সন্ন্যাসী বলল, 'এক কথায় অবধূত কাকে বলে জানেন? সন্ন্যাসীকেই অবধূত বলে। শৈব উদাসীনকেই বলে অবধূত। তার মধ্যে আছে রকমফের। সকলের তো একরকম নয়। কেউ হংসাবধূত, ব্রহ্মাবধূত। কিন্তু ওসবে কিছু যায় আসে না। ওসবে বিলকুল গণ্ডগোল আছে। আসলে দুই দল মহারাজ। ভগবান মহাদেবের আপনি ক-টা রূপ দেখতে পান? বলে সে আমার দিকে সপ্রশ্ন হাসি নিয়ে তাকাল। আমি? আমি তো কিছু জানি না। বললাম, 'আপনিই বলুন।'

সন্ন্যাসী আবার আচমকা হা হা হা করে হেসে উঠল। বলল, 'যখন তিনি ঘরে যান, তখন তিনি গৃহী। যখন তিনি বাইরে যান, তিনি উদাসীন। আমিও গৃহাবধূত। আমি ঘরে থাকতে পারি, আমি বাইরেও যেতে পারি। আমি কৌপীন আঁটতে পারি, ইচ্ছে করলে নাও আঁটতে পারি। যে-কোন আওরতকে আমি আমার সঙ্গিনী করতে পারি। আওরত মহাদেবী। মহারাজ, আমার মত অবধূত সিদ্ধিলাভে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।'

হবে হয়তো। কিন্তু গৃহাবধূতের মত এমন বিচিত্র কথা আর কখনো শুনি নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা আপনার কারা?'

সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ বয়স্কাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার অবধূতানী। আমার জেনানা। আর ওই আমার লেড়কি আর লেড়কা। ওদের দীক্ষা হয় নি। হবে।'

আমার মাথায় সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল। দেখলাম, লেড়কি নিতান্ত গৃহস্থ লজ্জাবতী বালিকার মত হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু বালক বেচারী বোধহয় স্তোত্র ভুলে গেছে! সে আমাকেই দেখছে হাঁ করে। আর অবধূতানী যে একজন খাঁটি মা, তা বোঝা যাচ্ছে তার স্নেহমুগ্ধ চোখ দুটি দেখে। কোথাও তো এদের সন্ন্যাসের ছাপ দেখি নে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি দান নিয়েই দিন চলে?'

সন্ন্যাসী বলল, 'সাধুকে দান করবার লোক কোথায় মহারাজ। আমার

ঘর আছে। আছে কিছু ক্ষেতি-বাড়ি। তাইতেই দিন চলে যায়। এখন তীর্থ করতে এসেছি। ভিক্ষামাত্র সার।'

ক্ষেতি-বাড়ির কথা শুনে অবাক হলাম। বললাম, 'কিন্তু এই ভোর রাত্রে তো কোন সাধুকে স্নান করতে দেখলাম না।'

সন্ন্যাসী আবার হেসে উঠল, 'দেখেন নি, কিন্তু অনেকেই করেছে। সব জিনিস কি দেখা যায়? শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী, এরই নাম মাঘব্রত, কল্পবাসীর অবশ্য কর্তব্য।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝলেন না? মকর সংক্রান্তি থেকে গঙ্গাচরে বাস করতে হয়। থাকতে হয় উপোস করে। শুনতে হয় ধর্মের কথা। শোনাতে হয়। আপনা সাধন করতে হয়। আর ব্রাহ্মমুহূর্তে নগ্ন হয়ে নাইতে হয়। তবে পরম ব্রহ্মা তুষ্ট হন।'

পরম ব্রহ্মাকে তুষ্ট করার জন্য এই ভয়াবহ শীতে স্নান! অবধূতানীর কথা বাদ দিই। কিন্তু ওই যুবতী আর বালক, ওরা কেমন করে দ্বিধামুক্তভাবে নগ্ন হয়ে স্নান করে। আবার আমি তাকাতে আরক্তিম হয়ে উঠল অবধূতের মেয়ের মুখ। সে এক ভাবী অবধূতানী, কিন্তু গৃহকন্যার চারিত্রিক অলঙ্কার ভরে রয়েছে তার আপাদমস্তকে। তার আলুলায়িত কেশের আড়াল দিয়ে ঢেকেছে সে তার মুখ ও বুক। সামনে যে তার পরপুরুষ।

আমার মনে হল, সন্ন্যাসী অবধূত হোক, আর গৃহাবধূতই হোক, আমি দেখছি, সে পরম ধার্মিক, সদাহাস্যময়, প্রেমিকা স্ত্রীর স্বামী, আদুরে ছেলেমেয়ের বাবা।

এখন আর আমার এগুনো সম্ভব নয়। আবার তাঁবুর সারি আরম্ভ হয়েছে। লোকালয়ে এসে পড়েছি। সামনেই তাঁবুর পায়খানা সারবন্দী। ফিনাইল আর ব্লিচিং পাউডারের হালকা গন্ধ লাগছে।

পকেটে হাত দিয়ে ব্যাগ বার করলাম। অবধূতানীর চোখে এবার কৃতজ্ঞতার চড়া হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। বালকটি অপলক বিস্ময়ে দেখছিল আমার পয়সার ব্যাগ। আর কুমারী তার এলোচুলের আড়ালে আড়চোখে দেখছিল আমি কী করি।

সন্ন্যাসীকে পয়সা দিয়ে বললাম, 'আমার ক্ষমতা কিছু নেই। এই সামান্য…'

সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বিস্ফারিত চোখে বাধা দিল আমাকে, 'খবরদার মহারাজ, ওকথাটি বলবেন না। আপনার যা কৃপা, সে-ই ভগবানের কৃপা। এই কৃপা ভিক্ষা করে বেড়াব আমি সারাদিন। মহারাজ, আজকে নেয়ে উঠে আপনাকে দর্শন করেছি। একদিন সে এমনি করেই হয়তো আমার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে, কিংবা যাবে। কিন্তু আমি তো কোনদিন জানতেও চাইব না। কৃপাভিক্ষাই আমার ভিক্ষা।'

সন্ন্যাসীর হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। লাল চোখ চিন্তামগ্ন। ঠিক চিন্তামগ্ন নয়, যেন পাগলের মত দিশেহারা হয়ে উঠল।

বললাম, 'চলি তাহলে।'

সন্ন্যাসী বলল, 'মহারাজ, আপনি কোথায় থাকেন?'

আশ্রমের নাম বললাম। সে বলল, 'তুলসীমার্গের পথ জানেন আপনি?'

তুলসীমার্গ? ভাবলাম হয়তো মেলার বাইরে কোথাও। বললাম, 'না তো।'

সে বলল, 'দু নম্বর পুলের রাস্তা দিয়ে পুবে গেলে নির্বাণী আশ্রম। সেই পুবের রাস্তাই তুলসীমার্গের পথ। সেই পথে গেলে পাবেন ১০৮ শঙ্করাচার্যের আশ্রম। ওই আশ্রমের পেছনে আমার পাতার ঘর। সন্ধ্যাবেলা আপনি আসবেন সেখানে। কৃপা করে আসবেন।'

হঠাৎ কেন তার এই ব্যাকুলতা, বুঝতে পারলাম না। আমার মত নিতান্ত ধর্মবিমুখ আর বস্তুবাদী মানুষের সঙ্গে তার কী কথা হবে! বললাম, 'সময় পেলে যাব।'

'আচ্ছা, মহারাজ, আপ—কা—কৃপা।'

বলে তারা সদলবলে এগিয়ে গেল। অবধূতানী বিদায় নমস্কার জানাল ঘাড় বাঁকিয়ে হেসে। বালকটি দাঁড়িয়েই ছিল আমার দিকে তাকিয়ে। দিদি টের পেয়ে, পেছন ফিরে নিঃশব্দে হেসে উঠল। হেসে এসে তাড়াতাড়ি ভাইয়ের হাত ধরে নিয়ে চলে গেল।

বিদায় দিয়েও দাঁড়িয়ে ছিলাম। গৃহাবধূত। সে কেমন জানি নে। কিন্তু

এ যে পুরো মানুষ। হোক তার নাম গৃহাবধূত। তার পিতৃত্ব, তার স্বামিত্ব, তার ঘর ও সংসার এই নিয়ে যদি তার সব সুন্দর হয়ে ওঠে, তবে উঠুক। আজ আর তার বাইরে তার প্রতি শুভেচ্ছা আমার কী থাকতে পারে।

তাঁবু-লাইনের এপাশ-ওপাশ দিয়ে যেতে যেতে হারিয়ে গেল ওরা চার-জন। হারাল না মন থেকে। মানুষী মোহের অঞ্জনটুকু একটি অপরূপ রঙের ছোপ লাগিয়ে রেখেছে মনের মধ্যে। সেই সঙ্গে কিছু বিস্ময়, একটু সংশয়।

ভাবলাম, কোনটুকু সত্য। একদিকে অপরিসীম উদাসীনতা, আর এক দিকে সীমাহীন লজ্জা। যেন নিরালার লজ্জাবতী লতাটির মত। ডাঁটোসাঁটো লতাটি, দিব্যি চিকন পাতা মেলে সর্বাঙ্গ উদাস করে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। ছোঁয়ামাত্র মুখ ঢেকে মিশে যায় মাটির বুকে।

কিন্তু লতা নয়, মানবী যে। সে সন্ন্যাসী-বালা। ঘরে-বাইরে, জীবনে-মরণে নারী আমাদের সঙ্গিনী। নানান বেশে ও নানান সম্পর্কে পরস্পরের অসঙ্গতি চোখে লাগে। বৈচিত্র্যে কুতূহলী হই। দুঃখে জানাই সমবেদনা, সুখে দিই সঙ্গ। মনের চারপাশে খাড়া রয়েছে সমাজের প্রাচীর। তাই ভাবি। তাই ভাবলাম। ঘর ছেড়ে চলে এসেছি পথে। 'কোন বাঁধন রাখবো না গো' গেয়ে গেয়ে পথে বেড়ালেও মন মাঝে মাঝে থমকায় বৈ কি। সেটুকুনই তো বাঁচোয়া। নইলে আকাশ-বাতাস সবই যে একাকার হয়ে যেত। ফুল, জল, পাতা, পাখি সবই ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন অনুভূতি জাগায়। গানে আর সুরে আনে বৈচিত্র্য। নইলে চোখ থেকেও কানা। মন থেকেও পাথর।

তাই ভাবি, যে মেয়ে লজ্জায় লজ্জাবতী, সে মেয়েই অকুণ্ঠ উদাসীনতায় প্রকৃতির মত নগ্ন। কোনটা সত্য?

রূপ দেখে বোঝা যায় না। বোঝা যায় না হাত দিয়ে স্পর্শ করলে। মন দিয়ে ছুঁতে হবে। জানি নে কোথায় নির্বাণী আশ্রম, আর কোথায় তুলসী-মার্গের পথ। বালুচরের কোন সীমানায় আছে অবধূতের পর্ণকুটির। তবু দেখার দেখা নয়, দেখার মত করে দেখতে চাই। নইলে দেখা সাঙ্গ হয় না। সে হোক ভারতের গৌরব কিংবা হোক কলঙ্ক।

পূর্ব-দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সোনালী রোদ। রোদ তো নয়, মৃতের

প্রাণসঞ্জীবনী। শীতার্তের ব্যথিত আড়ষ্ট দেহে উষ্ণ দেহের আলিঙ্গন। কী মিষ্টি, কী সুন্দর, কত আরাম! দুদিন যাক, আবার এই রোদকেই আড়াল করে গাল দেব মনে মনে। এই-ই নিয়ম।

রোদ উঠেছে। ঝুসির সুদীর্ঘ ছায়া পড়েছে বালুচরের মেলায়। তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে নরনারী। মাইলের পর মাইল জুড়ে গুনগুনানি উঠেছে কোলাহলের। নিত্যনৈমিত্তিক স্নানের জন্য চলেছে সবাই জলের দিকে। একদিকে মাইক-যন্ত্রের যান্ত্রিক চীৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর আশে-পাশে দেখছি স্নানার্থী অর্ধনগ্ন সাধুরা চলেছে স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে কখনো কর্ণবিদারী শব্দ উঠছে, 'জয় মহাদেব কি জয়,' 'রাম রাম, সীতারাম'। দূর থেকে ভেসে আসছে অনেক কাড়া-নাকাড়ার আওয়াজ। তার সঙ্গে স্তিমিত শিঙাধ্বনি।

জাগছে মেলা। আর দাঁড়াতে পারি নে। আবার তো ফিরে যেতে হবে সেই দিদিমা আর পেল্লাদের তাঁবুতে। তার চেয়ে খুঁজে নিই আশ্রয়।

কিন্তু কোন দিকে যাই! কোন দিকে যাই ভেবে পিছন ফিরতেই দেখি, আপাদমস্তক কম্বলে-ঢাকা পাঁচ-বত্তি। আমার পিছনেই যেন গুপ্ত আততায়ী। কী সাংঘাতিক! পাঁচ-বত্তি তো নয়, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বইয়ের সেই দৈত্য। কিন্তু কেন, কী করেছি, কারোর বাড়া ভাতে তো ছাই দিই নি। তবে এমন বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত লেগে রয়েছে কেন সে। না, বাঘের পিছনে ফেউ বলি কি করে। শিকারের পেছনে বাঘ। রাত না পোহাতে এ কি বিভ্রাট! মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবু কথা না বলাটা যেন বিসদৃশ দেখায়। হেসেই বললাম, 'ডাক্তারবাবু যে?'

ডাক্তার মুখিয়ে ছিল। বলামাত্র মাথা থেকে কম্বলটা খুলে ফেলল সে। পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার ভয়ঙ্কর মুখটা। কেন কোমর বাঁধছে। কিসের যে এত রাগ, তা জানি নে। প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ডাক্তার নয়, ধন্বন্তরি। সব রোগের ওষুধ জানি।'

সে তো ভাল কথা। কিন্তু কী কথার কী জবাব। পৃথিবীতে একরকমের মানুষ আছে, ভাল বল মন্দ বল, তাদের মন পাওয়া দায়। এগুলো ভেড়ের

ভেড়ে, পেছুলে নিব্বোংশের ব্যাটা। ছেলেবেলায় দেখেছি, পাড়ার মোড়ে থাকত একটা ছেলে। নাম বেচা। ছেলে নয়, প্রায় মিনসে। বেচা ছিল এমনই এক মানুষ। তার কিছুই করি নি কোন দিন। কিন্তু তার সামনে পড়লেই চোখ কুঁচকে তাকাত খপিসের মত। আর প্রাণ ভরে কষাত গাঁট্টা, ঘুষি, চড়। একেবারে অকারণ। বাড়ি থেকে বেরুনো এক আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাউকে বলতেও বাধত। খালি মা কালীকে ডাকতাম, 'হে মা কালী, হয় বেচাদের ওই বাড়ি থেকে উঠিয়ে অন্য পাড়ায় নিয়ে যাও, না-হয় ওর হাত দুটো দাও ভেঙে।'

এই পাঁচ-বদ্যি যেন তেমনি। আমার ছেলেবেলার বেচা। কিন্তু সেই ছেলেবেলার রাজ্যে আমরাই ছিলাম আমাদের নবাব-বাদশা-খলিফার দল। দুর্বল হলে বহু আজগুবি সন্ধিস্‌ত্রে বশ্যতা স্বীকার করতেই হত।

কিন্তু এখানেও কি সেই! ডানা মেলে উড়ে এলাম পায়রাটির মত, ওদিকে বাজপাখি ঠোঁট শানাচ্ছে। তবু বললাম, 'কোথায় চললেন ?'

ডাক্তার এক পর্দা গলা চড়াল, 'যেখানেই চলি তোমাকে চোখে চোখে রাখছি ঠিক। হ্যাঁ।'

আমিও একবার একটু উষ্মাভরেই বললাম 'কেন বলুন তো ?'

'আমার খুশি।' বলে ডাক্তার বুক চাপড়াতে গাদাখানেক ধুলো ঝরে পড়ল তার কম্বল থেকে। আর গলা কি—একেবারে বাজখাঁই। রাগও যেমন হল লজ্জাও হল তেমনি। আশেপাশে লোক। সবাই কৌতূহলী হয়ে দেখছে হাঁ করে।

থামাতে গেলাম। কে শোনে। ডাক্তার ঠিক তেমনি গলায় বলে চলল, 'মনে করেছ, আমি তোমাকে বেরুতে দেখি নি ? রাত করে কেন ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছ ? কথা নেই বার্তা নেই, বেরুলেই হল ?'

চেষ্টা করেও গলা চড়াতে পারি নে। বললাম, 'কেন, বেরুনো কি নিষেধ ?'

'চোপ! চোপরাও। বলেছিলাম না, 'তোমাকে দেখে নেব। আই অ্যাম ডক্টর পাঁচুগোপাল রায়।'

তা ঠিকই, কিন্তু এ অপমানের কারণ কি ? কারণ কি খ্যাপামির ?

দেখে নেওয়ার ব্যাপার হলে দেখতে হবে। তা কি এমনি করে? স্বভাবতই কৌতূহলী লোক দু-একজন জমেছে আশেপাশে। মেলার ব্যাপার। কে রোধ করবে। হায় রে, এ কোন অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ছুটে এলাম! বললাম, 'ডাক্তার নয় ধন্বন্তরিই। কি দেখবেন, দেখুন। অত চেঁচাচ্ছেন কেন?'

'আলবত চেঁচাব।' বাংলায় যাকে বলে তড়পানি, ডাক্তার সেরকম শুরু করল।

তারপরে যা হয়। একজন সাধুবেশী মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল ডাক্তারকেই, 'ক্যায়া হুয়া বাবা?'

যা বলো, সবই আগুনে ঘি। সাধুকেই তেড়ে গেল, 'যো হুয়া সো হুয়া, তুম্‌কো কেয়া? তুম্ আপনা রাস্তা দেখো।'

সাধুর বৈরাগ্যের মিষ্টি হাসি চকিতে উধাও। বেচারী মুখ গোমড়া করে চুপ হয়ে গেল।

ডাক্তার আমার মুখের সামনে তর্জনী নেড়ে আবার বলল, 'আবার আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে ধন্বন্তরি বলে?'

'কেন আপনিই তো—'

কে শোনে। কোথায় আগুন লেগেছে না জানলে জল ঢালবে কোথায়! ডাক্তার প্রায় লাফিয়ে ওঠে আর কি! 'জানো, আমি তোমার বাপের বয়সী?'

তাতে আর আশ্চর্যের কী? বললাম 'তা তে দেখছিই। তা আমাকে কেন? বাপের বয়সী আছেন, ঘরে গিয়ে নিজের ছেলেকে শাসন করুন।'

'কেন, আমার কি ছেলেমেয়ে থাকতে নেই?'

কথার কি অদ্ভুত অসঙ্গতি। ডাক্তারের কোয়ালিটি ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে। শেষটায় কি একটা বদ্ধ পাগলের হাতে পড়লাম? বললাম, 'থাকবে না কেন? একশোটা থাকতে পারে।'

'একশোটা?'

'না হয় দুশোটাই?'

'তার মানে, আমার কিছু নেই? আমাকে আঁটকুড়ো বললি তুই?'

একেবারে ,তুই'। ট্রেনের ভিড়ে একবার মোষের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বিপদে পড়ে। এও প্রায় তেমনি বিপদ। উদ্ধার পেতে হলে পালটা রূপ ধরতে হবে। উপায় নেই। রুখে-মুখে চড়া গলায় ডাক্তারকে শেষবারের জন্য সাবধান করতে গেলাম।

কিন্তু কাকে বলব। ডাক্তার ততক্ষণে কম্বলটি বগলদাবা করে হাঁটা ধরেছে। হাঁটছে খ্যাপা মোষের মতই। পদাঘাতে বালু ছিটকে যাচ্ছে। খানিকটা গিয়ে আবার দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই বলল, 'আমি আঁটকুড়ো? আচ্ছা, দেখে নেব তোকে, দাঁড়া।'

বলে আবার চলতে আরম্ভ করল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল। যেন ঝড় বয়ে গেল একটা। ছিলাম সুস্থ, করে গেল উদ্‌ভ্রান্ত। এতই আকস্মিক ব্যাপার, এমনই অদ্ভুত যে, তার না বুঝলাম অর্থ, না কারণ। হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ যে উন্মাদ!

কে জানত। কে জানত, পথে বেরিয়ে এমন মানুষের হাতে পড়ব। ভেবেছিলাম, দু-চোখ ভরে দেখব। বাজাব আপন মনে, তাল দিয়ে যাব নিজেরই সুরে। এ যে তাল আর সুর, সব ছরকুটে যায়।

তবে হ্যাঁ, বেরিয়েছি, একটা কথা ভাবি নি তো! প্রকৃতির ঘরের কোন রূপসী আমার জন্য সাজিয়ে রাখবে শুধু নির্মেঘ আকাশ, ফোটা ফুল আর সুকণ্ঠ বিহঙ্গী! তার বিচিত্র দেহ জুড়ে নেই গুমসোনি গুমোট? ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগের ঘনঘটা? তবে? পথের দশাই এমনি।

কত রূপ! কিন্তু কই, কালকেও তো ডাক্তারকে এতখানি গণ্ডগোলে মানুষ মনে হয়নি। কিছুটা মনে হয়েছিল, কিন্তু একেবারে এত অসঙ্গত ঠেকে নি। আর, একি শুধু আমার কাছে? এই পাগলামি, খ্যাপামি, এত অসঙ্গতি।

অসঙ্গতি। মনে পড়ল, রাত্রে নিঃসাড়ে ডাক্তারের তাঁবুতে প্রবেশ। জায়গার অভাবে চলে যাওয়া। তারপরে এত কথা। তার শেষের কথাগুলি। শেষের কথাগুলিতে শুধু রাগ নয়। চোখ তার যন্ত্রণায় লাল হয়ে উঠেছিল যে! এই অসঙ্গতির মধ্যে যেন কোথায় একটু সঙ্গতি রয়েছে। বেসুরের মধ্যে সুর। ডাক্তার চলে গেল না, যেন পালাল। পালাল যেন অসহায়ের মত।

মন ফিরে গেল আমার। যা বল, তাই বল। লজ্জা-ঘেন্না-ভয়, তিন থাকতে নয়। উৎসুক হয়ে তাকালাম ডাক্তারের পথের দিকে। ওই যে দেখা যায় এখনো। মস্ত লম্বা মানুষ। ছোট হয়ে আসছে। চলেছে গঙ্গার ধার দিয়ে, উত্তরে। ভুল করেছি। ছেড়ে দেব না, ধরব ডাক্তারকে।

কী আমার কপাল! পাশে জড়ো হয়েছে সব অবাঙালী মেয়ে-পুরুষ। গুলতানি করছে নিজেদের মধ্যে। আবিষ্কার করছে আমার আর ডাক্তারের সম্পর্ক। দুই বাঙালী, আপনা-আপনি ঝগড়া বাধিয়েছে। হবে দুই ভাই, নয়তো বাপ-ব্যাটা। আপসে ঝগড়া মিটিয়ে নাও বাপু। কি বল, অ্যাঁ?

ঠিকই, দাঁড়িয়েছি মঞ্চে, ভূমিকা নিতে হবে না? না নিলে দর্শক ছাড়ে? নিজেই কি ছাড়ি?

সেই ভাল। আপস করব ডাক্তারের সঙ্গে। হাঁটা ধরলাম। মিলিয়ে যাচ্ছে ডাক্তারের চেহারা। ডাকলে শুনতে পাবে না। পা চালিয়ে দিলাম দ্রুত। আশ্রয় খুঁজব পরে।

দোকানপাট খুলেছে। কত দোকান, কত রকমের। দেখবার সময় নেই। পদে পদে বাধা মানুষের দঙ্গল। মেয়েমানুষের হাত ধরে সব লাইনবন্দী হয়ে চলেছে। এঁকেবেঁকে যেতে হয়।

অনেকখানি এসেছি। ডাক্তার তেমনি চলেছে। একেবারে নাক বরাবর। ডাকলে শুনতে পাবে কি-না জানি নে। তবু একবার ডাক দিলাম, 'ডাক্তারবাবু!'

ঠিক শুনেছে। থমকে দাঁড়াল ডাক্তার। বাজে-মাথা-মুড়নো তালগাছের মত বিরাট চেহারা। হঠাৎ মনে হয়, অনেকদিনের পরিখাবাসী নিগ্রো সৈনিক। পেছন ফিরে একবার দেখল আমার দিকে। দেখেও আবার চলল হনহন করে।

ডাকলাম, 'শুনুন ডাক্তারবাবু।'

আর নয়। ডাক্তার ততক্ষণে সেতুতে পা দিয়েছে। ওপারে চলল যে! চলুক, ভেবেছি যখন ডাক্তারকে একবার ধরবই।

ওপারে, কেল্লার প্যারেড গ্রাউণ্ডে এসে ধরে ফেললাম ডাক্তারকে। প্যারেড গ্রাউণ্ড, সঙ্গমের ত্রিকোণ ভূমি। এখন মেলার আসর। ডাক্তারকে

ধরে ফেললাম, একটা ভিড়ের কাছে। অনেক মেয়েপুরুষের ভিড়। কিসের ভিড় না দেখেই ডাক্তারকে ডাকলাম।

বোধহয় ভিড়ের বাধাতেই দাঁড়াতে হল ডাক্তারকে। দাঁড়িয়ে আড়চোখে তাকাল আমার দিকে। মুখে কোন কথা নেই। গুঁতোবার আগে সিং কাত করে যেমন আড়চোখে তাকায় ষাঁড়, তেমনি ভাবখানা ডাক্তারের।

কিন্তু কী যে বলি। আশ্চর্য! এত যে ছুটে এলাম, এখন আর মুখে আমার রা ফোটে না। সত্যি, কী বলব?

সামনেই ভিড়। ভিড়ের কাছেই একটা মস্ত মোটরগাড়ি। গাড়িটাতে রেকর্ডে গান দিয়েছে সেই মাতাল মেয়ের। মাতলামির হিক্কা আর 'হম্‌পী-কে আয়ে।' কী যেন হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে গাড়িটা থেকে। কী দিচ্ছে। চা! আরে, তাকিয়ে দেখি গাড়িটাতে লেখা রয়েছে, অন্নপূর্ণা উইমেনস রেস্টুরেণ্ট।

চৌরঙ্গীর কাফেটেরিয়া। কোথা থেকে এসেছে? দিল্লী না লক্ষ্নৌ। সামনে যমুনা, আর এই চলন্ত কাফেটেরিয়া। দিব্যি ফোল্ডিং চেয়ার-টেবিল পেতে আসর জমিয়ে তুলেছে এই বারোমাসের বালুচরে। টেবিলে টেবিলে উষ্ণ চায়ের কাপে ধোঁয়া। শীতে আঁটো-সাঁটো হয়ে সুড়ুত সুড়ুত করে চুমুক দিচ্ছে সুবেশিনী মেয়ে, আর সুবেশ পুরুষের দল। ওদিকে কুপন আর ক্যাশ নিয়ে বসেছেন ক্যাশিয়ারবাবু। মোটা-সোটা টেকো মানুষ। শীতে হাত কাঁপছে থরথর করে।

একটু যে ভয় না ছিল, তা নয়। তবু বললাম, 'চা খাবেন ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারের মুখে কথা নেই। আড়চোখে যেমনি আমাকে দেখছিল, তেমনি একবার দেখল অন্নপূর্ণার গাড়ির দিকে। দেখল চায়ের মজলিসের দিকে। তারপর গাড়ির শো-কেসের খাবারের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

মৌন সম্মতির লক্ষণ কি-না জানি নে। কিন্তু কথা আর ফুটবে বলে মনে হল না। যেন—যা বলার, তা বলা হয়ে গেছে। আর মুখ খুলবে না।

বললাম, 'দাঁড়ান একটু। আমি কুপন কেটে নিয়ে আসি।'

বলে কুপন কেটে আগে দু-হাতে খাবারের ডিশ নিয়ে এলাম। এসে

দেখি, ডাক্তার নেই। যেমন হতাশ হলাম, মনটাও খারাপ হল তত। ডাক্তার একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল খাবারের দিকে। খাবার নিতে নিতেও তাই লক্ষ্য করেছি। এর মধ্যে সে কোথায় গেল। মজলিসের দিকে ফিরে দেখি, ডাক্তার দিব্যি চেয়ারে বসেছে। চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে তার টেবিলের একমাত্র সঙ্গিনীর দিকে। পাঁচ-বত্তির বসার ভঙ্গি ও চোখ দেখে বোধহয়, চা আর নামছে না সে বেচারীর গলা দিয়ে।

আমি তাড়াতাড়ি খাবারের ডিশ দুটো ডাক্তারের সামনে রেখে জল আর চা আনতে চলে গেলাম।

চা আনতে গিয়ে দেখি মস্ত বড় কিউ পড়ে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়লাম সারবন্দী লাইনের পিছনে। একটু অস্বস্তি লাগল। অস্বস্তি লাগল এই ভেবে, ডাক্তার না আবার সরে পড়ে। কিন্তু লাইনে দাঁড়াতেও বড় আনন্দ হচ্ছে।

সত্যি, মেলা যেন নতুন রূপে জমে উঠেছে। মেতে উঠেছে সকলে। বোধহয় একেই বলে মেলা। ইংরেজীতে যাকে বলে মুড, সেই মুড এসেছে সকলের মনে। মেলার মুড। অন্তত আমার চারপাশে তো দেখি তাই।

অন্নপূর্ণার গাড়ির রেকর্ডে 'হম্ পী-কে আয়ে'র মাতলামি শেষ হয়েছে। হঠাৎ বেজে উঠেছে সেই মান্ধাতা-আমলের বাংলা রেকর্ড। লম্ফর আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশী। রেকর্ডে আর গানের কথা শোনা যায় না। যন্ত্রসঙ্গতের অস্পষ্ট অথচ কর্ণবিদারী ধ্বনি শোনা যাচ্ছে কাঁসর ঘণ্টার মত। তারই ভেতর থেকে পিঁ পিঁ করে শোনা যাচ্ছে, 'প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে রয় না বাহিরে'।

তা হোক। প্রয়োজন হচ্ছে একটা শব্দের। গান শুনছে কজ-না। ওদিকে কাড়া-নাকাড়ার ধ্বনি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঁধের উপরে যাচ্ছে যত লোক, নেমে আসছে তার চেয়ে অনেক বেশী। যেন পিলপিল করে নেমে আসছে পিঁপড়ের সারি। আসছে লটবহর নিয়ে। টাঙ্গা আর রিক্সা, ঘোড়া আর গাধা, লরি আর বেঁটে চ্যাপ্টা প্রাইভেট কার। আর দিগন্ত থেকে দিগন্তে শুধু মানুষ। নর আর নারী। রঙ আর রঙ। কথা আর কথা। গান আর গান। মাইকের কথা আর কতবারই বা বলব।

চারিদিকে এত কোলাহল। কিন্তু ধন্য সেই আর্তস্বর, 'হেই বাবু ভাইয়া পঞ্চ্ লোক সকল, হেই ধর্মীবাবা।'···আশেপাশের সব গণ্ডগোল ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে সেই অদৃশ্য ভিখারীর তীব্র চীৎকার। চীৎকার খাবার-ফেরি-ওয়ালাদের। আম্‌রুদ্। লে সস্তা আম্‌রুদ্। পেয়ারার নাম আমরুদ্। আমরুদ্ আর পুরি। পুরি আর প্যাড়া। প্যাড়া আর মোম্‌ফালি। মোম্‌ফালি হল চীনেবাদাম। দেখতে পাচ্ছি ফেরিওয়ালাদের পেছনে লেগেছে পুলিশ। লাইসেন্সের ব্যাপার। হাজার হাজার টাকা জমা দিয়ে দোকান করেছে মহাজনেরা। ফেরিওয়ালাদের অনধিকার প্রবেশে বাধা পড়বেই। কিন্তু তাড়া দেবে কত। কত লাগবে পেছনে। পাঁচিল নেই, গেট নেই। মুক্ত সঙ্গমপ্রান্তর চারিদিকে করছে হা হা। ধাওয়া করবে কোথায়। যাবে এপার থেকে ওপাশে। প্রান্তরের এপাশ থেকে ওপাশে। যেখানেই যাবে, মানুষ। মানুষ থাকলেই পেট। আর মেলার মানুষের পকেটের পয়সা। সে তো খাবার-সন্ধানী পিঁপড়ের মত। ফুটোর এপাশ ওপাশ দিয়ে বেরোয়।

যে কিউতে দাঁড়িয়েছি, সেখানে আর-এক রূপ। কুম্ভমেলারই ভিন্ন রূপ। কিউ দিয়েছে মেয়েপুরুষ। চোখ-ঝলসে-যাওয়া উলেন পোশাকের ছড়াছড়ি। মেয়ে-পোশাক আর পুরুষের হাল-ফ্যাশানের আমেরিকান স্যুট। ঝকঝকে আর চকচকে। খুবই দামী, নিঃসন্দেহে। এই সাত সকালেই ঠোঁটে আর নখে রঙ পড়েছে। পরিপাটি অ্যালবার্ট ফ্যাশানের চুল।

ওরকম চুল দেখলেই আমার একটি কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে একটা মজুর বস্তির কথা। বাপ শাসন করছে ছেলেকে। কারখানার মজুর দুজনেই। শাসন নয়, বোধহয় বিদ্রূপই করছিল বাপ ছেলেকে। ছেলের পোশাকের বড় পরিপাটি। তাই বাপ বলছিল, 'বড়বাজারের ফোকট্ কা পাত্‌লুন, চোরবাজার কা জুত্তা, ঔর চুল কো সিঙ্গাড়া বনা কর কাঁহাকা লাট-সাহিব কা ভাতিজা আইলান তু ?'

বড়বাজারের ফোকোটের প্যাণ্ট আর চোরাবাজারের জুতোর একটা মানে বুঝি। কিন্তু চুলকে সিঙ্গাড়া বানানো ? সে আবার কি ! পরে শুনেছিলাম,

ওই অ্যালবার্ট ফ্যাশান হল সিঙ্গাড়া। হেসেছিলাম, কিন্তু সিঙ্গাড়ার সঙ্গে অ্যালবার্টের এই আঙ্গিকগত সাদৃশ্যটা সত্যই লক্ষণীয়।

যাক সে কথা। পরিবেশটি নতুন রকম। ফ্যাশানটা স্বভাবতই আজকাল স্টুডিও-ঘেঁষা। গ্রেগরি পেক্ আর সুশান হেওয়ার্ড, দিলীপকুমার আর···। যাক্, নাম বাড়িয়ে লাভ নেই। ফ্যানবৃন্দ আহত হতে পারেন। এ বিষয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের বক্তব্য বলার ইচ্ছা রইল পরে। তা বলে আমার মত ব্যতিক্রমও আছে বৈ কি কিউতে। রাজস্থানী নাগরা আর গালপাট্টা, চোদ্দ হাত শাড়ি আর তিন ইঞ্চি ডায়মেটারের নথ। তাদের হাসির আর অন্ত নেই। 'টিকস' কেটে চা কিনতে হয়? আজব কাণ্ড! এটা জেনানা-লোকদের চায়েখানা? আরে রাম রাম কহো। এসে পড়ো, এসে পড়ো। চার পয়সা দিয়ে টিকস কাটাও আর লাইন দিয়ে পেয়লীভর চা পিয়ে নাও।

চা পাওয়ার ও খাওয়ার এ অভিনব পন্থা দেখবার জন্যই ভিড় করেছে কত মানুষ। পুরুষ আর মেয়েমানুষ। কৃষাণী ঘোমটা-খসা উদাসিনী। এ কি গো বিস্ময়! জেনানা তক্ লাইন দিয়ে চা খাচ্ছে। দিনে দিনে কতই হবে। তা ছাড়া বে-আব্রু মেয়েদের পোশাকই কি। পাক্কা মেমসাহেব বনে গিয়েছে সব।

খুব গা টেপাটেপি আর হাসাহাসির ধুম। এমন কি .পুরুষদের মধ্যেও। আমার সামনেই হাল-ফ্যাশানের স্যুট-পরা এক যুবক। তার সামনে এক সুবেশিনী যুবতী। সম্ভবত স্ত্রী। ভেবেছিলাম, গান কেউ শোনে না। কিন্তু এরা দুজনে কিউতে দাঁড়িয়ে সেই আলোচনাতেই মশগুল। তারা কান পেতে আবিষ্কার করছে, কী গান বাজছে রেকর্ডে। যুবতী বলল, 'বোধহয় ওড়িয়া গান।' যুবক বলল, 'আমার মনে হচ্ছে মাদ্রাজী।'

আর আমি বাংলা গানের এ ভাষা-আবিষ্কার শুনে হাঁ। যত অস্পষ্টই বাজুক, তা বলে, 'প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে' একেবারে ওড়িয়া না-হয় মাদ্রাজী! কপাল আমার বাংলা ভাষার। ধন্য আমার বাংলা গানের শ্রোতা।

মেলা সরগরম। এই আবেষ্টনী, আর চেয়ার-টেবিলের ছড়াছড়ি। রেকর্ডে কী বাজবে? ঘরছাড়া মানুষের গলায় গান আপনি গুনগুনিয়ে ওঠে।

এ পরিবেশ দেখে ভুলে যেতে হয় অবধূতের কথা। বিস্মৃতি আসে কুম্ভমেলার। শহুরে জীবনের এক নতুন পকেট যেন।

চা পেতেই ছুটে এলাম। ছি ছি, ডাক্তার এখনও সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে কটমট করে। তার টেবিলের নেহাত এক সুন্দর-মুখ ভালো মানুষ সঙ্গিনী। অবাঙালিনী, নিঃসন্দেহে। কোন কোন শিকারীর নজরেই বন্দী হয়ে পড়ে শিকার। মহিলাটির অবস্থা প্রায় সেইরকম।

আমি আসতে বোধহয় একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল বেচারী। চোখে তার বাসি সুর্মার দাগ। নেহাত বাঙালিনীর মত চোখ তুলে তাকাল। ভাবখানা, কি রকম মানুষ! একটা পাগলকে বসিয়ে রেখে গেছ এখানে?

অপরিচয়ের মধ্যেও মানুষ কথা বলে বৈ কি। বলে নীরবে, চোখে চোখে। মহিলাটি একটি কটাক্ষ করে উঠে গেল। দেখলাম, পেয়ালায় চা রয়েছে এখনো। চুমুক দেবারও সুযোগ পায় নি।

সে উঠে যেতে ডাক্তারও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। দলা-করা কম্বলটা টেবিলে রেখে ফিরে তাকাল মেয়েটির চলার পথের দিকে। তারপর আমার দিকে। খ্যাপামিটা এখনও একেবারে যায় নি মুখ থেকে। কোন কথা না বলে দিব্যি পেয়ালা টেনে নিয়ে চুমুক দিল। খাবারটা খাবে না নাকি? কি জানি! যা মানুষ!

ভাবতে না ভাবতেই খাবারে হাত পড়ল ডাক্তারের। যত হাত পড়ে ততই ডাক্তারের ভয়ঙ্কর মুখের নিষ্ঠুর রেখাগুলি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! অবিশ্বাস্যরকম কোমল হয়ে উঠেছে ডাক্তারের মুখ। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মন্‌স্টারের মুখে মানবিক স্ফুরণ। নিজে খাব কী। ডাক্তারের মুখে কোন অদৃশ্য জাদুদণ্ডের স্পর্শ লেগেছে, তাই খুঁজছি। শুধু কোমল নয়। তৃপ্তিতে, সুখে, নতুন সুষমায় ভরে উঠেছে ডাক্তারের মুখ।

লোকে বলে, বিশেষ করে গৃহিনীরা বলেন, 'খাওয়া দেখেও সুখ!' সে কোন্ খাওয়া। এমনি খাওয়া কি? বিস্ময়ের সঙ্গে খুশীর আমেজ দেখা গেল আমার মনে এ আবার কেমন খুশী, তা তো জানি নে। খেয়ে খুশী বরাবর। খাইয়ে খুশী তো হই নি কখনো।

কী বিচিত্র। আমার ছেলেবেলার বেচা এল ফিরে। আমার যৌবনে এল এই কুম্ভমেলার দিগন্তের হাটে, পাঁচ-বত্তির বেশে।

ছেলেবেলায় আমার পিঁপড়ের মত খুঁটিয়ে বেড়ানো সঞ্চয়। সেই সঞ্চয়ের ঐশ্বর্য দিয়ে একদিন ভয়ে দুঃখে, আশায় নিরাশায় খাইয়ে দিয়েছিলাম বেচাকে। নোটনের ডালপুরী, লালমোহনের সন্দেশ, লজেন্স, বাখরখানি। কত কি! সেই থেকে সন্ধি স্থাপন হয়েছিল। বেচার খাওয়ায় সুখ পেয়েছিলাম, তা নয়। বরং সঞ্চয়ের শূন্য থলিটা দেখে, লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। সন্ধি হয়েছিল চোখের জল দিয়ে। কিন্তু বেচার কথা তো ভুলি নি। ভুলি নি, 'আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেন তুই রোজ খাস?' দেখিয়ে দেখিয়ে কোনদিনই খাই নি। ওর দেখার মধ্যে ছিল আমার দেখানো।

দুটো প্লেট-ই সাবাড় করেছে ডাক্তার। করে ডাক্তার একটু বা অপ্রস্তুত যেন। তাকাতে পারছে না আমার দিকে। চা-ও শেষ।

দেখলাম, ডাক্তারের মোটা স্থূল ঠোঁটজোড়া ভিজে উঠেছে। এবড়ো-খেবড়ো মুখের চামড়া উঠেছে টান-টান হয়ে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সেলাই-বহুল মোটা জামা আর তালি-মারা প্যাণ্ট। একটা রীতিমত বলিষ্ঠ মানুষ। কিন্তু কী করুণ!

উঠে গেলাম ক্যাশিয়ারের কাছে। কুপন কিনে খাবার নিলাম। হিসাবের কড়ি পকেটে। টায়টিকে খরচের কড়ি। পথে বেরিয়েছি। এক পয়সা মা-বাপ। না থাকলে কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করবে না। দৈবজ্ঞ মরবে কাঁথা বয়ে।

তবুও। উপোস দেব একটি বেলা। ভাবছ, আবেগে হয়েছি অচৈতন্য। হবেও বা। কিন্তু মনের খুঁত-খুঁত রাখব কোথায়। হৃদয়জোড়া বিষকুম্ভ। মনে অশান্তি দিয়ে তাকে আরও ভরে দিই কেন। অমৃতকুম্ভের খোঁজ পাই নে এখনো। ছাড়ি কেন আত্মতৃপ্তিটুকু। চোখের উপর ভেসে ভেসে উঠছে খালি বলরামের মুখটি।

খাবার দেখে ডাক্তার আরও অপ্রস্তুত। অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল আমার দিকে। কি জানি, আমিই আবার রেগে গিয়েছি কি না, সেটুকুই তার সংশয়।

বললাম, 'খান।'

খাবারের দিকে দেখে ডাক্তার আবার তাকাল আমার দিকে। তারপর টেনে নিল একটা প্লেট। সে প্লেটখানিও শূন্য হল। দু প্লেট এনেছিলাম আবার।

বাকি প্লেটটি দেখিয়ে বললাম, 'ওটাও খেয়ে ফেলুন।'

এতক্ষণে মৌনব্রত ছাড়ল ডাক্তার। বলল, 'তুমি?'

'আমি চা খাব।'

ডাক্তার আমার দিকে তাকাল। সর্বনাশ। আবার খ্যাপামির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু খেপল না। খেলেও না। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে বার করল একটি ছোট কলকে। তেঁতুলেবিছের মত একটি চকচকে লাল গাঁজার কলকে। আবার এ পকেট ও পকেট করে বেরুল খানিকটা পাটের ফেঁসো আর নারকেলের ছোবড়া। কিন্তু আর কিছু নয়। বিরক্ত হয়ে সেগুলি পকেটে রেখে বলল, 'বিড়ি-টিড়ি আছে?'

বিড়ি তো নেই। পকেট থেকে বার করে দিলাম সিগারেট। বুঝলাম, ওই বস্তুটি তেমন মনঃপূত নয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'পেট ভরেছে আপনার?'

ডাক্তার বলল, 'পেট আবার কখনো ভরে? না ভরেছে কোন দিন কারুর? কী করে ভরবে?'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ডাক্তার বলল, 'কালকে যাও বা পেল্লাদের দিদিমা দিত দুটো খেতে, সে তো তুমি পেল্লাদ এসে ঘোচালে।'

বললাম, 'আমি?'

'তবে কে?'

'কি রকম?'

ডাক্তার আবার প্রায় স্বমূর্তিতে দেখা দিল। বলল, 'ওই যে, বুড়ির মন কেড়ে মেজাজ খারাপ করে দিলে। কিপটে বুড়ি। বুড়িগুলো সব কিপটে। ওরকম ষোলটা বুড়িকে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছি দেশ থেকে। তখন বলে, কত কথা। সব বেটি পাঁচুগোপালের ঘাড় বেয়ে সগগে যাওয়ার

তালে আছে। যাওয়াব খন। ভেবেছে, প্রয়াগে এসে সব সগ্‌গ ধরে ফেলে দিয়েছে। আবার ফিরতে হবে না?'

বললাম, 'আপনি নিয়ে এসেছেন নাকি?'

'তবে? কে নিয়ে আসবে? পাঁচুগোপাল ছাড়া আর সব জানে কে? নিয়ে এসেছি, নিজের জানাশোনা আশ্রমে ক্যাম্প খুঁজে দিয়েছি।'

বলে ডাক্তার আমাকেই যেন আসামী করে ধমকে উঠল, 'এমনি নিয়ে এসেছি, অ্যাঁ? এমনি নাকি বল? সবাই কণ্টাক্‌ট করে এসেছে, দু-বেলা খেতে দেবে আর রাত্রে শুতে দেবে পালা করে! তা দু-বেলা ঠিকমত খেতে দেওয়া দূরে থাক, রাত্রে একটু শুতে পর্যন্ত দিচ্ছে না।'

মনটা বিস্মিত ব্যথায় চমকে উঠল। দু-বেলা দুটো খাওয়া, আর একটু আশ্রয়ও যে ডাক্তারের কপালে নেই, এতটা তো অনুমান করতে পারি নি। মনে পড়ে গেল, কাল রাত্রে শীতার্ত ডাক্তারের ক্যাম্পে প্রবেশ। সেই 'নো জায়গা, নট কিচ্ছু।' ডাক্তার! পেশা ও বিশেষণের কি বিড়ম্বনা। রহস্যাচ্ছন্ন ব্যাপার। এই পাঁচুগোপাল রায় ডাক্তার হল কী করে?

ডাক্তার আপন মনে বলেই চলল, 'এই বুড়িগুলো একটাও সগ্‌গে যাবে? একি গাড়ির টিকিট কেটে আর ভিড় ঠেলে মরতে মরতে যাওয়া যে সগ্‌গে গিয়ে পৌঁছুবে। তিন সত্যি করে এল সব আর এখানে এসে আমাকে চিনতেই পারে না। দিব্যি নিজেরা খাচ্ছে-দাচ্ছে, সাধুদর্শন করে বেড়াচ্ছে। ভগবান না, সং দেখতে এসেছে সব। দেখো তুমি, সবগুলো নরকে যাবে।'

কী করে দেখব, তা তো জানি নে। ডাক্তারের অবস্থাটাই খালি ভাববার চেষ্টা করছি। কিন্তু ডাক্তার থামে না—'ওই পেল্লাদের দিদিমার জন্য ক্যাম্পে বলে রেখেছি। এলাহাবাদ ইস্টিশান থেকে নিয়ে এলাম। পথে বললে, 'পাঁচু, আজ আমার কাছেই খাবি থাকবি।' কিন্তু একবার ডাকলে! যখন নিজেরা খেলে? ক্যাম্পের বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

লজ্জায় ও ব্যথায় এতটুকু হয়ে গেলাম। আমিও তখন খাচ্ছিলাম। আমিই কালকের রাত্রিটা ডাক্তারকে উপোস রেখেছি। নিরাশ্রয় করেছি।

তাই ডাক্তার খেপে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি বললাম, 'সত্যি, কালকে রাত্রের ব্যাপারটা আমার খুব...'

'তুমি?' ডাক্তার আবার ধমকে উঠল আমাকে। 'তুমি কী করবে? ওসবে আমার আর বাজে নাকি? তাই ভেবেছ তুমি? আরে ছোঃ। অত সস্তা কলজে পাঁচ-বষ্যির নয়, বুঝেছ? দশ-দশ বছর সাধু হয়ে সারা দেশ ঘুরেছি। সারাটা দেশ।'

বলে হাতের বুড়ো আঙল দুটি দেখিয়ে বলল, 'সব নখদর্পণে আছে। যতরকম সাধু আর যতরকম মানুষ। জিজ্ঞেস কর, বলে দেব।'

'আপনি সাধু হয়েছিলেন?'

'তব বে?'

'কেন?'

'কেন আবার? বার করে নিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘর-বার সমান করে দিলে। জোর করে নিয়ে গেল টেনে।'

'কে?'

'কে আবার? যার নেওয়ার। জ্বালা, প্রাণের জ্বালা।'

'ছেড়ে দিলেন কেন?'

'ছাড়াছাড়ির কী আছে? কিছুই ধরি নি, তার ছাড়ব কী। কপনি এঁটেছিলাম, ফেলে দিয়েছি। আছি, যেমন ছিলাম তেমনি। জ্বালা টানে, জ্বালাই নিয়ে আসে। জ্বালা কখনো ছাড়ে?'

বলে ডাক্তার সোজাসুজি তাকাল চোখের দিকে। তাকিয়ে দেখি ডাক্তারের চোখের মণি নেই। অন্ধকার দুটি গর্ত শুধু। কোথায় হারিয়ে গিয়েছে চোখের মণি দুটি। অন্ধ গহ্বরে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার চমকানি। স্থূল ঠোঁট দুটি ছুঁচলো হয়ে উঠেছে। বিকৃত গলায় বলল, 'বল, জ্বালা কখনো ছাড়ে?'

জবাব চায় ডাক্তার। কী জবাব দেব। জ্বালা ছাড়ে কি-না জানি নে। কিন্তু ওই মুখের দিকে তাকিয়ে বলি কেমন করে যে ছাড়ে।

ডাক্তার আবার মুখ খুলল। তখনো কে জানত, অজান্তে এক কুলুপ

ছিদ্রে সুড়ুত করে ঘুরিয়ে দিয়েছি চাবি। ধাক্কা দিয়েছি বহুদিনের মরচে-পড়া বন্ধ দরজায়। ডাক্তার বলল, 'কোথায় না গিয়েছি। অসময়ে একলা একলা বরফ ভেঙে ছুটে গেছি হিমালয়ের উপরে। মানুষখেকো জন্তু পালিয়ে গেছে, তবু আমি থামি নি। ভীতু কাপুরুষ সাধু পুরুত দরজা খোলে নি মন্দিরের। মরণের ভয়ে। খেতে দেবার ভয়ে। বয়ে গেছে। জীবন মরণ ক্ষুধা তৃষ্ণা, সব জ্বালা-জ্বালা হয়ে গেছে। আমাকে রুখবে কে? কিন্তু প্রাণ জুড়োল? জ্বালা জুড়োল?'

ডাকলাম, 'ডাক্তারবাবু।'

'ডাক্তারবাবু?' আবার সেই ভয়ঙ্কর মুখ। 'আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে? আমি ডাক্তারবাবু? জড়ি বুটি ছাড়ি, জড়িবুটি। রাস্তায় ফেরি করি। দাদ কাউরের মলম তৈরি করে বেচি। নিয়ে দেখ, সারে কি-না। মাদুলি? তাও দিই। তা বলে ডাক্তার?'

সর্বনাশ। আবার সেই মূর্তি। এখন কি আর মনে আছে পাঁচ-বদ্যির, ডাক্তার পরিচয় সে নিজেই দিয়েছে। বলতে গেলে উলটো উৎপত্তি হবে। যাক, বলে যাক। চায়ের আসর জমজমাট। বেশী গণ্ডগোল হলে ভিড় বাড়বে। আগেই টের পেয়েছিলাম, ডাক্তার নামের মধ্যে আছে পাঁচুগোপালের বিড়ম্বনা। বুঝলাম, নির্মম বিদ্রূপ মাত্র। খ্যাপার প্রতি শ্লেষ। পাঁচ-বদ্যি আর ডাক্তার পাঁচুগোপাল রায়। ওই নামে নিজেকেও বিদ্রূপ করে সে। করে যে, তাও বোধ করি নিজে সঠিক জানে না। কিসের জ্বালা, সেটুকু জানার বড় ইচ্ছা হল।

ডাকলাম, 'পাঁচুগোপালবাবু।'

ডাক্তার তাকাল। অবাক কাণ্ড! সে হাসছে নাকি। এও কি বিশ্বাসযোগ্য? বিকশিত তার বড় বড় দন্তরাজি। যদি হাসি হয়, তবে কী ভয়ঙ্কর হাসি। বলল, 'মিষ্টি কথা বলা হচ্ছে। দিব্যি ওলটানো চুল, ঠাণ্ডা চোখ, ভালো মানুষটির মত দেখতে। ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। খুব জানি তোমাদের মত ছোঁড়াদের।'

আমাকেই বলছে। কিন্তু বাধা আর দিচ্ছি নে। তা হলেই ডাক্তারের ক্ষিপ্ততা দেখা দেবে।

গলার স্বর নেমে এল ডাক্তারের। বলল, ‘ওই যে একটি কেটে পড়ল টেবিল ছেড়ে। দিব্যি টানা-টানা চোখ, টিকলো নাক, সুন্দর মুখ। কেমন শান্ত মেয়েটি।’

বুঝতে দেরি হল না, টেবিল-সঙ্গিনী সেই মহিলাটির কথা বলছে ডাক্তার। কিন্তু বেচারী সত্যি ভাল মানুষ। আমি তো তাই দেখেছিলাম। বললাম, ‘না, সে মহিলাটিকে তো—’

‘সব করতে পারে।’ বাধা দিয়ে বলে উঠল ডাক্তার।—‘ওসব ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক। আমার চেয়ে বেশী জানো তুমি?’

তা হয়তো জানি নে। কিন্তু একটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আছে তো।

ডাক্তার বলল, ‘বিশ্বাস হল না বুঝি?’ বলে পকেট থেকে বার করল একটা ময়লা কাগজ। এত ময়লা, কুঞ্চিত চামড়ার মত হয়ে গিয়েছে। অতি সন্তর্পণে সেই কাগজের ভাঁজ খুলতে চকচক করে উঠল একটি ফটো। একটি মেয়ের ফটো। ফটোটি আমার সামনে মেলে ধরে বলল ডাক্তার, ‘দেখ তো কেমন?’

সুন্দর, সত্যি সুন্দর! টানা-টানা শান্ত চোখ। সু-উচ্চ নাক। কপালের উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া চুলের গোছা। বয়স অনুমান করা শক্ত। তবে, তরুণ বয়স, সন্দেহ নেই।

‘কেমন?’

বললাম, ‘সুন্দর।’

‘হুঁ হুঁ, বিষ। ভয়ানক বিষ, সুন্দর বিষ।’

মনে বড় কুণ্ঠা এল। তবু জিজ্ঞেস করলাম, ‘কে ইনি?’

শুনতে পেল না ডাক্তার। ভয়ানক বিষ, সুন্দর বিষের দিকেই সব ভুলে তাকিয়ে ছিল সে। গর্তে-ঢোকা কালো চোখে তার বিগলিত দৃষ্টি। খাওয়ার সময় যেমন কোমল হয়ে উঠেছিল তার মুখ, এখন এই মুহূর্তে তার চেয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে সেই মুখের শ্রী।

পরমুহূর্তেই ফটোটা কাগজে মুড়ে পকেটে ঢুকিয়ে দিল। বলল, ‘কে, জিজ্ঞেস করছিলে? আমার বউ ওকে জন্ম দিয়ে মরেছিল।’

'আপনার মেয়ে ?'

বুঝলাম, 'আমার মেয়ে' কথাটি উচ্চারণ করতে নারাজ সে।

চারিদিকে কথা, হাসি ও চীৎকার। ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি আর মোটরের গর্জন। সব মিলিয়ে একাকার। তার মধ্যে পাঁচুগোপালের চাপা মোটা গলা অদ্ভুত মিষ্টি শোনাল। যেন ক্লারিওনেটের খাদের স্বরে বেজে চলেছে বিচিত্র রাগিণী।

সে বলল, 'ওই যে ফটোটি দেখলে, বললে বিশ্বাস করবে না, ওই ফটোর মেয়ের চেয়েও তার মা ছিল আরও সুন্দর। এই পাঁচুগোপাল, প্রাণগোপাল রায়ের ছেলে বসে আছে তোমার কাছে। চেয়ে দেখো, আমি কি কুৎসিত। চেহারা দেখে মানুষ আমার কাছে আসে না। তবু, সে আমাকে ভালবাসত। এত ভালবাসত যে, আমিই এক-এক সময় ভাবনায় পড়ে যেতাম। আমার খেতে বসতে শুতে তারও ভাবনার অন্ত ছিল না। ওই মেয়ে জন্ম দিয়ে সে মরে গেল। ভালবাসার কদর বুঝতে না বুঝতে সে চলে গেল। অন্ধ আর বোবার মত আমি দিবানিশি হাতড়ে ফিরেছি, খুঁজেছি। মনে হত, কেউ ষড়যন্ত্র করে তাকে লুকিয়ে রেখেছে আমার কাছ থেকে।...মানুষের খ্যাপামি কতদিন থাকে ? ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাঁথায় শুয়ে কাঁদছে সে আমারই মেয়ের বেশে। প্রথমে বড় রাগ ছিল মেয়েটার উপর। পাড়ার মেয়েরাই দেখত ওকে। তা ছাড়া কে বাঁচাবে। দিনে দিনে সেই মেয়ের চোখ ফুটল, নাক ফুটল, হাসি ফুটল। মায়ের মতই। নাম হল শিউলি। শেফালির মতই সুন্দর নরম আর মিষ্টি। নজর যখন দিলাম, আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। কাজ করতাম কারখানায়। মন বসত না। কখন বাড়ি আসব, শিউলিকে বুকে নেব, সেই আমার ভাবনা। আমার ধ্যান জ্ঞান, আমার প্রেম ভালবাসা, আমার স্বর্গ, আমার ভগবান, আমার সব। আদেখলের ঘটি হলে যা হয়। কুঁড়েঘরে রাজকন্যের সাজপোশাক খাওয়া। সবাই হাসত আর ঠাট্টা করত।...বড় হল, বুলি ফুটল। কী মিষ্টি কথা। প্রাণ ধরে ইস্কুলে দিলাম। দিনে দিনে বড় হল। আমার ধুলোভরা রোদপড়া বাগানে ফুল ফুটল, ছায়া হল,

পাখি ডাকল।···লুকিয়ে শুনতাম, মেয়েকে দেখে লোকে বলত, হ্যাঁ পাঁচুগোপালের মেয়ে। কত আমার ভাবনা। অনেক লেখাপড়া শেখাব, গান শেখাব। কত কী।'

বলে একটু থামল। আর আমি ভাবছিলাম এমন অভাবিত সুন্দর কথার বিন্যাসও বেরোয় তার মুখ থেকে? গলার স্বরটা আরও নেমে এল তার।— 'সতরো বছর বয়স হল। মেয়ের ভরা যৌবন। কিন্তু কী শান্ত। তার মায়ের মত। আমি ছিলাম তার বাপের চেয়েও বড়, তার একলার সঙ্গী, তার বন্ধু। বিয়ের কথা হলে কতদিন বুকে মুখ রেখে বলেছে, 'বাবা তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

এই পর্যন্ত বলে আচমকা ব্রেক কষার মত পাঁচুগোপালের কথা থামল। তাকিয়ে দেখি, সারাটা মুখ কুঁচকে, বিকৃত হয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। যেমন আচমকা থেমেছিল, তেমনি হঠাৎ বলল, 'মিছে কথা। একেবারে শয়তান। সুন্দরের মধ্যে বিষ। চলে গেল। না বলে, না জানিয়ে পালিয়ে গেল একটা ছেলের সঙ্গে। পাড়ারই ছেলে।'

এ পর্যন্ত বলতেই নাটকীয়ভাবে যবনিকা পড়ল। চলন্ত অন্নপূর্ণার আর্দালি টেবিল ওঠাতে এল। লক্ষ্য করি নি, কখন আসর ভেঙে গিয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে রেকর্ড। পথের রেস্তোরাঁ গিয়েছে উঠে। উঠে পড়লাম। পাঁচুগোপালের সঙ্গে চললাম পুলের দিকে। বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে কথা মনে নেই। তাকিয়ে ছিলাম ডাক্তারের দিকে।

বোধ হয় তার কথা ফুরিয়েছিল। আর কিছু বলবার দরকারও ছিল না। কিভাবে পাঁচুগোপালের জীবন আজ এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, কেন সে সাধু হয়েছিল, তার কারণ ব্যাখ্যারও আর প্রয়োজন ছিল না। দরকার নেই আর বলার, কেন তার এত হাঁকাহাঁকি, কথার খেই হারানো, পাগলামি আর সুন্দর ছেলেমেয়ে দেখলেই একটা তিক্ত সন্দেহে ও যন্ত্রণায় জ্বলে ওঠা।

জ্বালার কথা তো নিজেই বলেছে সে। ঘরে বাইরে, অসীম সমুদ্র আর বিরাট হিমালয়, কোথাও তার জ্বালার নিরসন হয় নি। সব মিলে সে আজ অস্বাভাবিক, অবাস্তব রূপ ধরেছে।

পুল পেরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল সে। সাপের মত এঁকেবেঁকে দাগ পড়েছে চ্যাটালো পাড়ে। কলকল শব্দ। পাঁচুগোপাল এসে দাঁড়াল। যেন পরশমণির সন্ধানী খ্যাপা এসে দাঁড়াল।

বললাম, 'পাঁচুগোপালবাবু, আপনার মেয়ে কোথায় ?'

বলল, 'তা জানলে কি আর ভাবনা ছিল ? ভাবি, এ কেমন যাওয়া ? একটু কি খোঁজও দিতে নেই ? দশ বছর বাইরে ঘুরে এসেও খোঁজ পাই নি।'

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। অজান্তে একটি নিশ্বাস পড়ল আমার। আর নয়। এবার আশ্রয়ের সন্ধান না করলে আর নয়।

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।......

চলে যাওয়ার আগে সেই কথাটিই বার বার মনে পড়ছিল। জীবনভর এই খোঁজার পালা পাঁচুগোপালের শেষ হবে কি-না জানি নে।

খুব উত্তেজনার পর মানুষ যখন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, অনেকক্ষণ কাঁদার পর শোকাতুর যেমন নীরব ও বিহ্বল হয়ে পড়ে, পাঁচুগোপাল তেমনি শান্ত হয়ে গিয়েছে।

মুখ ফিরিয়ে বিদায় নিতে গেলাম। পাঁচুগোপাল আচমকা প্রশ্ন করে বসল, 'কী করা হয় ?'

কী যে করি, সে জবাব দেওয়া বড় মুশকিল। যা করি, সে কাজটি ভাল কি মন্দ, দশজনের বিচার্য। কিন্তু বলতে গেলেই সঙ্কোচ হয়। বিশেষ পাঁচুগোপালের কাছে। সাত-পাঁচ ভেবে তবু সত্যি কথাই বললাম।

বললাম, 'লিখি।'

পাঁচুগোপাল অবাক হল ! জিজ্ঞেস করল, 'কী লেখ ? বই ?'

পাঁচুগোপালের বিস্ময় দেখে একেবারে এতটুকু হয়ে গেলাম। কেন, বই লেখাটা কি পাপ ? বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কী বই লেখা হয় ? এমনি সব জ্ঞান-ট্যানের বই, না গপ্পো-নভেল ?'

বুঝলাম, জ্ঞান-ট্যানের বই বললেই বোধহয় খুশী হয় সে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, পাঁচুগোপালের কাছ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করি নি।

বললাম, 'হ্যাঁ, গপ্পো আর নভেলই লিখি।'

পাঁচুগোপাল বলল, 'তা বুঝেছি! মাথার উপর রোজগেরে বাপ আছে নিশ্চয়ই?'

'কেন বলুন তো?'

'তা নইলে চলে কী করে?'

জবাব দিতে পারলাম না। চলে কি না চলে, সে বিষয়ে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করে লাভ কি। বললাম, 'কেন, বাংলাদেশের লেখকদের কি চলে না?'

পাঁচুগোপাল বলল, 'কই, আমাদের কেষ্টকান্ত তো বাপের পয়সাতেই বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে খায় আর কাঁড়ি কাঁড়ি বই লেখে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেষ্টকান্ত কে?'

'আমাদের পাড়ার ছেলে।'

বললাম, 'তা হবে। তবে, আমার বাবা মারা গেছেন।'

পাঁচুগোপাল আরও বিস্মিত হয়ে বলল, 'তোমার মাথায় তো বাউরি-কাটা চুলও নেই দেখছি।'

বললাম, 'কেন?'

'আমাদের কেষ্টকান্ত তো তাই বলে। বই লিখলে নাকি মাথায় বাউরি রাখতে হয়, চশমা পরতে হয়, উড়নি চাপাতে হয়।'

পাঁচুগোপালের মুখের দিকে নজর করে দেখলাম। না, ঠাট্টা নয় কথাগুলি সে সরল বিশ্বাসেই বলছে।

জানি নে কে কেষ্টকান্ত। তার রচিত সাহিত্য পড়ার সৌভাগ্যও আমার হয় নি। বললাম, 'সকলের তো একরকম নয়। আপনাদের কেষ্টকান্ত হয়তো ওই রকমটিই পছন্দ করেন।'

পাঁচুগোপাল একটি দীর্ঘ হুঁ দিল। মানে যার অনেক কিছুই হতে পারে। আবার বলল, 'আর এ লাইনে কতদিন?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন লাইনে?'

বললাম, 'এই তীর্থ ঘুরে বেড়ানো?'

বললাম, 'এই প্রথম।'

ঘাড় নেড়ে বললে পাঁচুগোপাল, 'সেইজন্যই। সেজন্যই রাত করে একলা বেরুনো হয়েছিল।'

'বেরুলে কী হয় ?

'কী আর হবে ! ঘাড়টি মটকে বালুতে পুঁতে রেখে দেবে।'

পুঁতে রেখে দেবে। অপরাধ ? বললাম, 'কে ? কেন রাখবে ?'

পাঁচুগোপাল দ্বিতীয় বার হাসল। বলল, 'যার দরকার সে-ই রাখবে। পকেটে নিশ্চই কিছু রেস্তোও আছে !'

রেস্তো মানে পয়সা। তা কিছু তো আছেই। তা বলে সে পয়সার জন্য একেবারে ঘাড় মটকানো !

পাঁচুগোপাল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'মনে রেখো এই কয়েক মাইলের মধ্যে সব জায়গায় ওত পেতে আছে সব ভয়ঙ্কর মানুষ। অনেকে সাধুর বেশেও আছে। সুযোগ পেলেই তারা কখনো ছাড়বে না। আর সাধুদের কাছে রাত্রে কখনো ভিড়ো না।'

বললাম, 'কই, কাল রাত্রে.তো সেরকম কিছু—

'টের পাও নি। রোজ রাত্রেই কি আর এমনি হয়। তা ছাড়া আমি ছিলাম কাল তোমার পেছনে পেছনে। আর-একটা কথা বলি। অনেক পেতনি আছে এখানে, তারাও ছেড়ে কথা কইবে না।'

পেতনি ! পাঁচুগোপাল যে মনের মধ্যে রীতিমত একটা ভয় ধরিয়ে দিল। বললাম, 'পেতনি ! সেটা আবার কী ?'

পাঁচুগোপাল মুখ বিকৃত করে বলল, 'সেটা দেখলেই চোখ ভুলে যাবে। আড়ে আড়ে চাইবে, ফিক-ফিক করে হাসবে আর মনে হবে হাতছানি দিয়ে বুকের কাছে ডাকছে, বুঝেছ ? খুব সাবধান।'

বলে মুখ ফিরিয়ে বলল আপন মনে, 'কত দেখলাম এরকম। এই গেল-বারের হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় তিনজনকে এরকম খুন হতে দেখেছি। তারা সবাই তোমার মত ভদ্দরঘরের ছেলে।'

ভয়টা প্রায় চেপে বসল মনে। বক্তব্য অনুযায়ী পাঁচুগোপাল এ বিষয়ে

আমার চেয়ে অভিজ্ঞ নিঃসন্দেহে। তার কথা একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারি নে। বললাম, 'কিন্তু এই তীর্থক্ষেত্রে?'

সে বলল, 'এইখানেই তো সহজ। তীর্থক্ষেত্তর বলে তো আর কারুর আসতে মানা নেই। দেখতে চাও? অনেক কিছু দেখতে পাবে। দেখিয়ে দেব তোমাকে। মাল-টাল টানা হয়?'

মাল? মানে মদ। বললাম, 'না। কেন?'

'সে সব বন্দোবস্তও আছে। এখানে সব পাবে। বে-আইনী চোলাই-করা মদ এখানে খুব আসে।'

এতক্ষণে মনে হল পাঁচুগোপাল যে দিকটা ইঙ্গিত করতে চাইছে, সেদিকে আমার ভয় নেই। কিন্তু তার কথা শুনে আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলাম।

এই দুস্তর মেলাভূমি। চারিদিকে গিজগিজ করছে সাধু-সন্ন্যাসী আর পুণ্যার্থী নরনারীর দল। এই উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে কোথায় থাকতে পারে সেই বেসাতির আস্তানা? জানি নে কোথায় থাকতে পারে! তবে থাকাটা অসম্ভব বলে বোধ হয় না। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।

যাবার আগে পাঁচুগোপালকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বলতে পারেন, এখানে বাঙালীদের আস্তানা আর কোথায় আছে?'

পাঁচুগোপাল বলল, 'সব জায়গায় আছে, কেন?'

বললাম, 'আমাকে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে তো।'

'কেন? তুমি ওই ক্যাম্পে থাকবে না?'

বললাম, 'কী করে থাকব বলুন? বলেছিলাম, একটা রাতের জন্য থাকব। আজকে আমাকে নতুন জায়গা দেখে নিতে হবে।'

পাঁচুগোপাল বিস্মিত ব্যাকুল চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বললে, 'ও, এতক্ষণ ধরে মনে মনে এই সব মতলব ভাঁজা হচ্ছিল। চলে যাবে বলে বুঝি এত কথা বলছিলে আমার সঙ্গে?'

হঠাৎ করুণ হয়ে উঠল পাঁচুগোপালের মুখ। এখনো বুঝতে পারলুম না তাকে। বুঝতে পারলুম না মানুষটির সঠিক ধাত। এই একরকম, তার পরেই আর এক রকম। কালকে এই মানুষই আমাকে তাড়াবার জন্য কত করেছে।

সেকথা এখন মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। ভেবেছিলাম, পাঁচুগোপালের অপমানের শোধ তুলব। কিন্তু যার উপর শোধ তুলব, তার শোধবোধ কোনটারই বালাই নেই। সে চলে নিজের হৃদয়াবেগে। হৃদয়াবেগে চলা মানুষের সুখের চেয়ে দুঃখ বেশী। সে দুঃখ কেউ রোধ করতে পারে না। কিন্তু নিজে সে সেই দুঃখের বিষয়ে সচেতন নয়। আসলে পাঁচুগোপাল আমাকে কাল অপমান করে নি। ওটাও তার হৃদয়াবেগেরই একটা ঘটনা মাত্র।

পাঁচুগোপাল বলল, বলল খুবই ঠাণ্ডা গলায়, 'ওখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে?'

বললাম, 'দেয় নি। তা ছাড়া প্রহ্লাদবাবুদের ক্যাম্পটাও তো আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

পাঁচুগোপাল ঈষৎ চটল। বলল, 'তোমার মাথা। যেখানে উঠেছ, কপালগুণে উঠে পড়েছ। একবার যখন বুড়ি তোমাকে ঠাঁই দিয়েছে, তখন আর ফেরাবে না। তাড়াতাড়ি গিয়ে বুড়ির হাতে খোরাকির পয়সাটা গুঁজে দাও তো। তোফা খাবে আর বেড়াবে। নইলে মরবে।'

বলে আপন মনে বলল ফিসফিস করে, 'এ লাইনে পয়লা হাতেখড়ি কি না, তাই এখনো সব ফালতু কথা নিয়ে—'

তবু ভাবছিলাম। শীতের বেলা। দেখতে দেখতে বেলা অনেকখানি বেড়ে উঠেছে! বেলা বাড়ছে আমার। মেলার কোন বেলা নাই। মেলার কলরব ও চীৎকার, যাওয়া-আসার আর শেষ নাই। ভাবছিলাম প্রাণভরে দুদিন ঘুরব। কত ঘোরা আমার এখনো বাকি। কত কিছু বাকি। কিন্তু ওই ক্যাম্পে থেকে আমার মনের সুখটুকু, শান্তিটুকু যাবে না তো।

কী ভেবে পাচুগোপাল দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। বলল, 'দ্যাখ, একটা কথা বলব?' গলায় আবার তার সেই খ্যাপামির আভাস। বললাম, 'বলুন।'

গলা আর-একটু চড়িয়ে বলল, 'তোমার মত দেখতে ওরকম ছেলে ভাল হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি যদি চলে যাও, তাহলে সত্যি বলছি, মনে বড় দুঃখু পাব। এই, এই বলে দিলাম।'

বলে যেমন দ্রুত ঘুরেছিল, তেমনি দ্রুত মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল সে। দাঁড়িয়ে বোধ হয় উৎকর্ণ হয়ে রইল।

ব্যাপারটি এমনই হাস্যকর। কিন্তু হাসতে গিয়ে পারলাম না হাসতে। হাসিটা ছুটে আসতে গিয়ে খচ করে আটকে রইল বুকের মাঝে।

ওই ভঙ্গিতে তাকে এখন যে দেখবে, সে-ই হাসবে। তাই তো হয়। পাঁচুগোপাল তার দুঃখ দিয়ে পরকে হাসায়। ওটাই পাগলের বিড়ম্বনা। মানুষ জ্বলেপুড়ে পাগল হয়। আমরা পাগল দেখে হাসি। বিশ্বের নিয়মটাই এমনি বিচিত্র।

সেই বিচিত্রের মতই, পাঁচুগোপালের বিচিত্র মনের গতি কখন এক সময়ে আমার দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বোধ হয় বন্ধুত্ব পেতেছে। পেতেছে মন। ভালবেসেছে। হৃদয়াবেগের গতিই এমনি।

আসলে বোধ হয়, আমাদের মত ছেলেমেয়েদেরই সে ভালবাসে সবচেয়ে বেশী। কে জানত, পাঁচুগোপালের মত মানুষের সঙ্গে এখানে দেখা হবে। কে জানত, গলা চড়িয়ে সে আবার বলবে, 'তুমি চলে গেলে দুঃখু পাব।' বলে ছেলেমানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকবে মুখ ঘুরিয়ে। যে অমনি করে বলে, তাকে ছেড়ে গেলে মনের মধ্যে অশান্তি হবে।

বললাম, 'তাহলে চলুন, যাওয়া যাক।'

পাঁচুগোপাল মুখ ফেরাল না। আড়চোখে দেখল। দেখে ধীরে ধীরে হাঁটা ধরল।

একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম। নিল না। বলল, 'ওতে কিছু হয় না। দেও তো, দু-আনা পয়সা দেও, একটু নেশা করি।'

বুঝলাম, গাঁজা কেনা হবে। কিন্তু এখানে কোথায় পাওয়া যাবে? দু-আনা পয়সা দিলাম তাকে।

এদিক ওদিক দেখে, পাঁচুগোপাল একটি সাধুকে দেখে ডাকল, 'হোই বাবা।'

সাধু দাঁড়াল। ভিড়ের ঠেলাঠেলি। বেচারী বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া বেটা?'

পাঁচুগোপাল বলল, 'থোড়া ইধার কৃপা কর বাবা।'

সাধু এল। পাঁচুগোপাল পয়সা দু-আনা তাকে দিয়ে বলল, 'থোড়া সপ্তমী কৃপা কর বাবা। অব শহর যানা বহুত মুশকিল।'

সাধু একবার সংশয়ান্বিত নজরে তাকাল আমার দিকে। আমি ভাবছিলাম সপ্তমীটা আবার কী বস্তু।

সাধু জিজ্ঞেস করল পাঁচুগোপালকে, 'কৌনা জমাত ?'

পাঁচুগোপাল জবাব দিল, 'অব ঘর কি জমাত বাবা। ঢুরতেঁ হ্যায় গুরু। পহলি গুরুকো ছোড় দিয়া।'

সাধু জিভ দিয়ে করুণা ও আক্ষেপসূচক ধ্বনি করে বলল, 'বিষ্ণু ব্রহ্মচারীকে আশ্রমমে ভেট কর বাবা। গুরু মিল যায়েগা।'

বলে পয়সা দু-আনা নিল। ঝুলি হাতড়ে বের করে দিল ছোট্ট একটি পুরিয়া। তারপর নমস্কার করে চলে গেল আবার।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সপ্তমীটা কী ?'

পাঁচুগোপাল বলল, 'মহাদেবের ধূমপান। যার নাম গাঁজা। অনেক সাধুদের মধ্যে গাঁজাকে ওই নামে ডাকা হয়।'

বলে পাঁচুগোপাল বিকৃত মুখে বলল, 'হুঁ, এবার গুরু ধরব ওর বিষ্ণু ব্রহ্মচারির আশ্রমে। বলে, কত হাতি গেল তল, মশা বলে কত জল। ভাগ ভাগ।'

ব্যাপারটি সব বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করব ভাবলাম। পাঁচুগোপাল তখন গাঁজা তৈয়ারীতে মনোযোগ দিয়েছে।

প্রায় পনরো মিনিট হেঁটে আবার সেই ক্যাম্পে এসে হাজির হলাম। রান্না, খাওয়া, মাইকের মর্মোপদেশ, সব মিলিয়ে আশ্রম একেবারে জমজমাট।

প্রহ্লাদ কোত্থেকে ছুটে এসে বলল, 'ও বাবা, তোমরা বেড়ে ডুবে ডুবে জল খাও, শিবের বাবাও টের পায় না। আর আমি শালা মুখ চোকাচ্ছি তখন থেকে। খুব তুমি যা হোক ডাক্তার খুড়ো।'

প্রহ্লাদের কথাটা ঠিক অনুমান করতে পারলাম না। ডুবে জল খাওয়ার

মত পাপ তো কিছু করি নি। যা করেছি, তা বিশ্বসংসারের মত শিবের বাবাও জানেন বৈ কি।

পাঁচুগোপাল ধমকে উঠল,: 'মাকড়া কোথাকার। কাকে কী বলছিস। ছেলেটা আমাকে দু-আনা দিল, তাই দিয়েই তো'—বলে পাঁচুগোপাল মুঠো খুলে দেখিয়ে দিল পরমবস্তুটি।

প্রহ্লাদ আনন্দে পেল্লাদ হয়ে উঠল। বলল, 'মাইরি! ওর চলে না বুঝি? তাই বল? আমি যে এদিকে হেঁপ্সে মরছি কাকা তোমার জন্যে।'

পাঁচুগোপাল হাত পেতে বললে, 'কই, দেখি, আগে আসল চীজটি বার কর দিকি নি।'

বলতে না বলতে প্রহ্লাদ কয়েক আনা পয়সা তুলে দিল পাঁচুগোপালের হাতে। পয়সাগুলি পকেটে রেখে পাঁচুগোপাল বললে, 'চলে আয় আমার সঙ্গে।'

প্রহ্লাদের আনন্দ আর ধরে না। পাঁচুগোপালের পেছনে পেছনে চলল ঘাড় উঁচিয়ে। বুঝলাম, ওদের দুজনেরই এখন আর অন্য কিছুর ভাববার সময় নেই। আমি তো দূরের কথা। ফিরেও তাকাল না। ওতেই আনন্দ। মুঠোয় আছে প্রাণের সার। আর কিছু চাই নে।

কিম্ আশ্চর্যম্! নেশা নয়, পাঁচুগোপালের কথাই ভাবছি। ভাবতে গিয়ে হাসিও পেল। হাসি নয়, হাসির নামান্তর। নিজের কথা ভেবে কাউকে করুণা করতেও লজ্জা পাই। হাসিটা দুঃখের।

সবাই আমরা মনের মত বস্তুটি খুঁজছি মনে মনে। মনে মনে খ্যাপা আমরা সবাই। আমাদের রকমারি বিচিত্র বেশ। পাঁচুগোপাল গাঁজা নিয়ে মাতামাতি করছে যেন ওই ছাড়া আর কাম্য ধন নেই। কখন দেখব, সব ফেলে চেঁচামেচি হাঁকডাক করে একলাই মাথায় করে তুলছে সারা কুম্ভমেলা। কিন্তু সবটাই উপরের জিনিস। মনটা কে দেখে।

হেসে ফিরতে গিয়ে দেখি কালকের সেই গেরুয়াধারী। পাঁচুগোপাল যাকে সঙ্গে করে এনেছিল। মন চমকালো। ফাঁড়া কেটেছে কি-না কে জানে! পাঁচুগোপাল তো ঠেকিয়ে দিয়ে গেল।

গেরুয়াধারী বলল, 'হাসছেন যে?'

বললাম, 'পাঁচুগোপালের কথা ভেবে।'

গেরুয়াধারী হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে ওর আলাপ হয়ে গেছে নাকি?'

বললাম, 'একরকম।'

গেরুয়াধারী হাসল রহস্যের হাসি। বলল, 'একরকম তো বটে। কি রকম সেটা বলুন।'

বলে চোখাচোখি হতেই হেসে উঠল সরবে। নিজেই বলল আবার, 'থাক, আপনাকে বলতে হবে না। আন্দাজই করা যাচ্ছে। ও আমাদের কাশীর আশ্রমে নাগাড় তিন বছর ছিল এক সময়ে। তখন সাধু হয়েছিল। জ্বালিয়ে খেয়েছে আমাদের সবাইকে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন বলুন তো?'

সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও তো পাগল। বদ্ধ পাগল। আমাদের মোহান্তকেই মারতে গেছল। কোন কোন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু গুহ্য কর্তব্য করণীয় আছে তো। সেগুলো ও সহ্য করতে পারত না। সাধুদের উপরও ও খুব চটা জানেন তো?'

হবে হয়তো। কিন্তু সেরকম কোন কথা শুনি নি তার মুখে। কোন জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইলাম পাঁচুগোপালের চলার পথের দিকে। সত্যি, বদ্ধ পাগলই বটে।

গেরুয়াধারী বলে উঠল, 'অবশ্য কালকে ওর কথাতেই আপনার কাছে আমাকে আসতে হয়েছিল। যা-ই হোক, ওগুলো আমাদের কর্তব্য তো!'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'তা তো বটেই।'

সে আবার বলল, 'তা ছাড়া, আশ্রমে আপনাদের সুবিধা অসুবিধার দিকে আমার নজর রাখাও কর্তব্য। অর্থাৎ duty। আমি একধারে এ আশ্রমের হিসাবী, অর্থাৎ মুহুরী। আর একধারে কোতোয়াল। বলতে পারেন ম্যানেজার।'

শুনে কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের আবার এসবও আছে নাকি?'

'নেই ?' ভ্রূ তুলে বলল, 'কি নেই বলুন। একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে যা যা দরকার, আমাদের সবই আছে। সব পাবেন এখানে। যা চাইবেন। অফিস চালাতে হলে অফিসার চাই, ম্যানেজার চাই, কেরানী চাই। সংসার চালাতে নিয়মের দরকার নেই ? দরকার নেই নিষ্ঠার ? আশ্রমেরও তেমনি নিয়ম আছে বৈ কি। বিশেষ, বাইরে যখন আমরা জমায়েত হই। মোহান্তের নীচে আছে পূজারী, কুঠারী, কারবারী, হিসাবী, কোতোয়াল, ভাণ্ডারী, পাহারাদার, তুরীবাদক। কত কি! নইলে কি মনে করেছেন, এত বড় ব্যাপারটা আপনি আপনি হচ্ছে ?'

তা তো নয়-ই। কিন্তু এতসব জানতাম না। বাংলাদেশের কোন কোন আশ্রমে আধুনিক নিয়ম-কানুনের ব্যবস্থার কথা শুনেছি। কারণ ধর্মের গণ্ডি ছেড়ে সেখানে তাদের গতি সমাজের বুকে। কিন্তু সন্ন্যাসীর আবার এত নিয়ম-কানুন কিসের। এ যে জমিদারী সেরেস্তা চালানোর ব্যাপার।

সন্ন্যাসী ব্যাখ্যা করে চলল কার কি কাজ। ভাণ্ডারী দেখবে ভাণ্ডার, পাহারাদার দেবে পাহারা। মনে হচ্ছে বুঝি, এখানে কোথায় কি ঘটছে কেউ জানে না। সব নখদর্পণে আছে। পাহারাদার নজর রেখেছে কড়া। একটু এদিক ওদিক হলে ধরবে এসে চেপে। খোয়া যাবার উপায় নেই কিছু। টাকাপয়সা ? সব জমা আছে কারবারীর কাছে। কারবারী হল আশ্রমের ক্যাশিয়ার। টাকা দিচ্ছে নিচ্ছে, হিসাব রাখছে মুহুরী। একটি আধলা এদিক ওদিক হওয়ার যো নেই। মায় গাঁজা-সুখার হিসেবটি পর্যন্ত। হাতে নিয়ে ডললাম, হাঁক দিলাম আর কলকে ফুঁকলাম, তা নয়। যে যা পাচ্ছ, আগে জমা দাও। তারপর নিজের পাওনাটি নিয়ে ভোগ কর। তুমিও শিব, আমিও শিব। তাহলে আর কি! এস সবাই মিলে ন্যাংটা হয়ে নাচি। উঁহু! সেটি চলবে না। আইন মেনে চলতে হবে সবাইকে। সন্ন্যাসী তো সকলেই। যে আইন দেখে আর আইন মানে। পূজারী হয়েছ। সময়মত নিয়মমত পুজো কর আগে। হ্যাঁ, অন্যায় অপরাধ আছে বৈ কি। বিচার হয়। সবাই মিলে যে পঞ্চায়েত তৈরী হয়েছে, সেই পঞ্চায়েত বিচার করে। বিচারকর্তা মোহান্ত বলতে পার। ওখানে বড় একটা কারুর হাত চলে না। বিচারে সাজা হয়।

কতরকম সাজা আছে। জেল ফাঁসি দড়ি কেন? সন্ন্যাসীর সাজা তার চেয়েও কঠিন। সকলে বুঝবে না। সাজা মানলে ভাল। নইলে বহিষ্কার। সন্ন্যাসী-জীবনের দফা গয়া। বেরিয়ে গেলে তো সে মরে গেল। মৃতের সমান। তার কাজের দায় আর নিচ্ছে কে? অধিকার? সমানাধিকার? ওই কথাটা নিয়েই দেশে আজকাল বড় বাদানুবাদ, হ্যাঁ, তাই তো। যার যেমন, তার তেমন। গুণ বুঝে কদর। কাজ বুঝে দাম। আমি নারকেল গাছ। উঁচু হয়ে মাথা তুলেছি আকাশে। ফল দিই ডাব আর নারকেল। সে এক রস। ঝাপা ঝোপা ছোট্ট আমগাছটি দেয় আম। নিংড়ে খাও। সে আর-এক রস। যারটি যেমন, তারটি তেমন বলব। পেয়ারাকে জামরুল বলে খেলে তুমি-ই ঠকবে। কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে আর ছাই মেখে জটা নেড়ে সবার উপর তম্বি করে করে বেড়াবে, সেটি হচ্ছে না। তার কোন অধিকার নেই। সমান অসমান, কোনটাই নয়।

বলে কি, এ তো দেখছি সংসারের কথা। সমাজের কথা। এই থেকেই আসে রাষ্ট্রের কথা। বললাম, 'আপনাদের আবার এত নিয়ম-কানুন কিসের? ওসব তো আমাদের। সাধারণ মানুষের।'

নিয়ম-কানুন থাকবে না কেন। বিশ্বের নিয়ম-কানুন আছে। দিন হয়, রাত্রি হয়, ঋতু বদলায়? সবই সেই নিয়মের মধ্যে। মাস গেলে রোজগারটি করতে হলে, মুখে ভাত গুঁজে ছুটতে হয় না অফিসে? সকাল হলে ঝাঁপ খুলতে হয় না দোকানের? খালি অ্যালাকাড়ি বুঝি ভগবান পাওয়ার বেলায়? সেখানে আইন-কানুন নেই বুঝি? ওটা হল ফোকোটিয়া, না? তা হবে না।

কিন্তু আমরা তো জানি সিদ্ধপুরুষেরা ভাব-ভোলা। সময়-জ্ঞান-রহিত। কখন কী করেন আর কখন কী বলেন, অন্য মানুষের বোঝবার উপায় নেই।

সন্ন্যাসী হাসল। হেসে বলল, 'সিদ্ধপুরুষ? সে কজনা? এই যে দেখছেন, এত বড় কুম্ভমেলা আর দেশের তাবৎ সাধু সন্ন্যাসী যোগী, এর মধ্যে কার সিদ্ধিলাভ হয়েছে, কে বলতে পারে। যার হয়েছে তাকে কে চিনতে পারবে? সে যে কী বেশে, কী রূপে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে

বলবে ? তার নিয়ম নেই ? তার নিয়মের যে চাড়া নেই। এই বাহ্যিক জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ কতটুকু ? নিয়ম তার অন্য লোকে, অন্যখানে। সে নিয়মের সুতো-কাঠি কে দেখতে পাবে ? তার যে চলতে নিয়ম, নিয়ম খেতে-বসতে।'

বলতে বলতে দিব্যি হাসিমুখে সন্ন্যাসী গম্ভীর হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি আর স্বাভাবিক রয়েছে বলে মনে হল না। হাত জোড় করে আপন মনেই বলে চলল, 'যেখানেই থাক, এখানে তাকে আসতে হবে। মাঘ মাসের প্রয়াগ ছেড়ে তার কোথাও যাবার উপায় নেই। কিন্তু কে চিনতে পারবে। যে মোহান্তের সঙ্গে বছরের পর বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি, হয়তো উনিই সেই মানুষ। দত্তাত্রয়ের পাদুকা-পূজারী হয়তো ছদ্মবেশে ঘুরছে আমারই সঙ্গে সঙ্গে। কে জানে ! কে জানে—'

বলে আমার দিকে চেয়ে এবার অদ্ভুত হেসে বলল, 'এমনি প্যাণ্ট পরে আর অলেস্টার গায়ে দিয়ে তিনি হয়তো দিব্যি ভদ্রলোক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কী করে জানব !'

আজ ভোরবেলা অবধূতের মুখেও যেন এমনিধারা কথাই শুনেছি। সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক—ভগবান কখন কোন বেশে তার সামনে দিয়ে চলে যাবে। খ্যাপা খুঁজে খুঁজে কখন পরশ পাথরটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবে নদীর জলে। এমনি একটি বিশ্বাস যেন এদের সকলের মনে রয়েছে। সেই বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে একটি বিচিত্র আবেগ ও ভক্তি। তাই, ওই কথাটি বলতে গেলেই ভক্তি ও বিশ্বাসের আবেগে সে হঠাৎ অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। এখানে আমার বক্তব্য ও মন্তব্য, দুই-ই নিষ্প্রয়োজন।

সন্ন্যাসী নিজেই আবার পরিষ্কার গলায় বলল, 'যাক, ওসব কথা পরে এক সময় হবে। আজ বিকেলে রামজীদাসী আসছেন। কোথাও যাবেন না যেন।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কে ?'

'সে কি, রামজীদাসীর কথা শোনেন নি ? তিনি একজন সাধিকা। আমাদের মাইকে তো অনেকবার বলা হচ্ছে আজ সেকথা। তিনি রোজ

রোজ এক একটি আশ্রমে ঘুরে বেড়াবেন। খবর পাঠিয়েছেন, আজ এখানে আসবেন। তিনি হিমাচল প্রদেশের মেয়ে। এলে বুঝতে পারবেন সব। যান, আপনার আর দেরি করব না, অনেক বেলা হল।'

বলে যাবার উদ্যোগ করে ফিরে দাঁড়াল আবার। বলল, 'আপনার তাঁবু চিনতে পারবেন তো?'

পারব না কেন? তাঁবুর সারির দিকে ফিরে তাকালাম। সর্বনাশ! তাই তো! সবই একরকম দেখতে, আর একেবারে গায়ে গায়ে। বেরিয়েছিলাম রাত্রি থাকতে। কোনখান থেকে বেরিয়েছিলাম, মনে থাকার কথা নয়। তা ছাড়া, এমনিতে বোঝা মুশকিল। সেই রেল কলোনির ব্লকের মত। না চিনে খালি পরের বাড়ি উঁকিঝুঁকি। নির্দোষকে শুনতে হয় কটূক্তি।

আমার বিভ্রান্তি দেখে গেরুয়াধারী হাসল। গেরুয়াধারী নয়, কোতোয়ালই বলা যাক। বলল, 'কেমন, ঠিক ধরেছি তো? অবশ্য দু-একদিন গেলে ঠিক চিনতে পারবেন। তবে প্রথম প্রথম বড় অসুবিধা হয় নিজেই বুঝি। তবে তার দরকার হবে না। ওই যে তাঁবুটা দেখছেন, একটি বুড়ি বসে আছে, তার ডানদিকের তাঁবুটা আপনাদের। দেখবেন, খড়িমাটি দিয়ে হিন্দিতে লেখা আছে, বারো নম্বর।'

হেসে ফেললাম।—'সত্যি, আপনি না বললে ভারি বিপদে পড়তাম। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব।

'করুন।'

'আপনি কি বাঙালী?'

কোতোয়াল হাসল। হাসিটি সব সময়েই একটু অর্থবোধক। বলল, 'ওটা কি খুব বড় কথা? তবে হ্যাঁ, আমি বাঙালী। জন্মেছিলাম বাংলাদেশেই। দেখুন, মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই, আর অন্ত নেই জবাবের। আমি হয়তো আপনাকে সব কথার জবাব-ই দিতে পারব না।'

বলে হেসে চলে গেল কোতোয়াল। অদ্ভুত ভদ্র তো লোকটি! প্রশ্ন না করার অভিপ্রায়টি জানিয়ে গেল হাসতে হাসতে।

ওদিকে মঞ্চের উপর মোহন্ত। তার পাশে বসে গায়ক ধরেছে গান। গলা মিলিয়েছে তানপুরার সঙ্গে। একটি করে গান হয়। গানের শেষে মোহন্ত উপদেশ দান করেন, ধর্মের কথা শোনান।

ভিড়ও হয়েছে কম নয়। অধিকাংশই এই আশ্রমের নরনারী নয়। যেখানে হোক ছুটে ছুটে এসে বসেছে সবাই। কোথাও বসে কিছুক্ষণ ধর্মের গীত ও কথা শোনা নিয়ে কথা। এর মধ্যেই চলেছে দেখছি নানান গল্পগুজব। সামনেই দাঁড়িয়ে হেসে হেসে জটলা করছে জনা পাঁচ-ছয় পাঞ্জাবী মহিলা। পায়জামা পাঞ্জাবি আর ওড়নার রঙে রূপে একগোছা ফুলের মত রয়েছেন ফুটে। কিসের কথা, বুঝি নে। হাসিতে বাজছে শত নূপুরের রিনিঝিনি। তাই দেখে কয়েক জন মহিলা রয়েছেন চোখ বাঁকিয়ে। ভাবখানা, হাসতে হয় বাইরে গিয়ে হাসো, এখানে কেন?

কয়েক বিঘা জুড়ে আশ্রমের পরিধি। কতগুলি অপোগণ্ড দিব্যি চালিয়েছে ছুটে ছুটে খেলা। ধরাধরি আর পাকড়াপাকড়ি। তাদের হঠাৎ-হাসির ঝলকে চমকে তুলছে আশ্রমের গুরু-গম্ভীর জমায়েত ও পরিবেশ। এদিকে বাতাসে ভাসছে ঘিয়ের গন্ধ। তারই সঙ্গে সঙ্গে যেন বাংলা রান্নার ফোড়নের পরিচিত গন্ধটিও নাকে এসে লাগছে।

তাঁবুর সামনে এসেও ভাবনা। আধাআধি বখরা। কোনদিকেরটি? বোধহয় বাঁদিকেরটিই। সামনে পর্দার মত ক্যাম্বিসের ঢাকনা। তুলে হয়তো দেখব অন্য লোক।

তুলে দেখলাম, সত্যি তাই। হাঁটু মুড়ে বসে একটি ছোট মেয়ে। বোধহয় বাঙালী।

ফ্রকের নীচে গাছকোমর করে বাঁধা রঙীন তাঁতের শাড়ি। ঘাড়ের কাছে ঝুলছে বাসি বিনুনি। কিছু একটা গালে পুরে, গাল ফুলিয়ে দিব্যি চিবুচ্ছে আর মাথা নেড়ে নেড়ে গুনগুন করছে। এক মুহূর্তের ব্যাপার। নজরটা তীক্ষ্ণ করলাম। সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে মনে হল। আর মনে হওয়া! মনে হতে না হতেই মেয়েটি অস্ফুট চীৎকারে একবারে লাফ দিয়ে উঠল।

তড়িঘড়ি করে খুলল গাছকোমর। বাঁধা আচল খুলেই মাথার উপর টেনে একেবারে কলাবউ! কোল থেকে ছড়িয়ে পড়ল এক রাশ টোপা টোপা বিলিতি কুল।

ছি ছি ছি, আমারই ভুল। বালিকা যে আমাদের পেল্লাদের পরিবার। লজ্জার চেয়ে হাসি পেল বেশী। তার চেয়ে বেশী বিস্ময়। এক ফোঁটা মেয়ের সর্বাঙ্গে এত লজ্জা এল কোত্থেকে। অন্য দেশের মেয়ে কেন, আজ নিজের দেশের এমনি মেয়েরাই তো এ বয়সে বই-শ্লেট নিয়ে দিদিমণির দ্বারস্থ হয়। অবশ্য পুতুলরূপী পুত্রকন্যাদের বিয়ের ভাবনায় এখন থেকেই ভাবী শাশুড়ী হওয়ার মকশ করা হয়। দিব্যি মাথার পরে বউ দিয়ে, অর্থাৎ ঘোমটা টেনে বউ-বউ খেলাও হয়।

কিন্তু এ যে সত্যি বউ। মাথায় উঠল কুল খাওয়া। পরপুরুষের সামনে এ যে রীতিমত লজ্জাবতী বাঙালী বধূ। কালকেও দেখেছি। কিন্তু শাড়ির আড়ালে প্রহ্লাদের পরিবারটি এত ছোট, তা অনুমান করতে পারি নি। শত হলেও পরস্ত্রী। ইচ্ছে হলেও কি করে বলি, খুকি, কুল কটা খেয়ে নাও। খুকি বলা দূরের কথা, তুমি করে বলাটাই সমীচীন কি-না বুঝতে পারছি নে।

কিন্তু বেচারা এমন জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিছু না বলাটাও ঠিক নয়। আহা, ছড়ানো টোপা কুলগুলিও বালিকার আঁচলহারা হয়ে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

না, অত আর অগ্রপশ্চাৎ ভাবা চলে না। বললাম, 'কুল কটা কুড়িয়ে নাও।'

বলার অপেক্ষা মাত্র। অমনি ছোট্ট হাত বাড়িয়ে টুক-টুক করে আঁচলজাত করল কুলগুলি। করেও আবার দাঁড়িয়ে রইল তেমনি।

বললাম, 'এবার খাও। আমি ততক্ষণ জামাকাপড় ছাড়ি।'

বলে ওভারকোটটা খুলতে গিয়ে দেখি বালিকা ঘোমটার আড়াল থেকে দিব্যি পিট-পিট করে দেখছে আমার দিকে। বোধহয় যাচাই করা হচ্ছে আমাকে। চোখাচোখি হতেই আবার আড়াল হল মুখ।

মনে মনে ভারি হাসি পেল। ওভারকোট ছেড়ে জামা খুলবার উদ্যোগ করছি। ভাবছি, প্রয়োজনীয় দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করব কি-না একে। ভাবতে ভাবতেই এক অভাবিত ব্যাপার।

প্রহ্লাদের পরিবার ফরফর করে বাইরের পর্দার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ঘোমটার আড়াল থেকেই ঝাঁজমিশ্রিত বালিকা-কণ্ঠ ভেসে এল, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল? দিমা আসুক, দেখাবে 'খনি।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে একেবারে অদৃশ্য। বিস্ময়ে আমি জিভটা কামড়ে ফেললাম কি-না, সেটুকুও মনে নেই। এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। জামা খোলার উদ্যোগ করে যেমন দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে রইলাম তেমনি। আমাকেই বলল তো! রীতিমত শাসন! শাসন নয়, ঝগড়া ঘোষণা করে গেল। আর আমি কোথায় ভাবছি, ঘোমটা-ঢাকা এক লজ্জাবতী বালিকা মাত্র। কুলের শোকে কেঁদে না ফেলে। সে যে এমনি ধারা মুখঝামটা দিতে পারে, কে জানত!

বাইরে মাইকে ব্যাখ্যা হচ্ছে মাণ্ডুক্যোপনিষদ্। আর আমি একলা এই তাঁবু-কোটরে পাগলের মত হেসে উঠলাম। কুম্ভমেলায় এমনি এক বাঙালী গিন্নিও যে আছে, তা কি কেউ জানে।

একটু পরেই দেখি যে, আবার এসে হাজির। ঘোমটার আড়াল আছে ঠিক তেমনি। এসে ছোট্ট একটি তেলের শিশি রাখল আমার সামনে। রেখে বসল গিয়ে আবার নিজের জায়গায়। যেখানে বসেছিল আগে। বসে আবার ঘোমটার আড়াল থেকে শাসানির স্বর শোনা গেল, 'তাড়াতাড়ি নেয়ে এসো। দিমা বলে দিয়েছে। নইলে দেখবে 'খনি।'

সত্যি আর দেখাদেখির দরকার নেই। কিন্তু তেল মাখব কী করে? তীর্থক্ষেত্রে তো আবার তেল সাবাং মাখা বারণ। বললাম, 'তেল দিলে কে? দিদিমা?

এক মুহূর্ত চুপ। তারপর একটু চাপা গলা শোনা গেল, 'না। আমিই এনেছি। চটপট নাও। নইলে দিমা আমার মুণ্ডুপাত করবে।'

লুকিয়ে তেল এনেছে! এতখানি দয়া ও সুবুদ্ধিও তার হয়েছে! প্রহ্লাদের

পরিবার দেখছি শুধু কাঁচা নয়। হৃদয়টি তার রীতিমত কাঁচা-মিঠের স্বাদে অপূর্ব। এর পর বালিকা বলে অবজ্ঞা করব, তেমন সাহস আমার নেই।

নির্দেশমাত্র খালি গায়ে বসে গেলাম তেল মাখতে। জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমা কী করছে ?'

বালিকার মেজাজটি সব সময়েই যেন চড়ে আছে। বলল, 'কী আবার করবে, রান্না করছে। তোমাদের মত তো নয় যে, খালি টো-টো করে বেড়াবে।'

বলার পরই কটাস করে একটি শব্দ উঠল ঘোমটার মধ্যে। বুঝলাম, একটি ডাঁশা কুলে কামড় পড়ল।

কিন্তু এত ভর্ৎসনা কেন ? বকুনিটা প্রহ্লাদকে নয় তো ! মুখ দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু বুঝতে পারছি, বালগিন্নির চোখে মুখে কথা। জবাব দিতে গেলে এঁটে ওঠা দায় হবে। শত হলেও ওই দিমার নাতবউ তো।

কিন্তু সত্য কোন্‌টি ? ওই ঘোমটা না খর-কণ্ঠের ধমকানি। বোধ হয় উভয়ই। তা হোক, তবু শাসন আর ধমকানির রূপ কী বিচিত্র উপভোগ্য ! বিচিত্রের সন্ধানে ফিরি। ঘরের কানাচে চারাগাছের পাতায় পাতায় যে কত বিচিত্র, তা তাকিয়েও দেখি নে। দেখতে জানি নে, তাই দেখি নে।

একটু বা ভয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নামটি কি ?'

অমনি কুল-পোরা মুখের ফোলা গাল নিমেষে দেখা দিল একবার। দেখা দিল দুটি ডাগর চোখ। চোখে সেই বকুনির আভাস। ভাবখানা, বউ মানুষের আবার নামের দরকার কি ?

তারপরই ঘোমটার তল থেকে জবাব এল, 'কী আবার, ছিরিমোতি বেরজোবালা দেবী।' অর্থাৎ শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী। হোক বালিকা, তবু ব্রজবালা বলে তো আর ডাকতে পারি নে তাকে। মনে মনে হেসে বললাম, 'আচ্ছা, তোমাকে আমি না হয় বৌঠান বলেই ডাকব, কি বল ?'

'বৌঠান ?' বলে বিস্মিত গলার অস্ফুট একটি শব্দ শোনা গেল। তারপরে হাসি। ফিকফিক করে হাসতে হাসতে একেবারে খিলখিল হাসিতে তাঁবু-কুটির চমকে উঠল। বুঝলাম, কথাটি ভারি খুশী করেছে তাকে। হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল 'আচ্ছা, বোলো।'

ইতিমধ্যে ঘোমটা উঠে গিয়েছে মাথার মাঝখানে। পরমুহূর্তেই আবার অন্য ভাব। বেশ খানিকটা ঝুঁকে, চাপা গলায় চোখ বড় বড় করে বলল, 'এখেনে একটা ভীষণ কিপটে বুড়ি আছে, জানো। ঠিক পয়সা চাইবে তোমার কাছে। সক্কলের কাছে খেতে চায়। সব্বাই বলেছে, বুড়িটার অনেক পয়সা আছে। তুমি দিও না যেন।'

বললাম, 'তাই নাকি ? গম্ভীর হয়ে বললাম, 'কখখনো দেব না।'

ঘোমটাটি এবার ঘাড়ে নেমেছে। কিন্তু সেদিকে ব্রজবালার খেয়াল নেই। বোধহয়, এতক্ষণে সে একটি সঙ্গী পেয়েছে। কথা তার এখনো শেষ হয় নি। আবার তেমনি চাপা গলায় বলল, 'জানো, একটা খুব সোন্দর বউ এসেছে এখেনে। কী চোখ, কী মুখ! আমার চেয়েও মাথায় বড় বড় চুল। সেই বউটা না, কারুর সঙ্গে কথা বলে না। কেন জান ?'

থতিয়ে গেলাম প্রশ্ন শুনে। 'অ্যাঁ ? তা তো জানিনে।'

আমাকে অপ্রতিভ দেখে ব্রজবালার ঠোঁট দুটি করুণভাবে উলটে গেল। বলল, 'জান না তো। তার স্বামী নাকি দশ বচ্ছোর আগে সাধু হয়ে বেরিয়ে গেছে। সেইজন্যে দেওরের সঙ্গে এখেনে এসেছে। এখানে দেশের সব সাধু-টাধু আসে কি-না, তাই এসেছে। যদি খুঁজে পাওয়া যায় তাই।'

কে সেই নির্বাক সুন্দরী বউ তাকে দেখি নি, জানিও নে কিছু। 'তাই নাকি' ছাড়া ব্রজবালাকে কী বলতে পারি। রীতিমত সিরিয়স হয়ে বললাম, 'তাই নাকি ?'

ব্রজর ছোট্ট মুখে কী বিচিত্র ব্যথিত বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। বলল, 'হ্যাঁ গো। আমি দেখেছি যে! আচ্ছা, তোমাকে চুপি চুপি দেখিয়ে দেব 'খনি।'

চুপি চুপি সেই দেখাটা কতখানি বুদ্ধিমানের কাজ হবে জানি নে। আপাতত বলতে হল, 'আচ্ছা।'

কিন্তু ব্রজবালার কথা তখনো শেষ হয় নি। রামধনুর রঙের খেলা তার চোখে মুখে। এই একরকম। তারপরেই আর একরকম। আচমকা তার মুখে ফুটল এক দিশেহারা ভয়ের চিহ্ন। বলল, 'জানো, ওখানে বড় চোরের উপদ্দোরব।'

উপদ্দোরব নিশ্চয়ই উপদ্রব। ভাষাটাই একটা উপদ্রব বিশেষ। কিন্তু কী চুরি হল ব্রজবালার? আমার ভাবনার ফাঁকে ব্রজ আবার হেসে কুটিপাটি। বলল, 'জানো, আজ ভোর রাত্রে সবাই একটা চোরকে তাড়া করেছিল। মেয়েমানুষ চোর!'

মেয়েমানুষ চোর। কিম্ আশ্চর্যম্! এত গূঢ় সংবাদ ব্রজবালা কী করে সংগ্রহ করল। এ তো রীতিমত খবরের কাগজের রিপোর্টারের চেয়েও দুরূহ কাজ। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়েমানুষ কী করে জানা গেল?'

ব্রজ কুলের বীচিটিকে এবার মুখ থেকে মুক্তি দিল। বলল চোখ বড় করে, 'ওমা সব্বাই বলল। তা ছাড়া, সে যে আবার এসেছিল। দ্যাখো নি, পূর্বদিকেব বেড়া অনেকটা ভেঙে ফেলেছে। সেইখান দিয়ে সকালবেলা মাথা গলিয়েছিল। একজন দেখে ফেলল, তাই তো আবার পালিয়ে গেছে।' তারপর গলাটি আরও চেপে বলল ব্রজবালা, 'মেয়েমানুষটা নাকি খারাপ। ওকে ধরতে পারলে না—পুলিশে দিয়ে দেবে, বলেছে, হ্যাঁ।'

ডবল সিরিয়স হওয়া যায় কি-না জানি নে। আমি গলার স্বরটা অদ্ভুত রকম করে আবার বললাম, 'তাই নাকি?'

ব্রজ তার ছোট্ট সুন্দর মুখটি বেঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো!'

পরমুহূর্তেই ব্রজবালার চোখ দুটি চকিত আগুনের ঝিলিকে জ্বলে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ গো! সেই মেয়ে চোরটাকে আমি নিজের চোখে দেখিচি। খু-উ-ব সুন্দর। ধবধবে গায়ের রঙ। একজন নয়, ওরকম অনেক আছে। দিমা বলেছে, ওরা নাকি ছেলেও চুরি করে।'

চোখ কপালে তুলে বলতে হল আমাকে, 'সর্বনাশ!' তারপর বললাম, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, 'যাকগে, যার ছেলে নেবে তার ছেলে নেবে। তোমার তো ছেলে নেই।'

ওমা! ব্রজবালার ঠোঁট ফুলে উঠল অমনি ওই টোপা কুলের মত। পাকা বউটির মত টেনে দিল ঘোমটা। কি ভাগ্যি, মুখ ঢাকা পড়ে নি। দুশ্চিন্তা-ভরা ডাগর চোখ দুটি তুলে বলল 'তা বলে ভাবনা নেই বুঝি? তোমার দাদা বলছিল, ওকেও নাকি চুরি করে নিয়ে যেতে পারে।'

আমার দাদা! মানে পেল্লাদ? তা, ব্রজবালাকে যখন বৌঠান বলেছি, প্রহ্লাদ আমার দাদা বৈ কি! কিন্তু কী অকপট হৃদয় ব্রজর। কী অকুণ্ঠ বিশ্বাস! কী অপরূপ তার ভঙ্গি! কে বলবে, এ এক নাবালিকা বধূ। ভারি হাসি পেল। সাহস হল না হাসতে। তা হলে অনর্থ ঘটবে না!

সত্যিই, পেল্লাদ তো শুধু বর নয়, ও যে ছেলেও বটে! ব্রজর খেলাঘরের ছেলে, ব্রজর আঁচল-চাপা ছেলে, হৃদয়-জোড়া ছেলে। ব্রজর সংসারের একমাত্র ছেলে। হলই বা সে লিকলিকে কালো গঞ্জিকাসেবী। ব্রজবালার ছোট্ট বুকে ভাবনার অন্ত কোথায়।

কী বিচিত্র সংস্কার! আর ধন্য প্রহ্লাদের রসজ্ঞান। সে তার এ নাবালিকা প্রিয়াকে কী বলে এমন এক অসহায় ভাবনায় ফেলেছে।

বললাম, 'তোমার অত ভাবনা কিসের। আমি তো আছি।'

বুক ফুলিয়ে বলি নি। খালি গায়ে তৈলমর্দনে বুকটা এমনিতেই টান হয়েছিল একটু। কিন্তু ব্রজ বৌঠান তাতে ভরসা পেল বলে মনে হল না। এক মুহূর্ত দেখল আমাকে ঘাড় কাত করে। চোখে চাপা সংশয়। তারপর একটি টোপা কুলে কামড় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বে করেছ?'

হঠাৎ বিয়ের কথা? বললাম, 'কেন?'

ব্রজবালা বলল, 'আইবুড়ো ছেলেদের ভয়-ই তো বেশী, জানো না?'

জানি নে আবার! কিন্তু ব্রজও যে সেটুকু জানে, তা আবার আমি জানতাম না। দেখি যত, অবাক মানি তত। ব্রজর যৌবনের সোনার কুঁড়ির পাপড়ি এখনো দল মেলে নি। বহু সংসারের আগে পাছে চোরাবালি। তার রকমই বা কত। সংসারের বোঝা মাথায় নিয়ে, সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলেছে যে বাংলার চিরকালের মেয়েটি, সে মেয়েটি কিন্তু এর মধ্যেই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ব্রজবালার মধ্যে। ফুলফলহীন লকলকে লাউডগাটির মত। ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা তার ওই চরিত্রের মধ্যে। সংসারের ফুল আর ফল চাপা আছে ওই চরিত্রের মধ্যে। চরিত্রই তো রূপ। ওই রূপ-ই তো চরিত্র। হাঁড়ি-কড়া-ঘর-পুরুষ, খেত-খামার-মরাই-লক্ষ্মী, সব, সব আগলে সামলে চলার সংগ্রামী প্রবৃত্তি। ওইটিই তো আদিম প্রবৃত্তি।

ব্রজ বালিকা! তা আমি জানি। তবু, সংসারের সব ভালমন্দ বোঝার মধ্যে তার পাপ কোথায়? অকাল-পক্কতা? কিন্তু ওই দিয়ে তার সংসারের প্রথম পাঠ শুরু। দিদিমণির ক্লাশরুমে যে সে যেতে পারে নি, সে জাতির দুর্ভাগ্য। ব্রজর চেয়ে সরলা কে আছে। দিল্লী সেক্রেটারিয়েট থেকে ঘরামিপাড়ার পুরুষটি পর্যন্ত, ব্রজবালাদের না হলে যে সকলের সংসারের ভিত-ই বালি আর বালি। ভিত গাড়ার সেই বজ্র-আঁটুনি আঁটাল মাটি কোথায়।

ব্রজকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'বিয়ের কথা বলছ? সে কাজটি আমি অনেক আগেই সেরে রেখে দিয়েছি। ওই মেয়ে-চোর আমার কিছু করতে পারবে না।'

বলল, 'সত্যি বলছ?'

হেসে বললাম, 'মিছে মনে হল?'

ব্রজ গম্ভীর হয়ে বলল, 'বলা যায় না। আজকালকার ছেলেরা তো এ বয়সে বে করে না। তোমাকেও চোখে চোখে রাখা দরকার বাপু। কী জানি কী হয়। বলা তো যায় না।

ব্রজের শঙ্কাব্যাকুল চোখের দিকে তাকিয়ে হাসি আর বাধা মানতে চায় না। মনে মনে বলি, বটে! সেই ভাল। এই মেলা জুড়ে খু-উ-ব সোন্দর চোর-মেয়েরা রয়েছে ছেলে ধরার ফাঁদ পেতে। তার মাঝে, ব্রজর চোখে চোখে থাকার চেয়ে নিশ্চিন্ততা আর কী থাকতে পারে।

তবু বললাম, 'কেন, তোমরা বুঝি আজকালকার ছেলেমেয়ে নও?'

কোঁচড়ে তার অগুনতি কুল। আর-একটাতে কামড় বসিয়ে গম্ভীর বালিকা বলল, 'হলেই বা!' তারপর মুখের কুলটি গালে আটকে রেখেই বলল চাপা গলায়, 'তোমার দাদা তো ভাল মানুষ না। ব্যামোয় ভোগে, তবু নেশা-ভাঙ করে। যদি আর কিছু করে, তাই দিমা আগে থাকতেই বে দিয়ে দিয়েছে। পুরুষ মানুষ তো!'

পুরুষ মানুষ তো! ওই কলঙ্কটি আর আমাদের ঘুচল না। যেন, ওদিকে একটু মাথা বেড়ে উঠল। দেখা দিল গোঁফের রেখা, আর অমনি আমরা

উঠলাম মাথা ঝাড়া দিয়ে। দিবানিশি মন আনচান। গুমরে উঠছে বুকের মধ্যে, পরান যারে চায় তারে নাহি পায়। কোথা গেলে প্রাণসখি, দেখা দেও, সে পোড়া লয়নপথে। অচিরাৎ বাবা মা আর ঠাকমা দিমার দল বিস্মিত উৎকণ্ঠায় চমকিত। ওমা! ড্যাকরার যে মরণ ধরেছে গো। ড্যাকরা, অর্থাৎ হাতে পায়ে বেড়ে ওঠা ডাগর ছেলেকে ওটি স্নেহের গাল। মরণ ধরেছে কিসের। না, মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান। অমনি একটি ব্রজবালাকে এনে ঘুরিয়ে দিল সাত পাক। ওই-ই হল মরণ। ব্যস, ড্যাকরার সব জারিজুরি খতম। তখন ব্রজবালা একা-ই একশো।

কথাটা আজ আর নিছক সত্য না হোক, সত্য আংশিক। যুগে যুগে পালটাচ্ছে রূপ। কিন্তু মেয়েদের বেলা? সে তর্ক করব, কার সঙ্গে? প্রহ্লাদ অত বড় একটি প্রমাণ। ব্রজর কাছে হার মানা ছাড়া উপায় কী। তবু বললাম, 'তা সে আর কিছু করে না তো?'

দপ করে জ্বলে উঠল বালিকা ব্রজ। ওইটুকু মেয়ে। খসা ঘোমটা, দোলানো বেণী। ডাগর চোখে চমক কী! যেন ধ্বকধ্বকে আগুন। এক ফোঁটা নীল বিষের মত নাকচাবিটিও জ্বলে উঠল ঝিকিমিকি। কুল মুখে তুলতে ভুলে গেল। বলল, 'করুক না একবার, দেখি।'

ব্রজর মূর্তি কী! ভয় ধরে গেল আমারই। ওইটুকু মেয়ের এত আত্মসম্মান-বোধ! অনাচারে এত ঘৃণা! স্বাধিকার-জ্ঞান এতখানি।

মনে আমার হাসি বিস্ময়, দুই-ই। বললাম, 'যদি করে?'

যদি করে? ব্রজ তাকাল তেমনি করেই। অসহায় রাগে বেঁকে উঠল ঠোঁট। যেন টঙ্কার-দেওয়া ধনুকের ছিলা। আবার বলল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'ইস্। করুক তো!'

আমিও যেন খেলাচ্ছলেই বললাম আবার, 'তবু, যদি করে?'

ব্রজর চোখে রক্ত ছুটে এল। তার সারা মুখে চকিত আলোছায়ার ঝিলিমিলি। নিশ্বাস দ্রুত। গলার শিরা থেকে ঠোঁট কেঁপে উঠল থরথর করে। আচমকা যেন ফণা মেলল ফণিনী। বলল, 'তবে চলে যাব।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কোথায়?'

বলতে বলতেই দেখি, বালিকার দুই চোখে জলের ধারা। চাপা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যেখানে মন চায়, চোখ যায়, চলে যাব সেখানে। ঠিক, হ্যাঁ।'

আমি চকিত লজ্জায় ও ব্যথায় এতটুকু হয়ে গেলাম। ছি ছি ছি! মনে মনে হেসে খেলছিলাম। বালিকা ভেবে তার ছোট্ট হৃদয়টুকুর সঙ্গে পেতেছিলাম খেলাপাতি। কিন্তু, সে খেলা যে বালিকার এতখানি বাজবে, তা কে জানত। আবার বলি,

জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।

বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে আমার যুক্তি নেই। কিন্তু যে দেহলতায় ফোটে নি ফুল, তার হৃদিসায়রে ফুটেছে ভালবাসার পদ্ম। কে অস্বীকার করবে, বালিকা ভালবেসেছে। ওই প্রহ্লাদ প্রাণেশ্বর হয়েছে ব্রজর। তাই এত রাগ, এত ব্যথা, এত কান্না।

নিজেকে ধিক্কার দিয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'ওকি, তুমি কাঁদছ কেন? আমি এমনি বললাম। তাই কি কখনো হয়? অমন সুন্দর বউ।'

জল-ভরা চোখেই ব্রজ আমাকে দেখল একবার চকিতে, তারপর মুখ ফিরিয়ে মুছল চোখের জল। আমি হেসে আবার বললাম, 'এঃ, তুমি ভারি ছেলেমানুষ বৌঠান। তোমার মত বউকে কেউ ঠকাতে পারে?'

অমনি হাওয়া এল, মেঘ গেল। আকাশ নীল ঝকঝকে। ব্রজর আলোকিত মুখে মিটি-মিটি হাসি। লজ্জা পেয়েছে একটু।

মনটা তার অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললাম, 'তা কুম্ভমেলায় কেন এলে ছুটে?'

ব্রজ পরিষ্কার বলল, 'ওর জন্য।'

ওর জন্য, অর্থাৎ প্রহ্লাদের জন্য। বললাম, 'কেন?'

ব্রজ বলল, 'দিমা বললে।'

'কী বললে?'

ব্রজ একটু চুপ করে রইল। হাত দু-খানি এলিয়ে পড়েছে নিজের ছোট্ট কোলে। দুটি ছোট ছোট শাঁখায় সোনালি প্যাঁচ, পাতলা নোয়া আর চুড়ি।

আবার ঘোমটা দিয়েছে টেনে। টেনে দিতে বড় ভাল লাগে বোধহয়। বলল, 'কী আবার! বললে, এখেনে ত্রিপুন্নিতে নাইতে হবে, আর…'

ত্রিপুন্নি হল ত্রিবেণী। বললাম, 'আর ?'

'আর ওর যেন ব্যামো সেরে যায়। মতিগতি ভাল হয়। ওর যেন একশো বছর পরমায়ু হয়।'

কী গম্ভীর ব্রজবালা! কত গভীর তার কণ্ঠ, তার যত হাসি, তত রাগ। ততোধিক গাম্ভীর্য। ব্রজবালা বালিকা। আর সমাজ আমাদের অজস্র কুসংস্কারে ঠাসা। অভিলাষ ও অভিপ্রায় নিয়ে আমরা কখনো পড়ি বদ্ধ জলায়, যাই কখনো অন্ধকারে।

কিন্তু কোথায় বালিকা ব্রজবালা। দিমার কাছ থেকে জীবনের পাঠ নিয়ে যে কথা সে বলল, তাতে দেখি সে বালিকা নয়, যুবতী নয়, বৃদ্ধা নয়। ব্রজবেশিনী সেই মঙ্গলাচারিণী নারী। সুখে, দুঃখে, কামনা ও বাসনায় অতি সাধারণ ও অসাধারণ মানুষী। তার সেই আদিম বাসনা। সেখানে তো কুসংস্কার নেই। কবিগুরুর শেষ জন্মদিবসের উক্তি মনে পড়ছে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস আমি কোন দিন হারাই নি। সেই মানুষেরই এক বিচিত্র রূপ নিয়ে সামনে আমার ব্রজ।

ক্ষণিকের জন্য মন আমার আবেগে আপ্লুত। রূপমুগ্ধ হৃদয় বোবা হয়ে গেল। মানুষ খোঁজার ছলে খুঁজি মন। সেকথাটি মনে নেই। রূপসায়রে ডুবে দেখি, তলিয়ে গিয়েছি হৃদিকুম্ভে। ওইটি কি মন ?

এসেছিলাম অমৃতের সন্ধানে। তাঁবু-খুপরিতে পেলাম ব্রজবালাকে। বালিকা বধূ। মুখে তার পাকা কথা। আমার মনে কুসংস্কার নেই। নব্য-সংস্কারবাদী আমার শহুরে মনের নতুন-কাটা খালের জলে আর-এক জলের বন্যা এনে দিল সে তবু। এই পরম বিস্ময় ও খুশিটুকু আমার ঘরছাড়া মনের অনুভূতির থলিতে দিল সে ভরে। আমার পথের সঞ্চয় ও লাভের থলি।

হঠাৎ তাঁবুর পেছনে থেকেই শোনা গেল চেরা বংশধ্বনি, 'বেরজো, মুখপুড়ি গেলি কোথায়।'

বোঝা গেল, রান্নার স্থান তাঁবুর পেছনেই। একাধিক হাতা-খুন্তির

ঘটং ঘটং আসছে ভেসে। ব্রজ লাফ দিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'কী বলছ ?'

বলেই কুলে কামড়। বিলিতি কুল নামক বস্তুটি দেখছি তার ভারি প্রিয়।

জবাব এল সেই কণ্ঠে, 'তেলের শিশিটা কোথায় গেল ?'

চমকে উঠে ভীত চাপা গলায় বলল, 'ও মা গো!' বলেই গালে হাত। আমারও অবস্থা তথৈবচ। সারা দেহ আমার তৈলাক্ত। যদি আসে তা হলে আর লুকোবার উপায় নেই।

ব্রজ ভীত, কিন্তু ঠোঁটের পাশে তার চাপা হাসির ঝিলিমিলি। চেঁচিয়ে বলল, 'তেলের শিশি ? আমি তো জানি নে দিমা।'

বলেই চাপা গলায় ব্রজর কি হাসি। আমাকে বলল, 'শিগগির পালিয়ে যাও।' তাড়াতাড়ি গামছা খুলে দিলাম গায়ে। ব্রজ ছোঁ মেরে তুলে নিল তেলের শিশি। তার ছোট্ট দেহের চেয়ে অনেক বড় শাড়ির তলায় তা নিমেষে হল অন্তর্হিত। কোথায় তা সেই জানে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তার আবার একটু করুণা হল বোধহয়। সে বউ। নাত-বউ। তার হাসি-কান্না সব ছাড়িয়ে তবু সে বালিকা। খেলা তার যাবে কোথায়। আর আমার মত দেবরের সঙ্গে সে পাতিয়েছে খেলা। ছাড়ে কখনো। কাছে এসে চুপি চুপি বলল। তাও বলল অনেক কষ্টে। মুখ ভরতি যে কুল। বলল, 'আমার পিছু পিছু এস চলে। জলের কলটা দেখেছ তো? ঢুকে পড়বে আর আমি চলে যাব, অ্যাঁ?'

তাই হোক। চললাম ব্রজবালার পশ্চাতে।

আশ্রমপ্রাঙ্গণ শূন্য। বেলা হয়েছে অনেক। এবেলার মত অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। জলকলের ধারে এসে দেখি কল নেই। একরাশ মহিলার ভিড়। চাকের বুকে মৌমাছির মত। জলকল এখন নারীবাহিনীর এক্তিয়ারে। সুবোধ ছেলের মত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অন্যথায় ছুটতে হয় গঙ্গার ধারে।

ওদিকে দিদিমার গলা শোনা যাচ্ছে, 'এই তো এখেনেই ছিল শিশিটা। কি চোরের জায়গা বাপু। এরকম হলে তো গায়ের কাপড়ও চুরি করে নেবে

কখন। নিজের মনেই মাথা নেড়ে বললাম, তা কি করে সম্ভব! সে কাজটি তো একজনই পারত। গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করা যার অভ্যাস ছিল।

কিন্তু মনের রসিকতা রইল মনে। কানে এল, 'তুই জানিস বেরজো?'

ব্রজ ধরা পড়লেই আমিও পড়ব। ব্রজ বলল তেমনি ভালো মানুষটির মত, 'না তো! আচ্ছা আমি দেখছি খুঁজে।'

দিদিমা বলল, 'আর কোথায় দেখবি। আমার বড়ি কটা আর ভাজা হবে না। কী সব্বোনেশে জায়গা বাপু। পাপীগুলাদের পাপের ভয় নেই গো। এই তীথক্ষেত্তোর জায়গা, জাগ্রত ঠাকুরের ঠাঁই। তবে আমিও বলি, যে নিয়েছে······'সেই মুহূর্তেই শোনা গেল, 'পেয়েছি দিমা।'

'কোথায় পেলি লো?'

'এই উনুনের পেছনে।'

'কই, আমি তো দেখতে পেলুম না।'

তা পারবে কী করে। ব্রজবালা যে জাদু জানে। সে খবর তো রাখে না দিদিমা। কলের ধারের মহিলারাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। একটি বিশাল-বপু বিধবা তখন থেকেই বিষয়টিতে ফুট কাটছিল। এবার আর একজনকে সাক্ষী মেনে ঠোঁট উল্টে বলল, 'মাগীর গলা আছে বাঁজখাই। ওদিকে চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে। দেখলে তো, আশ্রমের তাবৎ বেটিদের চোর করে ছাড়লে বুড়ি।'

কিন্তু কেউ-ই সেই কথার জবাব দিল না। জল না হলে চলবে না। তাতেই ব্যস্ত সকলে। বোধহয় বিষয়টি নিয়ে ঘোঁট হবে অবসর সময়ে।

কিন্তু বিশাল-বপুধারিণী ছাড়বার পাত্র নয়। মুখের একটি বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, 'আমাকে একবার বললে হত। মুখ একেবারে থুড়ে দিতুম না।'

বলে একবার অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল ভিড়ের দিকে। উদ্দেশ্য বোধ-হয়, কথাগুলি তার কেউ শুনছে কি-না। অর্থাৎ গ্রাহ্য হল কি-না।

হ্যাঁ, একজন তাকিয়েছিল তার দিকে। একটি প্রৌঢ়া সধবা। তাকেই বলল, 'আচ্ছা তুমিই বল তো ভাই······'

গণ্ডগোল। একেবারে গণ্ডগোল। সধবা বলল, শান্ত কণ্ঠে 'কই

আপনাকে তো কিছু বলে নি। সত্যি, চোরের যা দৌরাত্ম্য। ওইটুকু তো বলবেই।'

আর যায় কোথায়। ক্ষেত্র পাওয়া গিয়েছে। বিশালবপুধারিণী গলা চড়াল, 'কি রকম! তেলের শিশি রইল ইয়ের গোড়ায়, আর আমাদের করবে শাপমন্যি। এ যে চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা গো।'

অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। এখানে কোন মধুসূদনই সালিসি করতে সাহস পাবে না। গঙ্গাতেই যেতে হবে দেখছি।

এমন সময় যুবতী-কণ্ঠ, 'কই, খনপিসী, তোমার ভাজা পড়েছে যে।'

'পড়েছে? বাব্বা বাব্বা।' বলেই বিশালবপু, অর্থাৎ খনপিসী, সম্ভবত খনা ঠাকরুন হুড়মুখ করে ঢুকল কলে। ধাক্কা খেল অনেকে। কিন্তু সবাই শুধু মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করেই ক্ষান্ত। বুঝলাম, খনপিসী আত্ম-পরিচয়ে ইতি-মধ্যেই আশ্রমে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সকলের চোখে মুখে সেটাই পরিস্ফুট।

দিদিমার হাতের রান্না মিষ্টি শুধু নয়। কুম্ভমেলার এই বালুচরে, বাঁধা-কপির পাতার সঙ্গে বড়ি দিয়ে যে এমন অবিস্মরণীয় নিরামিষ চচ্চড়ি জুটবে কপালে, তা কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি। রাত্রে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দিদিমা দেয় যত গঞ্জনা, তত নিরামিষ ব্যঞ্জনে ভরে ওঠে পাত। একেই বলে বোধহয়, ভগবান যখন দেয়, ছাপ্পর ফুঁড়ে দেয়। এমন খাওয়া তীর্থক্ষেত্রে। রাজী আছি বারো মাস পড়ে থাকতে এখানে।

কিন্তু প্রহ্লাদ ফেরে নি এখনো। সে-ই দিদিমার ভাবনা। ব্রজবালারও।

আহারের পর বিশ্রাম। বিশ্রাম আর নয়। গত দু-রাত্রির সমস্ত ক্লান্তি আমাকে এই দিনের বেলা একেবারে গ্রাস করে ফেলল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, জানি নে। জেগে দেখি, অন্ধকার। ঠাওর করে দেখলাম, কেউ নেই। মেলার চারিদিকের গণ্ডগোলের সঙ্গে আশ্রমের গীত কানে এল। পর্দা উঠিয়ে দেখি, আশ্রমপ্রাঙ্গণে জনসমুদ্র। নারী, পুরুষ ও

শিশুর মেলা। জ্বলে উঠেছে আলোর সারি। রঙে রঙে রঙের বান ডেকেছে চারিদিকে। হাসি কথা ও গানে মুখরিত দিগন্ত।

মনে হয়, কত কী না জানি দেখতে পেলাম না। কত কী না জানি হারালাম। তাড়াতাড়ি উঠে জামা-কাপড় বদলালাম। রাত্রির সেই শীত আবার খুলছে তার মুঠো-করা থাবা। আস্তে আস্তে নেমে আসছে এই বালুচরের উপর তার ভয়ঙ্কর আক্রমণ। এখন থেকেই দিচ্ছে হাড়ে কাঁপুনি।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ালাম। আশ্রমের গেটের সামনে দেখলাম এক আলোর ঝলক। সে আলো শুধু আলো নয়, নারীর রূপের আলো। পৃথিবীতে এত রূপও যে ছিল, তা জানতাম না।

কানের কাছে শুনলাম, কে যেন বলছে ফিসফিস করে, 'ওই যে, ওই রামজীদাসী আসছেন।'

'রটি গেল সেই বার্তা', কান থেকে কানে গেল ছড়িয়ে। এসেছে, রামজী-দাসী, ব্রহ্মচারিণী। শুধু কানে কানে নয়, বুঝি 'পশিল' মরমে মরমে। যারা জানে আর জানে না যারা, সকলেরি চোখে অপার বিস্ময় ও কৌতূহল।

দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়েই রইলাম। পলক পড়ল না চোখের। মনে রইল না সাড়।

স্বপন বাধা টুটি
বাহিরে এল ছুটি
অবাক আঁখি দুটি
হেরি তারে।

অবকাশ রইল না ভাববার, রূপ সে কেমন। মনের মাঝে গুনগুন করে উঠল শুধু আপনি আপনি,

যেন মঞ্জরী দীপশিখা
নীল অম্বরে রাখে ধরি।

অন্তহীন গুনগুনানি বেজে চলল মনের তলে চাপা বীণার তারে। চোখে দৃষ্টি আটকে ছিল নীল আকাশের গায়ে। আদিম রহস্যসন্ধানী মন বারবার দেখতে চেয়েছে, কী আছে ওই নীল আকাশের ওপারে। ভাবলাম, ভাবলাম

কল্পচারী মনে, 'মাথার পরে খুলে গেছে আকাশের ঐ সুনীল ঢাকনা।' চোখভরা শুধু মানুষের রূপ। মানুষ নয়, মানবী, নারী। এত রূপ! দেখি নি তো কোনদিন! একি ব্রহ্মচারিণীর রূপ!

শুনেছি আর পড়েছি, নারীরূপের তীব্র ছটা জ্বালিয়েছে সোনার সিংহাসন। ছারেখারে দিয়েছে রাজ্য। ধ্বসিয়ে দিয়েছে রাজধানী। প্রাণ নাশ করেছে লক্ষ লক্ষ প্রজার। বিদেশে কেন যাই। নিজের দেশে পদ্মিনীর কথা মনে নেই?

সে রূপ কি এমনি। সে রূপ কি এর চেয়েও বেশী। কে জানে। মর-জগতের রূপ-পাগল চোখ আমার। রূপ-ক্ষুধায় অম্লান আমার দুচোখের দীপ্তশিখা। কোতোয়াল বলছিল, হিমাচলের মেয়ে। ঠিকই! এ তো সূর্যচ্ছটাদীপ্ত বরফশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ।

রূপের বর্ণনা আর দেব না খুঁটিয়ে। কৌতূহলটা প্রকাশ না করে পারব না। এ কেমন ব্রহ্মচারিণী। প্রাচীন মলমলের মত শুভ্র সূক্ষ্ম তার শাড়ি। চাপা রুপালী তার পাড়। আধুনিকার মত কুঁচিয়ে আচল এলিয়ে দিয়েছে। সারা গায়ে নেই অলঙ্কার। কিন্তু সুদীর্ঘ বেণী কালো সাপের মত এলিয়ে পড়েছে তার পিঠ বেয়ে। বয়স? সে অনুমানের ক্ষমতা আছে কোন পুরুষের!

পদক্ষেপে নেই তার রূপসীর অহঙ্কার। কিন্তু চোখে আছে সচেতন দৃষ্টি। রক্ত-রেখায়িত ঠোঁটে তার চাপা ও মুগ্ধ হাসি। আকর্ণবিস্তৃত কালো চোখে বিচিত্র আলো।

পেছনে তার অনেক নরনারী। একটি পুরুষ চলেছে পাশে পাশে। পোশাকে তার ভারি চাকচিক্য। মাথায় শাদা পাগড়ি। হাতে একখানি সরোদ।

রামজীদাসী গিয়ে বসল মঞ্চের এক ধারে। বাহু প্রসারিত করে লুটিয়ে প্রণাম করল মোহন্তকে। ভস্মাচ্ছাদিত জটাজুটধারী মোহন্ত। পরনে কপনি। নেত্র রক্তবর্ণ। ফিরেও তাকাল না। শূন্যে তাকিয়ে হাত তুলে আশীর্বাদ করল।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। সুগোল নয়, কানা-ক্ষয়া থালার মত। হালকা কুয়াশা পড়েছে ছড়িয়ে। যেন হালকা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে মেলা। তার মাঝে বালুর বুকে অভ্রকুচির চাপা হাসির ঝিকিমিকি।

সমস্ত মেলা জুড়ে মাইক ও জনতার হট্টগোল। আলোয় আলোময় চারিদিক। তাকিয়ে দেখি, যেন কোন্ আধুনিক নগরে আলোকিত কেন্দ্রে এসে পড়েছি। লাল নীল আলোকমালায় সাজানো হয়েছে কোথাও। আধুনিক বিপণির চমকিত আলোক-বিজ্ঞপ্তি। কোন গাছে রঙীন আলোর ঝাড়। রঙীন হীরা ফলেছে সোনার গাছে। অজস্র ফুলের মত রয়েছে ফুটে। গোধূলির আধো-আলোয় মাধবীবিতান। আর এই বালুচরের বুকে হাডসন ও অস্টিনের অভিজাত শহুরে হর্ন-নির্ঘোষ। নগরকেন্দ্রকে মনে করিয়ে দিল বেশী করে। আমাদের আশ্রমের সামনে বালু ঠেলে দাঁড়াল এসে কয়েকটি গাড়ি। বাহারী পোশাক ও রঙের হাট নেমে এল আশ্রমের মধ্যে।

কোন এক মহিলা নেমে আসছিলেন চেন-বাঁধা কুকুর সমেত। হয়তো তাঁর আদরের পপি টমি গোছের একটি স্নেহের জীব। বাধা পড়ল। পাহারাদার সন্ন্যাসী আটকেছে তার পথ। আশ্রমপ্রাঙ্গণ অপবিত্র করবেন না মায়িজী। কুকুরের প্রবেশ নিষেধ।

তাহলে? রঙ-রঞ্জিত ঠোঁটে বিরক্তির আভাস। তবু যেতে হবে। গাড়ির ভেতর পুরতে হল আদরের জীবটিকে। তুলে দিতে হল কাচের শার্সি। তারপর ঢুকলেন ভেতরে।

স্যুটপরা তরুণের দল করছে ভিড়। পকেটে দুহাত, আর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহল। চাপা চাপা হাসি আর গা টেপাটিপি।

ওদিকে গণ্ডগোল মহিলা-চত্বরে। পাঞ্জাবী মহিলাদের রঙিন ওড়নার পালেই হাওয়া বেশী। বেশী কণ্ঠের তেজ। দুই অবুঝ ভাষায় লেগেছে কলহ। বাঙলা ও পাঞ্জাবী।

কে বলছে, 'ওমা, সরব কোথায় গো আর? এ বেটি বলে কি?'

প্রতিবাদে গাঁক গাঁক করে উঠল যে নারীকণ্ঠ, তার ভাষা বুঝি নে আমিও। লিখব কেমন করে। সম্ভবত যে স্থানটিতে বসেছে, সেটি কারুর পিতৃপুরুষের কেনা জায়গা নাকি, সেটাই কূট তর্কের বিষয়বস্তু। এর পরে প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই, সারা কুম্ভমেলাটাই কারুর স্বামী বা পিতা কিনেছেন কি-না, সেই বিতর্ক।

শোনা গেল, 'কি খাণ্ডার মেয়েমানুষ বাবা। আমাদের বাড়ির পাশে যে পাঞ্জাবী বউটা আছে, সে তো অমন ঝগরুটে নয়?'

কথার মধ্যে কিঞ্চিৎ পশ্চাদপসরণের আভাস। তাকিয়ে দেখলাম, কলপাড়ের সেই বিপুলাকায়িনী। বোঝা গেল, তার বাড়ির পাশের প্রবাসিনী পাঞ্জাবী বউয়ের তুলনায় সে কয়েক ডিগ্রি উচ্চে অবস্থান করে। অবশ্যই কলহে। কিন্তু এ পাঞ্জাবী তীর্থযাত্রিণী তার চেয়েও উচ্চে। বোধহয়, জীবনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হল। উত্তরপ্রদেশের মহিলাকুলও কম যাচ্ছে না দেখা গেল।

মাইকে শোনা গেল, 'জাগ্রত ভগবান এখানে অধিষ্ঠিত। মায়িজী আপনারা দুদিনের জন্য ভগবানের নাম করুন। সদা ভগবানের সেবা করুন। ঝগড়া করবেন না। ভগবান বিমুখ হবেন। রামজীদাসী ব্রহ্মচারিণী আপনাদের ভগবান শ্রীরামের মহিমা শোনাবেন।'

কথাগুলো বলা হল হিন্দীতে। উর্দুমিশ্রিত নয় বরং খানিকটা বাঙলা-মিশ্রিত যেন। বুঝতে অসুবিধা হল না অধিকাংশেরই।

একটু স্তিমিত হল কলহের কলকণ্ঠ। গুঞ্জন উঠল তানপুরার তারে। দুহাত জোড় করে বসেছে রামজীদাসী। নিমীলিত চোখ। জানি নে কি ছিল ওই মুখে। কিন্তু মনে হল, ওই একখানি মুখ আলো করে রেখেছে সমস্ত মঞ্চ। আবার বলি, সে আলো রামজীদাসীর রূপশিখা। এ রূপ শীতল জলরাশির মত ঢলঢল নয়। শান্ত গভীর জলের বুকে ভাব-পাগলের অবগাহনের ডাক নেই তাতে। একটি অসহ্য দ্যুতি, একটি দুরন্ত দীপশিখা। কাঁপছে আর জ্বলছে ধিকিধিকি। আর দর্শক আর শ্রোতা পুণ্যার্থী নরনারী এই দীপশিখারই আলোয় আলোকিত। নিমেষহারা চোখ। মুগ্ধ মনের ছায়া-চাপা মুখ।

মন ভুলেছিল রূপে। কথাহারা মন কথা বলল এবার। সুদূর হিমাচলের, তার দূর গুহাকন্দরের রহস্যের মত মনে হল আমার এই ব্রহ্মচারিণীকে দেখে।

দূরে সরে গেলাম ভিড়ের কাছ থেকে। দূর থেকে দেখব। একলা একলা দেখব, মনে মনে দেখব। ঘুরে গেলাম বেড়ার কাছে। ছিন্ন কম্বল আর কাপড়-জড়ানো কতগুলি কালো কালো মূর্তি গায়ে গায়ে জড়িয়ে বসেছে

দূরের আধো আলোয়। বেড়ার গা ঘেঁষে বসেছে। এখানে মাথার উপর ঢাকনা নেই। দূরের আধো আলো আর কুয়াশা-চাপা চাঁদের আলো মিলে সৃষ্টি করেছে যেন একটি রহস্যঘন অন্ধকার। লক্ষ্য করে দেখলাম। মূর্তিগুলি সব তাকিয়ে আছে মঞ্চের দিকেই। আরও লক্ষ্য করলাম, গুটি দুয়েক জ্বলন্ত গাঁজার কলকে, পাঁচুগোপালের ভাষায় সপ্তমী ঘুরছে সকলের হাতে হাতে। গায়ে মুখে তাদের ভস্ম মাখা। বুঝলাম, সকলেই সাধু।

কে একজন সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল হনহন করে। গায়ে ধাক্কা লাগল। তাকিয়ে দেখলাম, কোতোয়াল। ডাকলাম, 'কোতোয়ালজী, সাধুজী!'

কোতোয়াল ফিরল। 'কে? ও! আপনি। এখানে কেন, সামনে যান।'

বললাম, 'না দূর থেকেই দেখি। দূর থেকেই ভাল দেখা যায়।'

কোতোয়াল একবার তাকিয়ে দেখল মঞ্চের দিকে। দেখে মুখ ফেরাল। ফিরে নীরব রইল এক মুহূর্ত। জানিনে, ভুল দেখলাম কি-না। কিংবা চাঁদের এই কুহকী আলোর-ই এমনি কারসাজি। কোতোয়ালের সারা মুখে একটি বিচিত্র ভাবান্তর খেলে গেল। সে ভাবান্তরে গম্ভীর ও থমথমে হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'তাই দেখুন। হয়তো দূর থেকেই ভাল দেখা যায়।'

আশ্চর্য! কোতোয়াল কথা বলল। কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকাল না। বললাম, 'চললেন কোথায়?'

কোতোয়াল এবার হাসল। বলল, 'সেই সর্বনাশী ঘুরছে আশেপাশে। দুবার সে চেষ্টা করেছে আশ্রমে ঢোকবার। ঢুকতে পারে নি। বেড়ার ধার দিয়ে গেছে ওইদিকে, পশ্চিমে। দেখি, কোথায় গেল। বেড়া ভেঙে ঢুকলে আর রক্ষে নেই। কার সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

সর্বনাশী! সে আবার কে? কোতায়ালের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন সর্বনাশীর কথা বলছেন? কে সর্বনাশী?'

কোতোয়াল বলল, 'জানেন না? খবর রাখেন না দেখছি। নারী চোরবাহিনীর সে সেরা মেয়ে। সে সব সময়েই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। পুলিশে ধরে নিয়ে গেলেও যে কি করে বারবার ছাড়া পেয়ে যায়, সেটাই আশ্চর্য।'

খবর ঠিক রাখি নে বটে। তবে শুনেছিলাম ব্রজবালার মুখে। তাকিয়ে দেখলাম, বেড়ার বাইরে চলেছে শত শত নরনারী। চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে। উত্তর থেকে দক্ষিণে। এর মধ্যে সেই নারী-চোর কী করেই বা বেড়া ভাঙবে, আর ঢুকবেই বা কী করে। সে তো জাদুকরী নয় যে অদৃশ্য হয়ে ঢুকবে।

বললাম, 'এত লোকের মাঝে কী করে চুরি করবে সে ?'

কোতোয়াল একটু বিচিত্র হেসে বলল, 'লোকের মাঝেই তো চুরি করে সে। যত মানুষ, তত তার সুবিধে।'

পশ্চিমের বেড়ার ধারের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল কোতোয়াল। বালুচরের ভিড়টা এদিকে একটু হালকা। তাকিয়ে রইল সেই ভিড়ের দিকে। তারপর আমাকে বলল, 'ওই দেখুন, একটি মূর্তি ছুটছে। ছুটে চলেছে গঙ্গার দিকে। লক্ষ্য করেছেন ?'

বলা মাত্রই দেখতে পেলাম না। লক্ষ্য করলাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর দেখলাম, সত্যি, ভিড়ের মাঝে ডুব দিয়ে দিয়ে হঠাৎ জেগে উঠছে একটি মূর্তি। মেয়েমানুষ নিঃসন্দেহে। ছোটার বেগে আঁচল উড়ছে তার।

কোতোয়াল বললে, 'ও যাদের চেনে, তাদের দেখলেই পালায়। তবে, ওর পালানোর কথা বলা যায় না। এই দেখছেন গঙ্গার দিকে ছুটছে। আবার হয়তো এখুনি দেখবেন, ঝুসির কোলে আঁধার থেকে পা টিপে টিপে আসছে ক্যাম্পের দিকে। আর জন্মে বোধ হয় চিতাবাঘ ছিল।'

হবে হয়তো। চোর, তাও আবার নারী। ব্রজবালার মুখে যা শুনেছি, তাতে চোরটি যুবতী ও সুন্দরীও সম্ভবত। রহস্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ রসিকতার কথাই স্বভাবত মনে আসে।

এমন সময় মাইকে কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালাম। রামজীদাসী নিমীলিত চোখ খুলছে। তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠ মিশিয়ে একটানা গেয়ে চলেছে শুধু, রাম রাম, রাম রাম, রাম রাম রাম রাম। বারকয়েক রামজীদাসী একক কণ্ঠে রাম নাম গেয়ে গেল। কণ্ঠে কোথাও সঙ্গীত অধ্যবসায়ের কারুমিতি ঠেকল না কানে। যেন গ্রাম্য বালিকার সরু চাপা কণ্ঠের স্বর। একটু পরেই তার

কণ্ঠে কণ্ঠ দিল কয়েকজন পুরুষ ও আরও দুটি নারী। এরা আবার কারা? জিজ্ঞেস করবার জন্যে ফিরে দেখলাম, কোতোয়াল নেই, আশ্চর্য তো! চোখে পড়ল, অদূরেই বেড়ার বাঁশে হেলান দিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। কোতোয়াল ভেবে কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম।

লোকটি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মঞ্চের দিকে। লোক নয়, সাধু নিশ্চয়ই। ঝাপসা আলোয় মনে হল ফর্সা মুখ। কুঞ্চিত ঘন দাড়ি সেই মুখে। এত শীতেও গায়ে শুধু মাত্র সুতী কাপড়ের গেরুয়া কাপড় একখানি। ঘাড় অবধি বেয়ে পড়েছে ঘন চুলের গোছা। জটাজুটের কোন চিহ্ন নেই। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

মঞ্চের দিকে শুধু দৃষ্টি নয়, বোধ হয় মনটিও পড়েছিল। আমি যে উঁকি দিলাম, প্রথমে নজরেই পড়ল না তার। কোতোয়াল নয় দেখে ফিরতে গেলাম।

হঠাৎ বোধহয় সম্বিত ফিরে পেল সে। পরিষ্কার হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, ‘বাবুজী আপনি কী দেখলেন?’

সঙ্কুচিত হলাম। উঁকি দেওয়াটা ঠিক হয় নি বোধহয়। বললাম, ‘আমি একজনকে খুঁজছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনিই বুঝি সে।’

ভেবেছিলাম মিটে গেল কথা। কিন্তু সাধুটি হাসল। হাসিতে তার একটি চাপা উত্তেজনার আভাস। একটু যেন অপ্রকৃতিস্থ। একটু যেন রহস্য করেই বলল, ‘ভেবেছিলেন, আমি-ই সেই। হা হা হা—সে কোথায়! তাকে এখানে কোথায় পাবেন আপনি!’

আবার সেই কথা। সেই ভাব। সে আবার বলে উঠল, ‘আপনি খুঁজছেন, বাবুজী, আমিও খুঁজছি। দুনিয়াভর তাঁকে খুঁজছি। জীবন কেটে গেল, তবু পাত্তা মিলল না।’

একথার কোন জবাব নেই। কী জবাব দেওয়া উচিত, তাও জানিনে। অতএব সরে পড়াই ভাল।

কিন্তু সে আবার হেসে উঠে বলল, ‘কাকে খুঁজছিলেন বাবুজী?’

বললাম, ‘এ আশ্রমের কোতোয়ালজীকে।’

সাধু বলল, ‘রামানন্দজীকে? এই তো এখান দিয়ে চলে গেল সে।’

রামানন্দ ! বললাম, 'কে রামানন্দ ?'

'কেন, এ আশ্রমের কোতোয়ালজী।'

'আপনি চেনেন ?'

সাধু হাসল। চাপা গলায় হা হা করে হেসে বলল, 'চিনিনে ? অনেকদিন থেকে চিনি।'

'আপনি কি এ আশ্রমের লোক ?'

সাধু বলল, 'না।' বলে তাড়াতাড়ি বলল, 'দেখুন, দেখুন, রুক্মিণী নাচছে।'

ফিরে তাকালাম। দেখলাম, রামজীদাসী কোমরে বেঁধেছে আঁচল। নেমে এসেছে মঞ্চ থেকে। মঞ্চোপরি মোহন্তের পাশে দেখলাম, যাত্রার দলের পোশাক পরে বসেছে তিনজন। তিনজনই বালক মনে হল। দুজনের ধনুকধারী পুরুষের বেশ। আর-এক জনের রানীর বেশ বলেই মনে হল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার ? এরা কারা ?'

সাধু হাসল। তার হাসির মধ্যে কোথায় একটা বিদ্রূপ ও কৌতুকের ছোঁয়া লেগে রয়েছে যেন। বলল, 'ওরা রাম লক্ষ্মণ আর সীতা। সাজিয়ে এনেছে একটি কীর্তন মণ্ডলেশ্বরের দল। রুক্মিণী এবার নাচবে। সে যে রামজীদাসী। মীরাবাঈয়ের কথা শুনেছ বাবুজী ? কৃষ্ণদাসী, কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী মীরাবাঈ। মহাপ্রেমিকা। কিষেণজীর নাম শুনলে প্রেমে অবশ হয়ে যেত রাজরানীর অঙ্গ। আর এই রামজীদাসী রামপ্রেমে পাগলিনী। সে যেখানে যায়, কীর্তন মণ্ডলেশ্বর সেখানেই রাম-সীতার মূর্তি নিয়ে হাজির থাকে। নইলে রামজীদাসী পাগলের মত ঘুরবে, খুঁজবে, দেখবে। কোথায়, কোথায় সেই মোহন মূর্তি। নাম গান করতে করতে কখনো প্রাণ তার অবশ হয়ে যায়। কখনো নাচে গায় হাসে কাঁদে।'

জিজ্ঞেস করলাম, রুক্মিণী কাকে বলছেন আপনি ?'

সাধু বলল, 'কি বলব তবে ? মনিয়াবাঈ ?'

'মনিয়াবাঈ কে ?'

'রামজীদাসীর আর-এক নাম ছিল। কিন্তু মনিয়াবাঈ মরে গেছে অনেকদিন।'

বড় কৌতূহল হল। কুহেলিকাময় চাঁদের আলোয় সাধুর মুখে এক বিস্মৃত যুগের রহস্যকাহিনী যেন উঁকি মারছে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করবার অবসর পেলাম না। বাজনা বেজে উঠল। সরোদ আর তবলায় বেজে উঠল নাচের বোল।

রামজীদাসী ধরেছে গান,

কৌন্ বন্ পহুঁছে সখী দো পেয়ারা, দো পেয়ারা
যা'কে ভোজন মেওয়া মিঠাই তে করসে বনফল।
করত্ আহারা॥

গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ। আশ্চর্য। এই নৃত্যভঙ্গিমা, পদ-সঞ্চালন, হাত ও আঙুলের মুদ্রা তো অশিক্ষিত অপটু নাচিয়ে মেয়ের নয়। এ শুধু মাত্র ভাবের ঘোরে ঘুরে ঘুরে নাচ নয়। প্রতিটি পদক্ষেপে তার নৃত্যকুশলী প্রতিভার অপূর্ব স্ফুরণ। হৃদয়তল ছন্দায়িত হয়ে উঠল তার নাচের ছন্দে ছন্দে। ভুলে গেলাম, রয়েছি এক বালুচরের আশ্রমে। মনে হল, কোন নামকরা নৃত্যকুশলার নাচ দেখতে বসেছি কোথাও।

নাচের নাম জানি নে, তাই বলতে পারব না। নাচের দোলায় দোলায় রামজীদাসীর রূপের ছটা বিচ্ছুরিত হল দিকে দিকে। যে রূপ দেখেছি, সে রূপ ছিল ছাইচাপা। নাচের হাওয়ায় উড়ছে ছাই। আর-এক বিচিত্র রূপে রূপবতী হয়ে উঠেছে রামজীদাসী। আধুনিক ভঙ্গিতে পরা তার মলমলের মত শাড়ি। ভাঁজে ভাঁজে তার রূপের শিহরণ। পিঠের বেণী তার চঞ্চল কালো নাগিনীর মত হিসহিস করে উঠেছে অস্থিরতায়।

যাকে আচোয়ান সরযূ গঙ্গাজল
তে কয়সে পিওত্ জঙ্গল জল খাড়া॥

তারপর করুণ কণ্ঠের মিনতি, 'কহো কহো মেরী রাজা।' গানের ভাষা দেহাতি মনে হয়। সব কথার অর্থ বুঝিনে। মনে হল, বনবাসী রামকে জিজ্ঞেস করছে, 'রাজার ছেলে তুমি। নিয়ত খেতে মেওয়া মিঠাই। কিন্তু বনে এসে তুমি কি করে বনফল খেয়ে রয়েছ? নির্মল গঙ্গাজল তোমার পানীয়, কিন্তু হে রাম! জঙ্গলের জল তুমি কেমন করে পান করছ? চরণ

তোমার নিত পলঙ্গ্‌'পর, কেমন করে তুমি ঘুরছ বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে।
ওগো রাজা রাম! এ দুঃখ তুমি সয়েছ, আমার যে সয় না।'

একটা মাতন লাগিয়ে দিয়েছে রামজীদাসী। তাকিয়ে দেখি, সভাস্থ সকলের চোখে মুখে একটি ভক্তিরসের ছোঁয়া লেগেছে। রস করুণ, নিঃসন্দেহে। রামজীদাসীর রূপমুগ্ধ মানুষের হৃদয়ে কোন্ চোরাপথ দিয়ে এসে পড়েছে একটি ভক্তিরসের শীর্ণ ধারা। জানি নে প্লাবনের সৃষ্টি হবে কি-না।

আমার পার্শ্ববর্তী সাধু বলে উঠল, 'উলারা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?'

'এই গানের নাম বাবুজী। এদেশের ঝি-বহুড়িরা পালা-পার্বণে এ গান গায়।' দেখলাম, সাধুর চোখে মুখেও ওই গানের রসের তরঙ্গ লেগেছে!

তারপর শুধু নাচ। সন্ন্যাসীর দিক থেকে চোখ ও কান দুই-ই চলে গেল রামজীদাসীর দিকে। তবু, সন্ন্যাসীকে ছাড়তে মন চাইছে না। একটা তীব্র ও চাপা কৌতূহল অদৃশ্য চুম্বকের মত টেনে রেখেছে আমাকে। টেনে রেখেছে রুক্‌মিণী আর মনিয়াবাঈ। শুনতে পাচ্ছি, সন্ন্যাসী বিড়বিড় করছে আপন মনে। অস্পষ্ট কথা আর চাপাহাসি।

তবুও মন ভাসিয়ে নিয়ে গেল রামজীদাসী। রামজীদাসীর নাচ। নাচ আর বাজনা। সরোদ বাজছে যেন স্রোতস্বিনীর টানে, কিনারে কিনারে নুড়িমালার রিনিঠিনি। তার সঙ্গে তবলা-সঙ্গত। রামজীদাসীর পদক্ষেপের তালে তালে একজন হাতে নিয়ে ঝঙ্কার দিচ্ছে নূপুরের গোছা।

যন্ত্রসঙ্গীতের এই সুর যেন একটি ছবি। একটি নিখুঁত প্রাকৃতিক দৃশ্য। নিরন্তর তানপুরা-ধ্বনি যেন ছবির পেছনের বিস্তৃত অসীম নীল আকাশ। কোলে তার একটি রূপের দ্যুতি। রামজীদাসী।

ভাবের ঘোরে নাচ নয়। নাচে লেগেছে এবার ভাবের ঘোর। কথা ফুটছে নাচের ছন্দে। সেই নিঃশব্দ কথাঃ হাসি ও আনন্দের, বেদনা ও অভিমানের। কখনো নির্বাক ব্যথা ব্যক্ত হয়ে পড়ছে দেহভঙ্গিতে। নিথর আড়ষ্ট বঙ্কিম দেহ! তারপরে অকস্মাৎ ব্যথার পাথর সরিয়ে নির্ঝরিণী ছলছল।

সর্বাঙ্গ আনন্দে থরথর কম্পিত কিংবা কপট অভিমানে চটুল নারী চোখে হাত দিয়ে খেলে আঁখমিচোলি। আবার ভক্তি-উচ্ছ্বাসে মাটিতে লুটনো প্রণাম।

রামকে নিয়ে রামজীদাসীর লীলা। নির্বাক বিস্ময়ে ছেলে তিনটি গোল গোল চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। রাম লক্ষ্মণ আর সীতা। বেচারীরা অন্য দিকে তাকাবার অবসরও পাচ্ছে না একটু।

আরো জানিনে, ভক্তি-উচ্ছ্বাসে কতখানি মেতে উঠেছে মণ্ডপের নরনারী। কিন্তু অভূতপূর্ব স্তব্ধতা বিরাজ করছে সর্বত্র। মোহমুগ্ধ নির্বাক সকলে। যেন তাদেরই নির্বাক হৃদয়ের তালে তালে নাচছে রামজীদাসী।

ভিড় হয়েছে প্রচণ্ড। গেটের সামনে আর বেড়ার ধারে ধারে গিজগিজ করছে কৌতূহলী দর্শকের ভিড়। সারা কুম্ভমেলাটাই ভেঙে পড়েছে যেন রামজীদাসীর নৃত্য-আসরে।

পাশ থেকে সন্ন্যাসী হেসে বলল, 'একদিন যার নাচ দেখার জন্য লাখপতি ধর্না দিত বন্ধ দরজায়, আজ সে মেলার মাঝে নেচে নেচে ভগবানের সেবা করছে।'

'লাখপতি ধর্না দিত!' সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই রামজীদাসীর নাচ দেখার জন্য?'

সন্ন্যাসী বক্র হেসে, গম্ভীর গলায় বলল, 'ছি বাবুজী, রামজীদাসী বলতে আছে! আমি বলছি লক্ষ্ণৌয়ের মনিয়াবাঈয়ের কথা! রূপে যার জুড়ি ছিল না দিল্লী-লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজীকুলে। মনিয়াবাঈ। কেউ কেউ বলত রুক্মিণী। কার ফুলে মধু আছে, ভ্রমর ছাড়া কোন্ রসিক তার সংবাদ রাখে। কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ের রসিক ভ্রমরেরা আসত ছুটে, মনিয়াবাঈয়ের সন্ধানে। সংবাদ চাপা থাকত না তাদের কাছে। কেউ দেখা পেত, কেউ পেত না। সহজ কথা? একি সেই লেড়কী, সেই আওরত, যে সড়ক কি-কিনারে পেতেছে আপনা বেসাতি। হাসি যার ঠোঁটে লেগে থাকে, নাগরকে খুশীকরা ছল-কথা যার মুখে ঝরে হরবখত? নহি নহি বাবুজী। সেরকম বাঈজী ছিল না মনিয়াবাঈ। গানের কলি দিয়ে ভোলানো? আরে রাম রাম!'

বলতে বলতে কিছু ভাবান্তর ঘটল সন্ন্যাসীর মুখে। বক্র হাসিটি চাপা ব্যথায় করুণ হয়ে উঠে। যদি ঠিক দেখে থাকি, যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে দেখেছি ঠিক। দেখলাম, কোন এক সুদূরের বুকে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। যেন কোন-এক দূর মঞ্চে, কী এক খেলা দেখছে সে। দেখছে, আর তার চোখে সে খেলারই আলোছায়ার ঝিলিমিলি। তার কথাগুলি বুঝলাম। কিন্তু ব্যক্ত করতে পারব না তার ভাষায়। ঠেট্ হিন্দি নয়। গ্রাম্য ভাষার মধ্যে গ্রাম্য অলঙ্কার দিয়ে কবিতা-আবৃত্তির মত হিন্দিতে বলল সে। বলল, 'বাবুজী মানো, অনেক খেলা ভগবান আমাদের দেখাচ্ছে। মনিয়াবাঈকে দিয়ে ভগবান আমাদের একটা খেলা দেখিয়েছে। মনিয়াবাঈ সোনার পালঙ্কে বসে মহারানীর আদর পেয়েছে, কিন্তু বুকের ভেতর তার আঁকা ছিল রঘুনন্দনের মূর্তি। রঘুনন্দন!' যেন সে ডাক দিল রঘুনন্দনকে। জানি নে কে সেই রঘুনন্দন। ব্যাকুল গলায়, জোড় হাতে বলল সন্ন্যাসী, 'হে মহাপ্রাণ, সাধকগুরু, আমার প্রণাম নাও।' বলে সে চুপ করল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'রঘুনন্দন কে?'

বলল, 'সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী, কিন্তু কপনি এঁটে জটা বাঁধবার জন্যে? চোখ পাকিয়ে খালি ব্যোম্ ব্যোম্? উঁহুঁ, বাবুজী, সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের মধ্যে প্রেমাবতার বাসা নিয়েছিল। যে তার কথা শুনেছে, প্রাণ জুড়িয়েছে তার। মনে হত, যুগযুগান্তের কোন্ সিদ্ধাচার্য নতুন রূপে এসে দাঁড়িয়েছে তোমার সামনে। সেই রঘুনন্দনের ছায়া পড়েছিল মনিয়াবাঈয়ের বুকে। পর ছায়া নয়। রঘুনন্দনের সাচ্চা ছায়া। যত ঝাড়ো, যত মারো, যত বুক চাপড়াও, সে ছায়া সরবে না। আগুনে ঝাঁপ দেবে? তোমার ছাইয়ের, তোমার আত্মার মধ্যে বিরাজ করবে সে। হা-হা-হা···লক্ষ্ণৌয়ের রাজ ইমারত, বিজলীবাত্তি আর সোনার খাট। হীরা-জহরতে-ভরা মনিয়াবাঈয়ের সর্বাঙ্গ। বাবুজী লালসামন্ত পাগলেরা বাঈজীর খোলা গায়ে মদ ঢেলেছে। তার সুন্দর পা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়েছে সেই মদ। লোভী কুকুরের মত কামাসক্ত মানুষ তাই চেটেছে। মানুষ নয়, জানোয়ার। জানোয়ারের উল্লাস। যৌবন যার ক্ষেত-জমিনের মাটির ঢ্যালা। আজকে পাথরের মত

শক্ত, কালকের বর্ষার সে কাদা হয়ে গলে যাবে। আর এই জানোয়ারের মাঝে পাগলীর মত খিলখিল করে হেসেছে নটী মনিয়াবাঈ। হেসেছে, নেচেছে, গান করেছে। তারপর জিন্-পাওয়া আওরতের মত চীৎকার করেছে, লণ্ডভণ্ড করেছে ঘরদোর, ভেঙে দিয়েছে সভা। সে ভৈরবী মূর্তি দেখে পালিয়েছে কামার্ত পশুরা। মনিয়াবাঈয়ের আর-এক নাম ছিল পাগলী বাঈজী। রূপ ছিল তার পাপ। সেই পাপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল আলো। সেই আলো যখন জ্বলে উঠত পাপের ভারে, মনিয়া তখন পাগলী হত। হবে না! আরে বাপরে। রঘুনন্দন এসে দাঁড়াত যে তার সামনে। তার দিব্যদৃষ্টির সামনে। তাকে বুকে নিত, আদর করত, সোহাগ করত। তারপর একদিন—বলতে বলতে সে থামল আচমকা। যেন কী কথা মনে পড়েছে হঠাৎ। চাপা উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মগর, আখেরি নতিজা কেয়া মিলি? বাবুজী, দেখ, দেখ তো রামজীদাসীকে। হাত রাখো নিজের বুকে। রেখে বল, কী দেখছ? কী ভাবছ? তোমার মনের মধ্যে এক ছোট্ট রঙদার চিড়িয়া পাখা ঝাপটা দিচ্ছে না? আরে, সরমাচ্ছো কেন বাবুজী? লজ্জা কি? ওই চিড়িয়া তোমার বাসনার সুন্দর মূর্তি। তোমার নয়, সকলের। সকলের মনেই ওই বিহঙ্গ ছটফট করছে। করবে না? ওই রূপ! ওই বেশ! উর্বশীর জীবন্ত ছায়া। রামজীদাসী নামে, বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি, ধুকু ধুকু। নিজের মন চেনে কজনা? গৃহী বাদ। সন্ন্যাসী? মন চেনে কজনা? বাসনা মরেছে কজনার? রামজীদাসী নয়, আগুনের পিছে ছুটছে সব। প্রকৃতি একটা শোধ নিচ্ছে ওই রহস্যময়ীকে দিয়ে। ভগবানের মুখে চুনকালি মাখাতে চাইছে। শুনলে লোকে হাসবে, রাগ করবে। লোকে শুধু ওইটুকুই জানে। থাক, থাক, ওসব কথা।'

সন্ন্যাসী চুপ করল। দাঁড়িয়েছিল একটা বাঁশ ধরে। সেটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল এবার। গলায় তার রুদ্রাক্ষের মালা। রুদ্রাক্ষের কুণ্ডল কানে, বলিষ্ঠ হাতে বালা রুদ্রাক্ষের। কপালে অস্পষ্ট পুণ্ডরেখ।

সন্ন্যাসী থামল। কিন্তু আমার মন থামে নি। সে তার সবটুকু অনুভূতি

দিয়ে কান খাড়া করে রইল। দেখছি, রামজীদাসী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ দেখতে পাচ্ছি নে। পেছন ফিরে রয়েছে। হয় তো নিমীলিত চোখ, মুখে বিশ্বভোলানো হাসি। পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছি, রুপালী পাড়ের বেষ্টনী ঘিরে রয়েছে তীব্র রেখাঙ্কিত দেহ। তাকে দুভাগে ভাগ করে নেমে এসেছে সুদীর্ঘ কালো বেণী। আর কীর্তন মণ্ডলেশ্বরের গীতকারেরা সকলে মিলে ধরেছে গান।

রামজীদাসী আর মনিয়াবাঈ। মনিয়াবাঈ আর রঘুনন্দন। সব মিলিয়ে একটা অস্পষ্ট অথচ তীব্র রহস্যের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি উৎকর্ণ হয়ে। অতীত ভারতের এক রহস্যদ্বারের সামনে যেন দাঁড়িয়েছি আমি। যেন বিচিত্র রহস্যে ছেয়ে গিয়েছে সারা কুম্ভমেলা। মনিয়াবাঈ আর সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের কাহিনী শোনবার জন্য আকুল মন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সন্ন্যাসীজী, তারপর ?'

বুকের খুলে যাওয়া আবরণ ঢাকা দিল সন্ন্যাসী। হঠাৎ যাওয়ার উদ্যোগ করল। বলল, 'পুরনো কথা বাবুজী। এ হল সন্ন্যাসীর গুপ্তকথা। আপনাদের শুনতে নেই। ভালও লাগবে না।'

বলে সে সত্যি পা বাড়াল। বললাম, 'যদি বাধা না থাকে, তবে শুনতে চাই।'

সন্ন্যাসী তাকাল আমার দিকে। মন-সন্ধানের তীক্ষ্ণতা তার চোখে। বলল, 'আপনার আশ্রমের কোতোয়ালের কাছ থেকে শুনে নেবেন বাবুজী। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কারুর অজানা নেই এই কথা।'

বলতে বলতে চলে যেতে চায়। মনে হল অনিচ্ছার ছল-হাসি তার মুখে। হয়তা শুনতে পাব না কিছুই রামানন্দের কাছে। সন্ন্যাসীর কাছ ঘেঁষে এলাম, জানি নে সাধুসন্ন্যাসীর মেজাজ। কখন কোন ভাবে বিভোর। বেশী বললে যদি আবার গণ্ডগোল ঘটে। তবু বললাম, ভয়ে ভয়ে, 'অসুবিধে না হলে আপনিই বলুন।'

সন্ন্যাসী বাঁকা হেসে বললে, 'কেন শুনতে চান ? এ এক সন্ন্যাসীর প্রেম-কাহিনী। আপনার গৃহী মন বিরূপ হবে।'

হয়তো হবে। তবে গৃহী বলে নয়। অমানুষিক কাহিনী বলে মানুষ দুঃখ পাবে বৈ কি। তবুও মনে বড় কৌতূহল। সন্ন্যাসীর আবার প্রেম! সে কি কথা?

বললাম, 'শুনতে বড় সাধ। সন্ন্যাসীর প্রেম কথা, এযুগে কখনো শুনি নি।

সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। হেসে চলতে আরম্ভ করল আশ্রমের গেটের দিকে। বুঝলাম, নীরবে আহ্বান করছে সে আমাকে। আর-একবার দেখলাম রামজীদাসীকে। সত্যি, আগুনই বটে। সভাস্থ নরনারী সকলে অপলক বিস্মিত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকেই।

গেটের কাছে এখনো ভিড়। ভিড় ঠেলে বাইরে এলাম। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। যেদিকে তাকাই সেদিকেই লোক। তবে গায়ে গায়ে নয়। সীমাহীন বালুপ্রান্তরের আলোকিত মেলায় ছড়ানো মানুষ।

সন্ন্যাসী চলল পুব-দক্ষিণ কোণ বরাবর। সঙ্গমের এক কোণে। যেখানে সরস্বতী আছে আত্মগোপন করে। ওদিকটায় আলো নেই। কিন্তু আকাশে চাঁদ রয়েছে। প্রবল শীত। তবু উত্তরপ্রদেশের আকাশে এখনো যেন শরতের সমারোহ। সমারোহ শুধু মেঘেরই আনাগোনায়। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে দেখা যায় না শরতের ঘোর নীলিমা। ঝুঁসির উঁচু বুকে অড়হড়ের ক্ষেত। ঘন মেঘের মত লেপটে রয়েছে অস্পষ্ট আলোকিত আকাশে। এদিকটায় বৈদ্যুতিক আলো নেই। কিন্তু মানুষের আনাগোনা কম নয়। অস্পষ্ট ছায়া-মিছিল চলেছে চারিদিকে।

যত এগুচ্ছি, বালি তত গভীর মনে হচ্ছে। পা ডুবে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী আমার দিকে ফিরে বলল, 'সন্ন্যাসীর প্রেমকথা কখনো শোনেন নি?'

তার কণ্ঠস্বরে অবাক হলাম। এক বিচিত্রভাবে ও সুধায় কথা তার গম্ভীর ও তরল। খুশী ও আনন্দে ভরপুর। বলল, 'সন্ন্যাসীর প্রেম তার ধ্যানে ও ধর্মে। ধর্মে আর কর্মে। তার প্রেম বলে, ওগো দেবী, প্রাণেশ্বরী, প্রেয়সী, সন্ন্যাসিনাং সদা সেব্যং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে! তবে গোপনে। গৃহী-জগতের বাইরে। প্রেম থাকবে না কেন? তবে, এই প্রেমে অনেক আড়ম্বর, অনেক

আয়োজন। লোকচক্ষে বড় ভয়ের বিষয়!···বস্থন বাবুজী, আপনাকে সন্ন্যাসীদের একটি গুপ্ত ক্রিয়ার কথা বলি।'

বলে সে শিশিরসিক্ত বালির উপরেই বসে পড়ল। আমিও বসলাম। আধুনিক শহুরে মনে সাধু-সন্ন্যাসীদের সবই উদ্ভট বলে জানি। তবু কৌতূহল ছাড়তে পারি নে।

সে বলল, 'বাবুজী, সন্ন্যাসীর আছে কুলাচার। কুলাচার কী? আপনি বাঙালী। আপনাদের দেশে কুলাচারী বড় বেশী ছিল। আপনাদের ভক্ত চণ্ডীদাস, কবি-সাধক। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা গেয়েছেন। তিনিও কিন্তু কুলাচারী। কুল তাঁর রজকী। রামী ধোপানী। ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী, নটী, ডোমী আর রজকী—এ হল বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের নির্বাচন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রমতে নয় কুল। ওই পাঁচ, আরও চারটি। বেশ্যা, কাপালী, নাপিতানী, গোপিনী। কোন কোন তন্ত্রমতে চৌষট্টি কুলও আছে। যবনীও বাদ যায় না তাতে। এসব সাধনমার্গের গুহ্য পদ্ধতি। তবে, এ সবই তন্ত্রমতে। কিন্তু সন্ন্যাসীর তো তন্ত্র নেই। অনেকে কুলাচার-পদ্ধতিতে সাধন করে থাকে। আপনাকে সন্ন্যসীদের কথাই বলি।' বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল। বোধহয়, আমি কী ভাবছি, সেটুকু দেখবার জন্য। কিন্তু এসব বৃত্তান্ত কম-বেশী শুনেছি। এতে আমার বিস্ময়ের কিছু ছিল না। আমি শুনতে চাইছিলাম, রঘুনন্দন ও রামজীদাসীর কাহিনী।

সে বলল, 'সন্ন্যাসী আর অবধূতে বড় একটা তফাত নেই। এরা অনেকে জ্যোত্‌মার্গের সাধন করে। অনেক তার ক্রিয়াকাণ্ড। মূলে বালাসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব হল তার কামনা। ঘৃত-কর্পূরের একটি প্রদীপকে তারা পূজা করে। প্রদীপের চারপাশে সাক্ষী থাকেন কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হনুমান আর ভৈরব! এ পূজার উপচার হল, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, মতি ও চক্রী। বুঝতে পারলেন না? মদ, মাংস, মাছ, অন্ন আর পুরি। এ হল গুপ্ত শব্দ। এ ছাড়া, সপ্তমী ও ষষ্ঠী। গাঁজা আর তামাকু। এ হল জ্যোত্‌মার্গে প্রবেশের পন্থা। যে প্রবেশ করে, তাকে আর-একটি ব্রত করতে হয়। তাকে বলে চৈত্র মাসে নবরাত্রি ব্রত। এই ব্রতের দিন সন্ন্যাসী

চক্র করে আর গুপ্তস্থানে মিলিত হয় আওরতের সঙ্গে। এই মিলন হল সন্ন্যাসীর গুপ্ত সাধনের সিঁড়ি। একে ছাড়া চলবে না। এর মধ্যে আছে অনেক যুক্তি, কূট বিষয়। আপনি সব বুঝবেন না বাবুজী।'

সন্ন্যাসীর জ্যোত্‌মার্গ প্রবেশ জানি নে। কিন্তু তন্ত্রের নানান কথা অনেকবার শুনেছি। শুনেছি, আর বার বারই মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে একটি প্রশ্ন, 'এসব কেন, কেন?' যত জিজ্ঞেস করেছি, জবাবগুলি ততই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে অনুভূতিতে। বুদ্ধিও অনুভূতির অগম্য। নানান জনের নানান মত। সাধকের সিদ্ধিলাভের বিচিত্র লীলা। নিতান্ত সামাজিক জীব আমরা। আমাদের বলে, তোমরা বুঝবে না। আর আমরা ভাবি, তবে বুঝব না। শেষ পর্যন্ত যা পাই, সে তো মানুষের আর সাধকের আত্মার তৃপ্তি। এখানেই এত ঘোরপ্যাঁচ। কিন্তু কই, বিকলাঙ্গ বলরামকে, তার কথাকে তো এত জটিল মনে হয় নি। সে যেন পরিচ্ছন্ন একটি সুন্দর মানুষ। তার সঙ্গিনী লক্ষ্মীদাসীও তেমনি সুন্দর।

প্রতিবাদ করলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'রঘুনন্দনের কী হল?'

সন্ন্যাসী বলল, 'রঘুনন্দন আর রুক্‌মিণীর কথা বলব বলেই এত কথা বললাম। এখনি বললাম বুঝি তোমাকে এসব? তবে, এ বিশ্বসংসারের কিছুই গোপন নেই। তাই বললাম। বাবুজী, রামজীদাসীর রূপ দেখে মানুষের চোখ ভুলে যায়। পুরুষের চোখ কিনা। কিন্তু পুরুষের রূপ দেখেও যে মানুষের চোখ ভোলে, তার প্রমাণ ছিল রঘুনন্দন। এই এলাহাবাদেই এক ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে। মানুষ নয়, সাক্ষাত শিব-স্বরূপ। শুধু রূপে নয়, গুণেও। সে চোখ তুলে তাকালে, গায়ে হাত দিলে, সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠত মানুষের। মন্ত্র-তন্ত্র নয়। তার হৃদয়টি ছিল অমনি। তার চরিত্রের গুণে তার কাছে আসত মানুষ। তোমার ঐ নিরঞ্জনী আখড়ার সাধুরা রঘুকে বিদ্রূপ করত, ঠাট্টা করত। বলত, সন্ন্যাস-জীবন তোমার নয়। গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে শাড়ি পরে নবদ্বীপে চলে যাও। তা বললে কি হয়? মহাজ্ঞানী রঘুনন্দন। তর্কে হার মেনে রগচটা সন্ন্যাসীরা খালি ত্রিশূল দিয়ে মাটি খোঁচাত।...এই রঘুনন্দনের সঙ্গে রুক্‌মিণীর দেখা হয়েছিল হরিদ্বারে।

রঘু তখন জ্যোত্‌মার্গ সাধন করে নবরাত্রব্রত উদ্‌যাপনের আয়োজন করছে!'

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কোন এক অতীত যুগের কথা শুনছি। যে ভারতবর্ষকে দেখছি, এ যেন সে ভারতের কাহিনী নয়। কোনও এক হিন্দুযুগের। সন্ন্যাসীকে বাধা না দিয়ে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব কত বছর আগের কথা?'

সন্ন্যাসী বলল, 'তা আজ প্রায় পনর-ষোল বছর আগের কথা।'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে রামজীদাসীর বয়স কত?'

হেসে বলল সে, 'কত অনুমান করেছেন বাবুজী?'

অনুমান? অনুমান করে নারীর বয়স বলার সাধ্য আমার ছিল না। তবু বললাম, 'বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ।'

সন্ন্যাসী তেমনি হেসে বলল, 'আরও কম বললে দোষ হত না। কিন্তু বাবুজী, আরও আট-দশ বছর বাড়িয়ে দিন।'

আরও আট-দশ বছর! চকিতে সেই রূপশিখা মূর্তি ধরে দাঁড়াল আমার সামনে। আশ্চর্য!

শুধু দেহ নয়। মুখখানিতে কোথাও বয়সের দাগ পড়ে নি। কম বললে সত্যি ক্ষতি ছিল না!

সন্ন্যাসী বলল, 'মনে আছে, সে যেদিন এল, আমাদের আশ্রমের শূন্য বাগানে যেন ফুল ফুটে উঠল। সন্ন্যাসী হলে তো তার চোখ অন্ধ হয়ে যায় না। হৃদয় মরে যায় না। সে এল। সঙ্গে তার স্বামী। ঝোলা-কাঁধে নিতান্ত গেঁয়ো মানুষ। চৈত্র মাস। হরিদ্বারে তখন এমনিতেই ভিড়। কেদারবদরির যাত্রীরা আসতে আরম্ভ করেছে। বরফ-গলা জলের ঢল নেমেছে এদিকে-ওদিকে। রুক্মিণীর স্বামী মোহান্তের অনুমতি নিয়ে খানা পাকাবার আয়োজন করল আশ্রমে। তারা এসেছে আরও উত্তর থেকে। যাবে বদরি-নারায়ণ দর্শনে। আশ্রমের পেছনেই আশ্রমের একটি গুপ্তাবাস ছিল। একটি মস্ত গুহামুখ। সেইখানে নবরাত্র ব্রতের ভিড়। আশ্রমের অনেকে সেখানেই ব্যস্ত তা ছাড়া ভক্তও এসেছে অনেক। কয়েকজন এসেছে সস্ত্রীক। নবরাত্র ব্রত বড় গোপন বিষয়। তার আয়োজনও চলছিল গোপনে।'

বলে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল সন্ন্যাসী। বলল, 'বড় অদ্ভুত মানুষ ছিল রঘুনন্দন। গুপ্তাবাস থেকে বার বার বেরিয়ে আসে, আর মোহান্তর কাছে এসে খালি বসে। আমার সঙ্গে যতবার চোখাচোখি হয়েছে, ততবারই হেসেছে। অস্বীকার করব না, সে হাসি সন্ন্যাসীর শোভা পায় না। সে হাসি গৃহী জোয়ান ছেলের। গোপন প্রেমের। তবে, রঘুনন্দনের মুখে একটা চিন্তাও ছিল বাবুজী। মাঝে মাঝে কালো দেখাচ্ছিল তার আন্ধেরী মুখ। আমি ছিলাম কোতোয়াল। নবরাত্র ব্রতে নিমন্ত্রণ করতে যাব অন্যান্য আশ্রমের সহধর্মীদের। হঠাৎ রঘুনন্দন এসে বলল, 'কোতোয়ালী, আমি চক্রে থাকতে পারব না রাত্রে।' আমি তাজ্জব। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। নিত্য-মন্ত্র পাঠ করে, নতুন বেশে সেজেছে সে। নেংটির চেয়ে হাঁটু অবধি গেরুয়া ধারণ তার পছন্দ ছিল। গলায় ছিল ধুমরার মালা। রুদ্রাক্ষের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাল-গাঁথা হার। হাতে বদরিকা-কঙ্কণ। আর প্রবালের মালা দিয়ে জড়ানো জটা। আগুনের মত তার গায়ের রঙে ভস্ম মাখা। বুকে, গলায় আর কপালে রক্তচন্দন। যেন সাক্ষাত শিব-স্বরূপ। মহাজ্ঞানী রঘুনন্দন। তার ঢিলেঢালা হাসিখুশী চরিত্রের জন্য সে মোহান্ত হতে পারেনি। সন্ন্যাসীর আখড়া আছে। আবার মঠও আছে। সেখানে মোহান্ত কেউ কাউকে করে দিয়ে যায় না! সন্ন্যাসীরা সবাই মিলে যাকে মোহান্ত করে, সে-ই হতে পারে। কিন্তু মোহান্তের নিজের খুশিতে কাজ চলে না। সন্ন্যাসীদের সকলের মত নিয়ে তাকে কাজ চালাতে হয়। রঘুনন্দনের পক্ষে এসব সম্ভব ছিল না। কিন্তু ধর্মের ইতিহাস ও জ্ঞান পেয়েছিলাম আমরা তার কাছ থেকে। সে জানত আর বুঝত.সকলের চেয়ে বেশী। তার মুখে ওই কথা শুনে আমি ভয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। শুধু বললাম, 'কেন?'

সে বলল, 'আমার কোন উৎসাহ নেই।'

আমি বললাম, 'চক্রে বসলে উৎসাহ পাবে।'

সে বলল, 'তা হয় না কোতোয়ালজী। হৃদয়ের আগল বন্ধ। ভগবান আমার সেবায় খুশি হবেন না।' এমন সময়ে রুক্‌মিণী এসে দাঁড়াল সামনে।

আমাকে নয়, রঘুনন্দনকে নমস্কার করল। রঘুনন্দন বলল, 'নারায়ণো, বেঁচে থাকো।' বলেছিলাম বাবুজী রুক্মিণী এলে যেন আশ্রমে ফুল ফুটে উঠল। তার রূপ, তার সহজ কথা ও নির্মল হাসি, সকলেরই বড় চোখে লেগেছিল। সে একটু চঞ্চল। ঝরনার মত ছলছল তালে চলে। অল্পসময়ের মধ্যেই সকলের স্নেহ পেয়েছিল সে। রঘুনন্দনকে দেখে রুক্মিণী নির্বাক নিথর। চোখে তার আলোর শিখা। তার লজ্জা হল না, জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইল সে। শুধু বাতাসে উড়ছে তার খোলা চুল। বাবুজী, রঘুনন্দনের চোখেও দেখলাম তেমনি আলো। সন্ন্যাসীর মুগ্ধতা! সে তো ভাল কথা নয়; কিন্তু দুজনেই কী সুন্দর। আমি জ্ঞানী নই, সাধনা নেই আমার। তবু আমার মনে হল আমার সামনে স্বয়ং হরগৌরী রয়েছে দাঁড়িয়ে। আমার সময় চলে যায়। যেতে হবে অনেক দূরের আশ্রমে। আমি চলে গেলাম। আজ নবরাত্রের শেষ রাত্রি। জ্যোত্‌মার্গে যান যেসব সন্ন্যাসীরা, তাঁদের অনেককেই সংবাদ দিতে হবে।

ফিরে যখন এলাম তখন সাঁঝ উতরে গেছে। আশ্রম নিঝুম। কিন্তু কাজকর্ম চলেছে ঠিক। তখনো সন্ধ্যাপূজা শেষ হয় নি। মন্দিরে ছিল পাথরের শিবমূর্তি। কিন্তু আখড়া চলে বড় নিয়মে। এ সময়ে সন্ন্যাসীর কর্তব্য হল মানসী পূজা। চোখ বুজে ভাবতে হয় গুরুর মূর্তি। কল্পনায় বসাতে হয় মন্দিরের বেদীতে। নিত্য গুরুদর্শনের ওই পন্থা। গুরুর পা ধোয়াবে, আস্নান করাবে, ধ্যানকল্পে লেপে দেবে তার সর্বাঙ্গে বিভূতি! পুজো করবে ফুল-চন্দন দিয়ে। কী বললে বাবুজী? সন্ন্যাসীর গুরু থাকবে না? সন্ন্যাসীর কি একজন গুরু? তার যে গুরু অগণন। মূল গুরু, শিক্ষা গুরু, বভূত গুরু। সন্ন্যাসীর সাত গুরু। কেউ তাকে দেয় ডোর-কৌপীন, কেউ দেয় বিভূতি। কেউ তার শিখা-মুক্তিদাতা গুরু। ষট্‌কর্মের দীক্ষাগুরু হল আচার্য।

এসে দেখলাম, মোহান্ত স্বয়ং মানসীধ্যানে লিপ্ত। আমাকে বসতে হবে। দেরি হয়ে গেছে। এদিকে হাত-পা-মুখ ভরে গেছে ধূলায়। আখড়ার কিছু সন্ন্যাসীর চোখে-মুখে একটি চাপা আনন্দ ও ব্যস্ততা। নবরাত্রে অংশগ্রহণে খুব উৎসুক তারা। কলিকাল কি-না! সন্ন্যাসী হয়েও সুখের মুখ দেখতে চায় সবাই। আসল সাধক আছে ক-জনা?

ভাবলাম, একবার রঘুনন্দনকে দেখে আসি। মন্দিরের পেছনে গিয়ে দেখলাম মহা-আয়োজন। জনা পাঁচেক আওরত্‌কে দেখলাম, তারা সকলেই গেরুয়া ধারণ করেছে। জনা বারো গৃহী সাধক এসেছে। তারাও পরেছে গেরুয়া কাপড়। সন্ন্যাসীর বেশে সেজেছে সবাই। সকলেই আমাকে নমস্কার করল। আমি জবাব দিতে পারলাম না। এদের এসব আচার-অনুষ্ঠান আমার কোনদিনই ভাল লাগে নি। আমাদের গুহ্য ষট্‌কর্মে কোন-দিনও কোন বাইরের লোক ঢুকতে পায় না। কিন্তু জ্যোত্‌মার্গে বাইরের লোককে ঢোকবার অধিকার দিয়ে গেছে আগের সিদ্ধপুরুষেরা। কবে থেকে জানি নে কিন্তু আমার জীবনে চিরকালই এই নিয়ম চলতে দেখেছি।

যে পাথরের নীচের গুহাঘরে ছিল রঘুনন্দন সেখানটি একেবারে জনহীন। দূর থেকে দেখলাম, অন্ধকার। কাছে এসে ঘরে ঢোকবার মুখে থমকে দাঁড়ালাম। দুটি মূর্তি কালো পাথরের গায়ে রয়েছে লেপটে। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, রুক্মিণী আর তার স্বামী! আরও অবাক হয়ে দেখলাম, রুক্মিণীর গায়ে গেরুয়া বসন। বাবুজী, রুক্মিণী যে এত সুন্দরী, আঁধার যে জ্যোতিতে ভরে ওঠে রূপে, সন্ন্যাসিনী বেশে তাকে দেখে তা বুঝলাম। আমার চোখের পলক পড়ল না কয়েক মুহূর্ত। রুক্মিণীর হাসিতে সম্বিত ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কী চাও?'

রুক্মিণী জবাব দিল, 'আমরা পূজা করব।' আর বলবার দরকার ছিল না। বুঝে নিলাম, রুক্মিণীর সঙ্গে মুখে হোক, মনে মনে হোক, কোন বোঝাপাড়া হয়েছে রঘুনন্দনের।

রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা করবার অবসর মিলল না। দেখলাম দীপ জ্বলে উঠেছে ঘরের দুধারে দুটি। একটি মহাদেবের। অপরটি মহাদেবী কালীর। অন্যান্য সন্ন্যাসী-সাধকেরা এসে পড়ল। সেই সঙ্গে ভৈরবীরূপী আওরতেরা। আরম্ভ হল শিবশক্তি ভৈরবের উপাসনা, তারপরে প্রসাদ খাওয়া। সে প্রসাদ শুধু জ্যোত্‌মার্গের কুলাচারীরাই সন্ন্যাসী হয়েও গ্রহণ করতে পারে।

রুক্মিণী গিয়ে দাঁড়াল রঘুনন্দনের কাছে। রঘুনন্দন তাকে প্রসাদ দিল। তারপর চক্রমধ্যে যা হয়ে থাকে তন্ত্রমতে সে সবই আরম্ভ হল।

পরে দুদিন আর আমার সঙ্গে রঘুনন্দনের দেখা হয় নি। এমন কি রুক্মিণীকেও দেখতে পাই নি। রুক্মিণীর স্বামীকেও নয়। বাইরে থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু এ ব্যাপারের পর আশ্রমে কিছু কিছু অনিয়ম দেখা দেয়। ক্রিয়াকাণ্ডে গণ্ডগোল হয়।

তৃতীয় দিনে দেখলাম রঘুনন্দন গঙ্গা থেকে চান্ করে আসছে। কিন্তু এ সেই আগের রঘুনন্দন নয়। সেই মহাজ্ঞানী হাসিমুখ সন্ন্যাসী নয়। তার সারা মুখে এক অদ্ভুত ভাবের পাগলামি। চোখ আধবোজা। সামনাসামনি হলে বললাম, 'ওঁ নমো নারায়ণ!' সন্ন্যাসীর মত জবাব না দিয়ে রঘুনন্দন আমার হাত ধরে বলল, 'মহাবীর ভাই।' কথাটা বড় কানে ঠেকল। সাধারণ মানুষের মত এমন গদগদভাবে কথা বলছে কেন রঘুনন্দন্। বললাম, 'কী বলছ?'

সে বলল, 'ভাই নতুন জ্ঞান লাভ করেছি।' অমনি আমারও বুকের মধ্যে আনন্দে ভরে উঠল। জ্যোত্‌মার্গচক্রে নিশ্চয়ই কিছু দর্শন ঘটেছে রঘুর। তাকে হাত ধরে আড়ালে নিয়ে গেলাম। যেমন করে ছোট ছেলে খাবার লুকিয়ে নিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী জ্ঞান লাভ করলে?'

রঘুনন্দন বলল, 'তা তো জানি নে।' বলতে বলতে বাবুজী, দেখলাম, তার চোখভরা জল। আর জলভরা মুখে হাসি। চোখের নজর সামনে নেই, পেছনে নেই। উদাসীন স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'শুনেছ?'

বললাম, 'কী?'

বলল, 'শুনতে পাচ্ছ না?'

কান পাতলাম। কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না।

রঘুনন্দন বলল, 'শুনতা নহি চিরিয়া ফুকারতি মিঠে বুলি?'

'হ্যাঁ, চারদিকে গাছে গাছে অনেক পাখি ডাকছে। সে তো সব সময় শুনি।'

সে বলল, 'ওই তো সেই আনন্দ, মহানন্দ! তুমি শোন সব সময়? কই, আমি তো এতদিন শুনতে পাই নি? দেখতে পাই নি ওই আসমান। এমনি পাগল বাতাস তো লাগে নি আমার গায়ে। সহজ করে দেখি নি কোনদিন কিছু। যা সহজ তাই তো সুন্দর। কিছু দেখলাম না, কিছু শুনলাম না, শুধু ছাই মেখে আখড়া নিয়ে পড়ে আছি। জ্ঞান নিয়ে বড়াই করেছি। জ্ঞান

কাকে বলে? বুদ্ধিকে? না, ভুল মহাবীর ভাই। বুকের রস না হলে মাথার ফুল ফোটে না। মাথার সেই ফুলের নাম হল জ্ঞান। শিকড় তার হৃদয়ে। সে হৃদয় আমার অন্ধ ছিল। সে অন্ধ চোখ মেলেছে। যখন প্রাণ মানে না, তখন পূজা আপনি করতে হয়। কিন্তু নিয়মের দাস হয়েছি আমরা। এ আর চলে না। মন্ত্র কি? মন্ত্র কি কেউ শেখায়! সে তো প্রাণ থেকে আপনি উঠে আসে। যে সুরদাস পথে পথে গান গেয়ে বেড়ায়, ওই গানই তো তার মন্ত্র। অমনি সেবা না হলে সব মিথ্যে। আর অমনি সেবা কেমন করে হয়? যখন সহজে চোখে পড়ে বিশ্বরূপ। সেই বিশ্বরূপ তুমি ভাই মহাবীর।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'এসব কী বলছ রঘুনন্দন?'

সে বলল, 'মিথ্যে বলি নি তো। তুমি, এই মাটি, এই বাতাস, জল, ওই গান-পাগল পাখি, ওই আকাশ। এর মধ্যেই সেই রূপ ফুটে রয়েছে, দেখতে পাই নি এতদিন!'

বললাম, 'শিখাসূত্রত্যাগী সন্ন্যাসী তুমি, ষট্‌কর্ম শেষ করে পূর্ণ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত, সপ্তগুরুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কলিকালের আখড়াশ্রয়ী অবধূত, এসব কী বলছ?'

রঘুনন্দন বলল, 'ঠিকই বলেছি ভাই। সপ্তগুরু কেন? গুরু আমার তুমি, এই প্রকৃতি, গুরু আমার রুক্‌মিণী, এই সংসার, সংসারের সব আদমি আর আওরত। যা অপরূপ, তাই গুরুর রূপ। এর শুরু কোথায় জানি নে। জানি নে বন্ধু এর শেষ কোথায়।' বলে সে নিজে নিজে গান গেয়ে উঠল। গানে গানে সে বলল, 'ওই যে গঙ্গা বয়ে চলেছে, কত রূপরাশি তার চোখে। সেই রূপ দেখে তুই নাচতে নাচতে চললি গঙ্গা। কিন্তু যেখানে তোর শেষ, সেখানে তোর শুরু। যার বুকে ঝাঁপ দিলি তুই সে যে অসীম কূলকিনারা-হীন। আমিও তেমনি ঘাটে ঘাটে ভেসে যাব, মন ভরব রূপের হাটে হাটে।' বাবুজী, রঘুনন্দনের এই রূপ যেন বাওরা সন্তের হাসি-কান্নাভরা বিচিত্র ও অপরূপ। ওই গান সে নিজের মন থেকে বানিয়ে গাইলে। আমার মনে হল, যেন ঠিকই বলছে রঘুনন্দন। মনে হল, ঝুটা আমার এই বিভূতি মাখা,

জটা রাখা আর আখড়ায় থাকা। মনে হল, এসব আমার চারপাশের নিগড়। ছুটে ভেঙে বেরিয়ে পড়ি। জানতাম, নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী বলতে যা বোঝায়, রঘুনন্দন ঠিক তা ছিল না। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে তার এই বিচিত্র পরিবর্তন কী করে হল।

সে আবার বলল, 'সব দেখব, তার আগে নিজেকে দেখতে হবে না? মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। এত কথা তোমাদের বলেছি মহাবীর ভাই, তাকিয়ে দেখি মনের আঁধার যে বড় ভারী। সে তিমিরে কিছুই চোখে পড়ে না। নমোমহত্যং। কিন্তু কোন সাহসে নমস্কার করব নিজেকে। খুঁজি, দেখি। এতদিন হরিদ্বারে আছি, তার গাছপাথরটুকুও দেখি নি কোনদিন নিরালায় বসে। মানুষকে মনে করেছি সব ব্যাটা টাকাখোর আর কামুক। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। যে নিজেকে চেনে না, সে পরকে দেখবে কেমন করে।'

সন্ন্যাসীর কথা, অর্থাৎ মহাবীরের কথা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক। সে কি! সন্ন্যাসী রঘুনন্দনের কথা তো দেখছি বাউলের গান হয়ে উঠেছে। এ যে সহজিয়া বাউলের কথা। যেন উঁকি দিচ্ছে বলরাম। রঘুনন্দনের এ সহজ কথা, সহজ ভাব আমার মনকেও নাড়া দিয়ে দিল। হৃদয়ের রস দিয়ে যে জ্ঞানের ফুল ফোটাতে চায় মস্তিষ্কে, রূপে পাগল হওয়া ছাড়া তার গতি কি?

চাঁদ উঠে এসেছে আরও খানিকটা। মাঝে মাঝে মেঘ উড়ে চলেছে চাঁদের মুখ চাপা দিয়ে। হিমালয় থেকে সমুদ্রে, উত্তর থেকে দক্ষিণে তার গতি। মেঘে ছায়া পড়েছে বালুচরে। আলো-ঝিকিমিকি বালু-হাসি চাপা পড়ে যাচ্ছে, যেন আচমকা কপট অভিমানে। কিন্তু কী শীত! আর এখনো কত ভিড়। কত কোলাহল।

মহাবীর আবার বলল, 'বাবুজী, রঘুনন্দন চোখের আড়াল হল। মনে এল আমার কুসন্দেহ। ভুলে গেলাম তার প্রাণভোলানো কথা। মনে করলাম, রঘুচরিত্রে দুর্বলতা ঢুকেছে। কেন? না, তার কথাগুলি যত মনে আসতে লাগল, সবই যেন ওই রূপবতী রুক্মিণীর কথা মনে করিয়ে দিল। ও তো কথা নয়, বুঝি কথা দিয়ে রুক্মিণীর রূপের আরতি। কপনি-আঁটা সন্ন্যাসী আওরতের সর্বনাশী মায়াজালে ধরা পড়ে মাথার ঠিক রাখতে পারছে না।

আশ্রমে এসে দেখি, রুক্‌মিণী। গায়ে তার গেরুয়া নেই। পরেছে নিজের শাড়ি। তার রূপের ছটা আখড়ার ঘরে-মন্দিরে। শুধু দেখতে পেলাম না তার স্বামীকে।

মোহান্ত ডেকে বলল, 'বদরিনাথদর্শনে যাবে না তুমি?'

রুক্‌মিণী হাসল। সে কী হাসি! সারা দেহ ভরে তার এক বিচিত্র আনন্দ যেন ঝরে পড়ছে। রূপ তার দ্বিগুণ আলোয় উঠেছে ভরে। বলল, 'না বাবা! এখানে থেকেই তাকে সেবা করে যাব। তোমরা আমাকে আশ্রমে থাকতে দাও। আমি ভগবানের সেবা করব।'

এরকম অনেক ছিল বাবুজী। ঘর ছেড়ে আসা অভাগিনী চিরজীবন আশ্রমের সেবা করে কাটিয়ে দিয়েছে। আশেপাশের গাঁয়ের অনেক বউ-ঝি সারাদিন কাজ করে আশ্রমে। সন্ধ্যা হলে ফিরে যায় ঘরে। কিন্তু এই আগুন কোথায় রাখা হবে সন্ন্যাসীর আখড়ায়? মোহান্ত জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামী কোথায়?'

বলল, 'তাকে দেখতে পাচ্ছি নে বাবা।'

সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ বললে, 'থাকুক'। আপত্তিও ছিল কারুর কারুর। কিন্তু ব্যাপারটার কোন ফয়সালাই হল না। সে থেকে গেল আশ্রমে।

মুখে কেউ কিছু বলল না; কিন্তু ভেতরে ভেতরে সকলেই কৌতূহলিত। সন্দেহ ঘনীভূত হল। সকলেই চোখে চোখে রাখে রঘুনন্দনকে। আমিও। সবাই ওত পেতে আছি। কবে একদিন ধরে ফেলব রঘুনন্দনের অপকীর্তি।

কিন্তু বাবুজী, রঘুনন্দন সে ধার দিয়েও গেল না। না, সে জটা মুড়োয়নি, ছাড়ে নি বিভূতি-লেপন। কিন্তু সে মানুষটি আর নেই। সকাল-সন্ধ্যায় পূজা-অর্চনায় মন নেই। তার পদে পদে গাফিলতি। সেজন্য কোন অনুশোচনা নেই। বাওরা সন্তের মত দিবানিশি শুধু গান, আত্মভোলা হাসি। ঘোরে এখানে সেখানে। সে ঘোরে বাইরে বাইরে। রুক্‌মিণী ঝাঁট দেয় আখড়ার উঠোন, লেপাপোছা করে, জল তোলে, প্রসাদ পায়। কতদিন গেছি রঘুর পেছনে পেছনে। সে যেত নিরালায়। গান গাইত আপন মনে: 'আমার পাখায় যেদিন হাওয়া লাগবে, সেদিন ছুটে যাব তোমার খোঁজে। কখনো

বসব তোমার গিরিশৃঙ্গে, ভাষা মেঘে ঠোঁট ঢুকিয়ে মেটাব আমার পিয়াস। তোমার এই ভুবনে কানে কানে শোনাব তোমারই রূপগাথা।' গান শোনার জন্য ভিড় করত লোক তার পিছে। তার মত জ্ঞানী পুরুষের এই রূপ দেখে অবাক হল অনেকে!

আমি খালি ভাবতাম, ওই গানের মালা কে পরিয়ে দিল তার গলায়। কে খুলে দিল এই গীত-নির্ঝরের উৎস-মুখ। সন্ধ্যাবেলা মানসীপূজায় বসে, গুরুমূর্তি কল্পনা করতে গিয়ে, বার বার দেখি রঘুনন্দনকে। কানে শুধু তারই কথা,—

ব্রহ্ম নামে একটি ফুল ফুটেছে!
তার গন্ধ পাগল করেছে আমাকে।
সে ফুলের রূপে আগুন আছে।
তবু আমার চোখে জ্বলে নি।
শুধু আমার অন্ধ হৃদয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে বাতি॥

বাবুজী, রুক্‌মিণীর সঙ্গে যখন দেখা হত রঘুনন্দনের, তখন তারা নমস্কার করত পরস্পরকে। কিন্তু রুক্‌মিণী চঞ্চল হয়ে উঠত। বুঝতে পারতাম, রঘুনন্দনের সঙ্গ-কামনায় পাগলিনী হয়েছে সে। লোকলজ্জার ভয় ভুলে কোন কোন সময় ছুটে যেত রঘুর পেছনে। রঘু হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে ফিরে আসতে বললেই ফিরে আসত সে।

বাবুজী, রঘুর প্রতি বিদ্বেষ আসত না কারুর। লজ্জার কথা, যাদের আসত, তারা সকলেই রুক্‌মিণীর প্রতি আসক্ত ছিল। গৃহী শিষ্যকুল আসত ঘন ঘন। নজর শুধু ওইদিকে। আখড়ারও বড় অস্বাভাবিক অবস্থা।

হঠাৎ একদিন আখড়ার সকলেই শুনল, রঘু গাইছে, 'হে ব্রহ্ম ও জ্ঞান, তোমার নাম রুক্‌মিণী। হে পৃথিবী, তোমার নাম রুক্‌মিণী। এই হিমাচল ও গঙ্গা, এই বিহঙ্গ ও গাছ, এই আকাশ ও মাঠ, সকলেই রুক্‌মিণী নামে ও রূপে সুন্দরী। হে অবধূত-হংস, তুমি আসলে দেহস্থিত একটি নাড়ি। তোমারও নাম রুক্‌মিণী। এবার আমি যাব তোমার সন্ধানে। সময় হয়ে গেছে আমার। ডাক পড়েছে।'

বাবুজী, আরও তাজ্জব, নির্ভয়ে রুক্মিণী এসে ফুল, জল, চন্দন দিল রঘুর পায়ে। সকলে স্তম্ভিত। অনেকে রেগে উঠল। মোহান্ত বলল, অন্যান্য আখড়ায় খবর দিতে হয়। আমাদের আছে অনেক আশ্রম, নির্বাণী, নিরঞ্জনী, অটল, জুনা, আনন্দ। সকলের মতামত প্রয়োজন।

কিন্তু দরকার হল না। সেই রাত্রি থেকে রঘু নিরুদ্দেশ। রুক্মিণী রয়েছে। চকিতা হরিণীর মত কেবলি খুঁজছে। সে যাকে খুঁজছে, আমরা, বিশেষ আমি, খুঁজেছি তন্ন তন্ন করে। সারা হরিদ্বারে পাত্তা মেলে নি তার। তাকে কে পাগল করল। বুঝলাম না, কিন্তু সে আমাকে পাগল করে কাঁদিয়ে চলে গেল।

ছুমাস ধরে এই ব্যাপার চলছিল। সকলের মনে যে অস্বস্তিটুকু ছিল রুক্মিণীর জন্য, ছুমাস পরে তার স্বামী এসে সেটুকু দূর করল। তার স্বামী এল। একলা নয়। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক। ছি ছি ছি, আখড়ার বদনাম। সন্ন্যাসীরা জোর করে রেখে দিয়েছে নাকি তার বউকে। তাই সে কেড়ে নিতে এসেছে। যাদের নিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে ছুজন তলোয়ারধারী শিখও ছিল। লোকগুলি যে নিষ্ঠুর প্রকৃতির, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

কে রেখেছে? নিয়ে যাক রুক্মিণীকে! আমারও তাই চাই। কিন্তু বেঁকে বসল রুক্মিণী। সে যাবে না। তা বললে তো হয় না। এ ব্যাপারের পর আখড়া তাকে এমনিতেই সরিয়ে দেবে। বদনাম যা হওয়ার, তা তো হয়েছেই।

শেষে ওরা জোর করে নিয়ে গেল রুক্মিণীকে। বাবুজী, মিথ্যে বলব না, আমার বুকে বড় বেজেছিল। কেন বেজেছিল? তাহলে বলি, কে অস্বীকার করবে, সে ছিল আমাদের প্রিয়তম রঘুনন্দনের সাধন-প্রেয়সী? রঘু-রুক্মিণী যে একাকার হয়েছিল। বাবুজী, কুলাচারে নারীর সঙ্গ-মধ্যে হৃদয় ও প্রেমের মধ্যে কিছু আছে কি না জানি নে। থাকলেও বিশ্বাস করতে মন চায় না। ও শুধু সাধনমার্গের যান্ত্রিক ক্রিয়া।

কিন্তু রঘু আর রুক্মিণী। কুলাচারের চেয়েও প্রেম বড় হয়ে উঠেছে সেখানে। বাবুজী, হৃদয়ের রসহীন যে চারাগাছ উঠেছিল রঘুর মাথায়,

রুক্‌মিণী তাতে ফুল ফুটিয়েছিল। রঘুর জ্ঞান ও হৃদয়ের মাঝামাঝি বন্ধ দরজার চাবি হয়ে এসেছিল রুক্‌মিণী। এর পরে রঘুকে কে কী দিয়ে রাখবে বেঁধে।'

বলে মহাবীর উঠে দাঁড়াল। কথা যে এখানেই শেষ করবে, একেবারে বুঝতে পারি নি। বললাম, 'তারপর?'

'তারপর কী বাবুজী?'

'রুক্‌মিণীর কী হল?'

মহাবীর জবাব দিল, 'কী হল, তা ঠিক বলতে পারি নে বাবুজী। তবে বছর না ঘুরতে দেখলাম, রুক্‌মিণী মনিয়াবাঈ হয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে?'

সে বলল, 'তাও ঠিক জানিনে। যতদূর শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে, রুক্‌মিণীর স্বামীর সঙ্গে যে লোকগুলো এসেছিল তাকে উদ্ধার করতে, তাদেরই কীর্তি এটি। রুক্‌মিণীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি তার স্বামী। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নিয়ে তুলেছিল একটা ডেরায়। শুনেছি, সেখানে ছিঁড়ে খাওয়া হয়েছিল তাকে। আর তার কাপুরুষ স্বামী পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে।

'বাবুজী রুক্‌মিণীকে উদ্ধার করার কিছুই ছিল না। রঘুনন্দন তো আগেই চলে গিয়েছিল। তবু, বদনাম রটে গিয়েছিল আমাদের আশ্রমের নামেই। এমন কি, আমাদের বিভিন্ন আখড়ার দু-একজন রঘুকে খুঁজে ধরে নিকেশ করে দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিল। সেটা যত না আখড়ার দুর্নামের জন্য তার চেয়েও বেশী বিরুদ্ধ ধর্মাচরণের জন্য! কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। তা হলে ঘটনা অনেক দূর গড়িয়ে পড়ত। আর রুক্‌মিণী! তার তো অপরাধের সীমা ছিল না! আখড়ার থেকে তবু-বা তার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। কিন্তু অতগুলো লোকের দ্বারা যে দিনের পর দিন ধর্ষিতা হয়েছে, তাকে কি কখনো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়! সে পালিয়ে বেঁচেছিল। তবে, এর জন্য সে আর ডাকে নি লোক-লস্কর, যায় নি পুলিসের কাছে। জানি নে, কে তাকে প্রতিষ্ঠা করে দিল লক্ষ্ণৌয়ের বাঈজী মহলে। কিন্তু নামে তার সারা শহর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।'

একটু থামল মহাবীর। দাঁড়িয়ে ছিলাম দুজনেই। সে দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দেখেছিলাম একদিন। খুবই কৌতূহল ছিল। সেবার লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। তখন দুনিয়াজোড়া যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। শহরের বাতিগুলো সব বোরখা পরেছিল। অন্ধকার। কানের পাশ দিয়ে একটা কথা শুনলাম, ‘মনিয়াবাঈ দাঁড়িয়ে আছে।’ চমকে উঠল বুকের মধ্যে। কোথায়? ফিরে দেখলাম, সামনে রাজ-ইমারত। দোতালা কুঠি। উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রুক্‌মিণী। রুক্‌মিণী নয়, মনিয়াবাঈ। একটু আলো এসে পড়েছে ঘরের থেকে। দেখলাম, আঁধারে বিদ্যুৎ-শিখা, স্থির। বাড়ির সামনে কয়েকটি মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দোতালার বারান্দায় ছায়ার মত ঘুরছে কয়েকজন লোক। ব্যাপারটা কী হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, ছায়াজগতে এক মূর্তিমতী রূপসী উর্বশী। সেখানে কি অন্য কোথাও বাজছিল সরোদের চাপা বাজনা। পুরুষ গলার চাপা হাসি। কিন্তু মনে হল, বাঈজী যেন অন্য জগতে রয়েছে। কিসের ঘোরে সে আচ্ছন্ন, কিন্তু সে শুধু তার বাঈজীসুলভ অভিনয়। তার রূপ-পাগলদের একটু নাচানো। সরে এলাম তাড়াতাড়ি। রঘুনন্দনের কথা মনে পড়ছিল। আমার রঘুনন্দন।’

থেমে আবার বলল, ‘তারপর রামজীদাসীকে দেখছি আজ কয়েক বছর। জানি নে, এর কী দরকার ছিল। এতে করে ধর্ম কতখানি এগুল, জানি নে। কেন সে ওই জীবন ছেড়ে এল চলে। বাবুজী, মানুষের মন। রামজীদাসী আজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক রহস্যময়ী নারী। তার ধর্মপ্রচারে কতখানি কাজ হবে, আমি বুঝিনে। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, সাধু-সন্ন্যাসী মহলে তাকে নিয়ে রীতিমত আলোচনা হয়। নিজের চোখে দেখে এলেম। সে যে আগুন। আগুনের শিখা। কোন দিন আবার কি প্রলয় উপস্থিত হবে, কে জানে! আমার সেই ভয়।

‘তবে যতদূর শুনি, সে এখন নাকি সবসময়েই নামের ঘোরে থাকে। অষ্টপ্রহর নামকীর্তনই তার কাজ। লোকে বলে, রঘুনন্দনের সঙ্গে নাকি তার দেখা হয়েছিল। সেই থেকে সে এ পথে এসেছে। আমি বিশ্বাস করতে

পারি নি। এখনো করি না। রঘুনন্দন আর রামজীদাসী আকাশ পাতাল তফাত। তাছাড়া আর-একটি কথা শুনেছি…'

মহাবীর থামল। বললাম, 'কী?' মহাবীর বলল, 'গুজব বলেই মনে হয়। ওই যে দেখলেন সরোদ বাজাচ্ছে একটি লোক। ছিল লোকটি একজন সরকারী কেরানী। ভাল সরোদের হাত। ওটি ওর সাধনার জিনিস। ভারী ওস্তাদ বাজিয়ে। কোন বাঈজী ওকে পেলে বর্তে যেত। লোকটি নাকি নিজের ইচ্ছেয় মনিয়াবাঈয়ের ওখানে যন্ত্র বাজাতে যেত। সে-ই নাকি মনিয়াকে এ পথে নিয়ে এসেছে। সকলেই তো কেটে পড়েছে আজ। শুধু ওই লোকটি ছায়ার মত, ওই মিঠে যন্ত্রটি কাঁধে নিয়ে ছায়ার মত ফিরছে রামজীদাসীর সঙ্গে সঙ্গে। শুনতে পাই, লোকটি নাকি খুব ভাল। একরকম মৌনব্রতী বলা যায়। কথা বলে না কারুর সঙ্গে। এমন কি, রামজীদাসীর সঙ্গেও নাকি তাকে .কেউ বড় একটা কথা বলতে দেখে না। ওই সরোদের সুরই তার কথা। ওটি না বাজলে, রামজীদাসীর রাম-ভজনের নাচ আসে না, পা ওঠে না।'

বলে মহাবীর একটু হাসল। বলল, 'বাবুজী, অনেকেই জানে এসব কথা, তাই বললাম। এবার আমি চলি!'

বললাম, 'আপনার রঘুনন্দনের…'

আবার হাসল সে। সে হাসির অনেক অর্থ। বলল, 'আমার রঘুনন্দন। ঝুটা বলেন নি। তবে আমার একলার নয়। আমাদের আখড়ার সুখের সংসারে সে ভাঙন ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বদনামে নয়, একটা নতুন ভাবের ঘোর এনে দিয়েছিল সে।' বলতে বলতে দেখলাম, মহাবীরের মুখে একটি চাপা বেদনার হালকা অন্ধকার চেপে বসল। চাপা গলায় বলল, 'সে যে আমাকে পাখির গান শুনিয়ে গেল, সে যে আমাকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে গেল, সে যে আমাকে এক পাগল প্রেমের পথ দেখিয়ে গেল, সেই হল আমার কাল। বাবুজী, আমি আর সন্ন্যাসী নই। ঘরে ফিরে যাওয়া মনস্থ করেছিলাম, পারি নি। সেই সহজ আর অসীমকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভাবি, সহজ আর অসীম, সে যে বুকের রসে মাথার ফুল ফোটানোর সাধনা।

সে যে বড় যন্ত্রণার, বড় ব্যথার, মহা সুখের, মহা আনন্দের কোনটাই যে খুঁজে পাই নে।

'বাবুজী, কুলাচারীর চক্রসাধনে হৃদয়ের স্থান কতটুকু আছে, জানি নে। কিন্তু এ জৈব-সাধনাই ধর্মান্তরিত করে গেল সন্ন্যাসীকে। ভেঙে দিয়ে গেল তার আচার-বিচার। তন্ত্রসাধনায় অভ্যস্ত হয় নি সে। তার জ্ঞানের সুধা হৃদয়ের রসে মিশে ভেসে গেল। যেমন করে হিমালয় থেকে নেমে ওই গঙ্গা চলেছে দুকূল ভাসিয়ে। প্রেম ও সহজের ওই তো পথ। রুক্মিণীর সঙ্গে রঘুনন্দনের প্রেম ছাড়া আর কী ছিল? কিছু না। নইলে আচারের নিগড় ভাঙত কী করে? তবু ভাবি, একদিনের তো দেখা রুক্মিণীর সঙ্গে। এত আলোড়ন আনল কী করে? কী জানি। প্রেমের কাজই নাকি অমনি। কখন কোনদিকে চলে, কে জানে! গতি তার নিমেষে সব ওলট-পালট করে দিয়ে যায়।'

বলে হেসে উঠল আবার। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'নমস্তে বাবুজী।'

বলে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে পুবদিকে চলে গেল! অদূরেই নয়নজুলির মত একটি অল্পগভীর খাদ গিয়েছে উত্তর-দক্ষিণে। আশেপাশে তখনো চলাচল করছে অনেক লোক। সেই বালি খাদের আড়ালে, লোকারণ্যে হারিয়ে গেল মহাবীর।

সুদীর্ঘ কাহিনী। যেন কোন অতীত যুগের কাহিনী শুনলাম। সব কথার সঠিক অর্থ অনুমান করতে পারি নি। কী করে পারব। আমার নেই কোন অধ্যাত্মবাদের অনুভূতি। নিতান্ত বিজ্ঞানাশ্রিত মানুষ। জীবনে আছে অনেক বিড়ম্বনা। তার মাঝে ফাঁকতালে এসেছি ছুটে। এসেছি জনসমুদ্রের মহাসঙ্গমে।

তার মাঝে এই কাহিনী, যেন কোন অতীত অধ্যায়ের পাতা মেলে দিল আমার সামনে। যে রক্তমাংসের উচ্চ-নীচ মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার, এ কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা সে আওতার বাইরে। বেদাশ্রিত সন্ন্যাসীর প্রেম সে-ই তো বিচিত্র। অথচ চোখে দেখে এসেছি রামজীদাসীকে। অধ্যাত্মবাদ না বুঝি, রঘুনন্দনের সঙ্গে রুক্মিণীর প্রেম অনুমান করতে পারি। যে প্রেম

তাকে ঘরছাড়া করেছিল। ঘর-ই তো। আখড়া, আচার, নিয়ম, পূজা আর খাওয়া, এই মিলে যে অভ্যাসের ঘর তৈরী হয়েছিল, সেই ঘর ভেঙে গিয়েছিল তার।

রঘু-রুক্মিণীর প্রেম আমাদের প্রেম নয়। তবু পুলক-শিহরণে কত বিচিত্র দর্শন তো আমাদেরও ঘটে থাকে। প্রেমে কত নতুন অনুভূতির বীজ অঙ্কুরিত হয় মনে। কত সময়, বেলাশেষের রক্তিম আকাশ দেখে চোখ ভুলে যায়। হাওয়া-দোলা শস্যের হরিৎ সাগরে নিজের প্রাণে প্রাণে লাগে ঢেউ। দূর গ্রামের কোন্ এক অনামী স্টেশনে, ডাগর-চোখো কিষাণী কলাবউটিকে দেখে মনে আমাদের ছোঁয়া লাগে অপরূপের। স্টিয়ারিং হুইল চেপে-ধরা যন্ত্রী, আর উদয়াস্ত কলমপেষা মানুষের দল আমরা আচমকা এক সময়ে গুনগুনিয়ে উঠি,

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না।
মন উড়েছে উড়ুক না রে,
মেলে দিয়ে গানের পাখনা ॥

জানি দিন যাবে না অমনি করে। জানি, মনের রঙীন পাখা মেলে থাকবে না দিবানিশি। তবু, জীবনযুদ্ধের মাঝে, অমনি করেই আমরা হৃদয়ের একটি দিক আঁকড়ে ধরে রয়েছি। হাজার দুঃখ যন্ত্রণা বেদনার মধ্যেও ওই বস্তুটি ছাড়তে রাজী নই।

রুক্মিণীর প্রতি রঘুর প্রেম, আমাদের চোখে কিছু রহস্যময়। রহস্যে ঘেরা। মনো ব্রহ্মেতি ব্যাজনাৎ। কথাটি আমাদের মনে সৃষ্টি করে রহস্যবাদের।

কিন্তু সৌন্দর্য-পিপাসুর চোখে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল। যে দিক তার চোখে বুলিয়ে দিয়েছিল শিল্পীর অঞ্জন। যে চোখ গাছগাছালি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। যে প্রাণ ভুলেছিল বিহঙ্গকুলের গানে। এ তো রক্ত-মাংসেরই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। রঘুর সেই সহজ সুন্দরের উপাসনা, সে তো আছে সকলের মনে মনে। আছে অন্যরকমে। আছে সকল বুকে বুকে। রঙের হেরফের করে আছে।

নইলে ভুলি কেন বাউলের গানে। বাউল তো আমাদের কাছে সাধক নয়। সে শিল্পী। মনের মানুষের খোঁজে সে ফিরছে। ফেরার আনন্দ-ই তার কাছে বড়। সেই আনন্দে গান গেয়ে উঠছে তার মনেরই মানুষ, 'আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই।' সে কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়ে আমরাও 'উঠি যে ফুকারি ফুকারি।'

বুঝলাম, বেদাশ্রিত সন্ন্যাসী রঘু বাউল হয়েছিল। আর রুক্মিণী, রামজীদাসীর অপূর্ব রূপের মাঝে রয়েছে কোন্ রহস্যময়ী, তা কে জানে! বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে এ যেন কোন অতীত যুগের নায়িকা এসেছে এ যুগের মানুষের সামনে। কে জানে তার হৃদয়তলে কোন্ রহস্যের আধার! তার রক্তিম ঠোঁটের কোণে বঙ্কিম রেখায় কোন্ গূঢ়তত্ত্বের উঁকিঝুঁকি।

কিন্তু সরোদ হাতে সেই মানুষটি হঠাৎ বড় হয়ে উঠল চোখের সামনে। সেই সরকারী কেরানী। যে সব ছেড়ে, সরোদের বুকে স্বর বাজিয়ে ফিরছে রামজীদাসীর সঙ্গে সঙ্গে। যার সরোদের ঝঙ্কার বিনা রামজীদাসীর সুঠাম পদযুগলে আসে না নাচের জোয়ার।

বহুরূপী ভারতের এও এক রূপ। এই কাহিনী। যা শুনলাম, তাতে সারা বালুচর যেন এক বিচিত্র ঝাপসা চেহারায় ভেসে উঠল চোখের সামনে।

যাই, ফিরে গিয়ে দেখি আর-এক বার সেই সরোদবাদককে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে হয়তো আসর।

এখনো চারিদিকে অনেক মানুষ। প্রচণ্ড শীত। হালকা কুয়াশায় ছায়ার মত চলেছে সব আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। বোঝা যায়, তাঁবু-কোটরের দিকেই সকলের গতি। আর দেরি সইছে না কারুর। সারাদিনের পুণ্য সঞ্চয় এবার শীতের কামড়ে কাত করে দিয়েছে।

আকাশে চাঁদ এসেছে প্রায় মাঝামাঝি। মেঘ ভেসে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আকাশের কোন সীমানায় গর্জন করছে অদৃশ্য উড়ো জাহাজ।

সপাং করে চাবুকের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বালুচরে ঢুকেছে টাঙ্গা। চাকা বসে যাচ্ছে। ঘোড়া দৌড়ুতে পারছে না। যাত্রী ও যাত্রিণীরা সকলেই

ঘুমে ঢুলুঢুলু! তাকিয়ে দেখি, চাবুক কোমরে গুঁজে টাঙ্গাওয়ালা ঝাঁপিয়ে পড়েছে চাকার উপর। বুঝলাম, একটু বেশী বালির গভীরে ডুবে গিয়েছে চাকা। চাকাটির প্রতি কটূক্তি করে, নিজের হাতে চাকা টেনে টাঙ্গা এগিয়ে নিয়ে চলল সে। শুনলাম, জড়ানো যাত্রীকণ্ঠ, 'ক্যায়া, বিমারীবালা ঘোড়া লে আয়া? ভাড়া ঠিক নহি মিলেগী।'

টাঙ্গাওয়ালা যা বলল, তার মানে, 'হ্যাঁ, কুম্ভমেলায় ভগবান খালি তোমাদেরই ঘাড়ে চেপে রয়েছে। আর আমি শালা খালি হাতে ঘরে ফিরে যাব।'

কোন জবাব শুনতে পেলাম না। টাঙ্গাওয়ালার কথা শুনে হাসতে যাচ্ছিলাম। হাসতে পারলাম না। সত্যি, পুণ্যসঞ্চয় তো নয়, যেন সওদাগর এসেছে স্বর্ণরেণুর সন্ধানে।

ফিরতে যাব। কে একজন সামনে এসে দাঁড়াল। আমার কাছেই এসেছে বুঝলাম। কেন-না, লোকটি তার বড় বড় দাঁত বের করে গোল গোল চোখে তাকাল আমার দিকে। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, খানিকটা চাপা উল্লসিত গলায়, 'কিছু পাওয়া গেল?'

অবাক হলাম। লোকটির আপাদমস্তক দামী শাল দিয়ে ঢাকা। বয়স অনুমান করা মুশকিল। কুহকী চাঁদের আলোয় যেন এক ষড়যন্ত্রীর মুখ ভেসে উঠেছে সামনে। নিশ্চয়ই লোক ভুল করেছে।

বললাম, 'আমাকে বলছেন?'

লোকটি বিগলিত গলায়, ঘাড় নেড়ে বলল, 'আরে মহারাজ, তবে আর কাকে বলব?'

আরও বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কী বলছেন?'

লোকটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে তেমনি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মিলল?'

কী মিলবে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। বরং খানিকটা ঘাবড়েই গেলাম। বললাম, 'কিসের কি মিলবে, বুঝতে পারছি না তো।'

লোকটি এক মহা-বুদ্ধিমানের মত ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'কেন গোপন করছেন মহারাজ। আমি যে সেই অনেকক্ষণ থেকে দেখছি। হুঁ হুঁ,

ফাঁকি দেবেন কী করে? আমাকে তো আর দেবেন না। ওকি আর কেউ কাউকে দেয়? কিন্তু, কিছু পেলেন কি-না, সেইটিই জিজ্ঞেস করছি।'

একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কী য'-তা বলছেন। কার কাছ থেকে কী পাব?'

লোকটি বলল, 'কেন, এই যে দু-ঘণ্টা ধরে সাধুজীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ফিসফিস করে কী বলছিলেন সাধুজী। হুঁ হুঁ, বাবুজী, সব দেখেছি। আপনার কপাল ভাল। তাই ওরকম পেয়েছিলেন। কিন্তু, মহারাজ, একটু বলে যান, কী পেলেন। থোড়া বহুত।'

আশ্চর্য! হাসব কি কাঁদব, বুঝতে পারলাম না। কী বিচিত্র এই লক্ষ মানুষের মেলা।

মনের মাঝে ভিন্ন তরঙ্গ। সেই তরঙ্গে চলেছিলাম ভেসে। ঠেকে গেলাম। মন পাগল হয়েছিল সরোদবাদককে দেখব বলে। যে সরোদ বাজিয়ে ফিরছে রামজীদাসীর পিছে পিছে। বাজিয়ে দেখব, তেমন দুঃসাহস ছিল না। আপনি বেজে উঠেছে আপন মনের তার। তারে টান বড় চড়া। তার মাঝে এ লোকটি যেন ভিন্ন সুরে ঘ্যাং ঘ্যাং করে উঠল! কে জানত, মহাবীরের সঙ্গে কথার ফাঁকে হয়ে পড়েছি তার নজরবন্দী।

আবার বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কী পাব বলুন তো?'

লোকটি ঘাড় কাত করে হেসে বলল, 'আরে বাপরে, সে যদি আমিই জানব, তবে আর ভাবনা ছিল কী?' কিন্তু কী যে পাব, তা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। তাকে যত বলি, কিছুই পাই নি, তত সে চেপে ধরে।

সে বলল, 'ওই দেখে দেখে আমার চুল পেকে গেল ভাইয়া। আমাকে তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না।'

অতএব আমার কালোচুলের কথায় সে মানবে কেন? মনে মনে বললাম শুধু, 'কী বিপদ!'

সে বলে চলল ঘাড় নেড়ে নেড়ে, 'মেলায় ঢোকবার মুখে, বাঁধের ওপারে দেখেছেন মস্তবড় পাথরের দোকান?'

বললাম, 'না তো?'

ভ্রূ নাচিয়ে দুর্বোধ্য হাসি হাসল সে। বলল, 'তবে আর কী দেখেছেন? ওই একটি লোক মশাই। লাখপতি। কে চিনত ওকে? ও তো লক্ষ্ণৌয়ের রাস্তায় ভিখ মেগে বেড়াত।' গলা নামিয়ে বলল ফিসফিস করে, 'তারপরে একদিন দেখি, ব্যাটা এক সাধুর পেছনে ঘুরছে। কী ব্যাপার? না দুদিন বাদে দেখি, শহরে এক ছোট্ট খুপরি ঘর নিয়ে দোকান করেছে। পাথরের ছোট ছোট কটা শিবলিঙ্গ, মহাদেব, বিষ্ণু, এইসব। আরে বাপরে, ক বছরের মধ্যে দেখি, একেবারে একচেটিয়া কারবার করে ফেলেছে। বুঝেছেন? সেই সাধু-সঙ্গ। হুঁ হুঁ, আপনি ভেবেছেন, আমি ব্যাটা কিছু বুঝি নে?'

হাঁ করে রইলাম। গূঢ়-বস্তু-সন্ধানীই বটে। একেবারে পরমার্থ। সিঁড়ি খুঁজছে মোক্ষলাভের। কী ভাগ্যি, রঘুনন্দনের উপাখ্যান পেড়ে বসি নি তার কাছে। সে পরমার্থ যে এখানে অনর্থ ঘটাত।

জানি নে, কী সে অলৌকিক বস্তু। মনের অগোচরে দেখি হয়তো লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু কুম্ভমেলায়? এই বালুচরে? সাধুর পেছনে পেছনে? কই, সেরকম কোন পন্থার কথা তো মনে আসে নি। পাথর কেন? নিজের রক্ত বিক্রি করে লাখপতি হওয়ার কল্পনা করতে পারি নে।

বললাম, 'কই, তেমন কিছু পাই নি তো?'

আকুল স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কী পেলেন?'

মনে মনে বললাম, যা পেয়েছি তা যে বলার নয়। সে তো একটি স্বর। ধরাছোঁয়ার বাইরে। ট্যাঁকে গোঁজা যায় না। পোরা যায় না পকেটে। শুধু কানে শোনা যায়। বললাম, হেসে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'কিছুই পাই নি।'

বুঝলাম, বিশ্বাস করতে পারল না আমাকে। চোখে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুখের হাসিরেখা হয়েছে উধাও। ক্লান্ত জীবের মত বেরিয়ে পড়েছে জিভ। শাল ঢাকা সত্ত্বেও গায়ে তার মৃদু মৃদু কাঁপুনি। এ কি রাগ না হতাশা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এমন সময়, ঝনঝন শব্দে ফিরে তাকালাম দুজনেই। অদূরেই এক বিশালমূর্তি চলেছে পুবদিকে। একেবারেই উলঙ্গ মূর্তি। মাথার জটা ঠেলে

উঠেছে আকাশে। গলায় একরাশ মালা। হাতে একটি সুদীর্ঘ ত্রিশূল। তার গলায় কিংবা ত্রিশূলেই বাঁধা আছে হয়তো কিছু। তারই চাপা ঝনঝন শব্দ বাজছে।

আশপাশের চলমান নরনারী সকলেই একবার থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ কেউ হাত ঠেকাচ্ছে কপালে। চলে-যাওয়া পদচিহ্নের ভেজা বালু নিয়ে দিচ্ছে মাথায়।

আমার সামনের লোকটির গলা দিয়ে একটি বিচিত্র শব্দ উঠল। তা ভয়ের কি পুলকের, বুঝতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখি, সারা মুখে তার হাসির দীপ্তি। হতাশা উধাও। চোখে রোশনাই হাজার আলোর। চকিতে শাল খুলে বাঁধল কোমরে। চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'

তারপর আমার দিকে তার দীপ্ত চোখের একটি খোঁচা দিয়ে সরে গেল। পা টিপে টিপে অনুসরণ করল ওই দিগম্বর মূর্তিকে। ছায়ার মত চলল তার পিছে পিছে। যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, শিকারী চলেছে শিকারের কাছে।

হাসতে গেলাম। হাসতে পারলাম না। বালুচরে তাকিয়ে দেখি লক্ষ লক্ষ পদচিহ্ন। বর্ষার ভেজা মাঠে গোরুর পালের পায়ের দাগের মত লক্ষ মানুষের পায়ের ছাপ সারা চরে। লক্ষ মনে লক্ষ কামনা, বাসনা ও প্রবৃত্তি। সকলেই পাগলের মত ছুটে চলেছে ঈপ্সিত বস্তুর পেছনে।

আর ওই লোকটি। এই সংসারের বেড়াজাল তাকে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিয়েছে। ও-ই তার সাধনা, ধ্যান-ধারণা। তার ভগবান, তার পুণ্য। মিথ্যা সন্দেহে আমার কাছে হতাশ হয়েছে সে। কিন্তু আশা তার মরে নি। মুখে চোখে তার যে হাসি ও দীপ্তি দেখলাম, সে তো শয়তানের মত নয়। শয়তান তাকে পেয়েছে কি-না জানি নে। কিন্তু চোখে মুখে তার শিশুর সারল্য। লোভ? তা আছে। সংসার তাকে ওই পথ দেখিয়েছে। বয়স হয়েছে তার। এতখানি জীবন সে কাটিয়ে এসেছে ওই স্বপ্ন দেখে। হয়তো অবশিষ্ট আয়ুটুকু নিঃশেষ হবে ওই লাখ টাকার পেছনে। সংসারের এমনি নিয়ম। সারা সংসার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে এতদিন। কেউ ফিরিয়ে আনে নি। আজ সময় হয়ে গিয়েছে। স্বপ্ন আজ আর স্বপ্ন নয়, স্বপ্নসাধনা। সাধন-পাগল।

জানি নে তার ঘর ও ঘরের মানুষের কথা। জীবনভোর হয়তো সে এমনি 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলে উল্লাসে বুক বেঁধে ছুটে চলেছে। ছুটবেও ওই ভয়ঙ্করী সুন্দরী মরীচিকার পেছনে। তারপর একদিন আসবে। হয়তো শেষদিন। তার পলকহীন চোখে ফুটে থাকবে অভাবিত বিস্ময়, তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি। দু-ফোঁটা জল।

সেদিন সে সময় তার চোখে ভাসবে কি এ রাতের দৃশ্য? মনে পড়বে কি আমাকে—যে তার সঙ্গে কুম্ভমেলায় সব পেয়েও একদিন মিথ্যাচার করেছিল?

হাসতে পারলাম না। বিদ্রূপে বেঁকে উঠল না ঠোঁট। সে হলেই ভাল হত। নিষ্কৃতি পেতাম মনের কাছে। হেসে চলে যেতে পারতাম পাগল দেখে।

কিন্তু এই মানুষ! ফিরে দেখি, উধাও হয়ে গিয়েছে। মিশে গিয়েছে পায়ের দাগে দাগে। ঝাপসা জ্যোৎস্নালোকিত বালুচরে পাগলা সংসারের প্রেত হয়ে ফিরছে সে। হা হা করে ছুটছে, পেয়েছি পেয়েছি। ভাবি, কোনও এক পাওনা কি একদিন জুটবে না তার কপালে? ঘুচবে না ফাঁকির পাওনা? যেদিন বুক ভরে উঠবে দুঃসহ আনন্দ ও বেদনায়। নিঃশব্দে তার মন গেয়ে উঠবে, পেয়েছি, পেয়েছি।

শীত লাগছে। হিম-ঝাপটা লাগছে পুরু জামা ভেদ করে। কোলাহল ঝিমিয়ে আসছে। দ্রুত পায়ে ফিরে গেলাম আশ্রমের দিকে।

ভাঙা আসর। তবু আসর আছে। রামজীদাসী নেই, সরোদবাদক চলে গিয়েছে। চলে গিয়েছে কীর্তন মণ্ডলেশ্বরের দল। মাইকের সামনে বসে দুটি লোক আধা সুর করে ছড়া কাটছে হিন্দীতে। আসরে কিছু নরনারী, কেউ শুনছে, কেউ ঢুলছে ঘুমঘোরে।

সে ভিড় নেই। গেটের কাছে নেই হাড্‌সন অস্টিন। বাদককে ভাল করে দেখব বলে এসেছিলাম। দেখা হল না।

সেও ঘুরছে একজনের পেছনে। খুঁজছে কি-না কিছু কে জানে? অমনি কোন লাখ টাকার মরীচিকার মত?

ঘুম থেকে উঠে দেখি, কেউ নেই তাঁবুতে। গুলতানি শুনতে পাচ্ছি

পেছনে। জামাকাপড় পরে মুখ ধুতে গেলাম। পেছনটাই দেখছি আসল স্থান। সাংসারিক ব্যস্ততা। হাঁড়ি-কুড়ি উনুন। জলের কলে লাইন। যে রকম ভিড় দেখছি কলে, মুখ ধুতে পাব কি-না কে জানে।

রোদ উঠেছে। রোদ তো নয়, যেন কাঁচা সোনা। শীতে আড়ষ্ট শরীরটি যেন কার দুই উষ্ণ বাহুতে ধরা পড়ল। সরে গিয়ে দাঁড়ালাম বেড়ার সামনে, একলা একলা, খানিকটা রোদ ভোগের জন্য। সরু সরু তল্‌তা বাঁশের বেড়া। বেশ খানিকটা ফাঁক ফাঁক।

রাতে মেলা, দিনে মেলা। মেলা দেখছি অষ্টপ্রহর জেগেই আছে। এর মধ্যেই ভেসে আসতে আরম্ভ করেছে মাইক-নিনাদ। মানুষেরও ভিড় দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে। ভিড় যেন একটু বেশী বেশী লাগছে। এর মধ্যেই টাঙ্গা-ওয়ালার চীৎকার, গাধার ভেঁপু। লরী আর প্রাইভেট কারও দু-চারটে ছুটতে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রাস্তায়। বালুচরে রাস্তা তৈরী হয়েছে। বালুর বুকে সাজিয়ে দিয়েছে বিচুলির মত একরকম ঘাস। তার উপরে মাটি। কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যায় ভাবলে, ওই রাস্তার উপরেও ঝাড়ু হাতে কেন ঝাড়ুদারনীদের উৎপাত। ধুলো ওড়া তো আছেই। মাটিটুকুও যে বালিতেই মিশে যাবে।

ঘোমটা-খসা একদল মেয়ে চলেছে বেড়ার পাশ দিয়ে। কেউ কেউ গান করছে গলা ছেড়ে। কেউ হাসছে খিলখিল করে। মস্ত মস্ত গাই-গোরু নিয়ে চলেছে গোয়ালা। হাঁকছে, দোধ, দোধ চাহি। আর গরম গরম দোধ হাঁকছে, বড় বড় হাঁড়ি কাঁধে দুধওয়ালারা। মুখে গুঁজেছি টুথ ব্রাশ। এ সময়ে একটু চায়ের হাঁক শুনতে পাইনে?

'বাবু! মেরী বাবু।'

চমকে উঠলাম নারীকণ্ঠে। একেবারে কানের কাছে। ব্যাকুল আর ব্যস্ত কণ্ঠ। চকিত, ত্রস্ত।

'বাবু, মেহেরবানি বাবু।'

বলতে না বলতেই গায়ে এসে ঠেকল হাত। বেড়ার ফাঁক দিয়ে। ময়লা হাত, কিন্তু ফরসা। কিছুটা তামাটে। নখে ময়লা। কিন্তু সরু সরু পুষ্ট আঙুল। মণিবন্ধে কয়েকটা রঙিন কাচের চুড়ি।

তাকিয়ে দেখি, একটি মেয়ে। এলো চুল ঘাড়ের পাশে ছড়ানো। পাশ দিয়ে উঠেছে ছোট্ট ঘোমটা। চোখের অস্থির তারা দুটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে হাসি। সরু নাকে ময়লা পেতলের নাকছাবি। সকালের রৌদ্রদীপ্ত মুখে পড়েছে বাঁশের বেড়ার ছায়া। ছায়ার ঝিলিমিলি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাও।'

আঙুল দিয়ে টিপুনি দিল গায়ে। আর-এক হাত স্পর্শ করল কপালে। ঠোঁটে যেন একটু নতুন রোশনাই। একটি বঙ্কিম ঝিলিক চকিতে দিল দেখা। ওই হাসিকে কী নাম দেওয়া যায়, জানি নে।

হাসি মুখে বলল করুণ স্বরে, 'দুঠে পাইসা, মেরী বাবু।'

পয়সা! অর্থাৎ ভিক্ষে। তাই ভাল। ভেবেছিলুম, না জানি কী ঘটতে চলেছে। ভিক্ষে চাওয়ার এ কী রীতি? ঠোঁটে হাসি, চোখে আলো। গায়ে হাত। ভিক্ষের কারুণ্য কোথায়? গলায়? সেটুকু আব্দার বললেই বা ক্ষতি কি?

পকেটে হাত দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম তার আপাদমস্তক। শাড়িখানি মিলের, কিন্তু পাতলা। পালতোলা নৌকা চলেছে কালো পাড়ের ঢেউ তুলে। পরেছে কুঁচিয়ে, ডানদিকে আঁচল এলিয়ে। গায়ে লাল টুকটুকে সস্তা কাপড়ের জামা। একহারা গড়ন। পুষ্ট দেহ। একটু বা বন্য।

ভিখারিনী বটে। পকেটে হাত দিয়ে পয়সা তুলতে না তুলতেই কানে এল আর্ত চীৎকার, 'ওগো সামলাও। সেই সর্বনাশী এসেছে গো, সেই হারামজাদী।'

পরমুহূর্তেই নারীকণ্ঠে কলকণ্ঠের কোরাস! ঘটনাটা কলের কাছেই। ফিরে তাকাবার আগে হাতে উঠে এল দুয়ানি একটি। সেটি ভিখারিনীকে দিয়ে ফিরে তাকাতেই সামনে দেখি নারীবাহিনী। আমি ব্যূহমধ্যে বন্দী। আর বেড়ার বাইরে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের হাসি, যেন সমস্ত কোলাহলকে খান-খান করে হারিয়ে গেল বালুচরে।

প্রথমেই, সেই বিপুলকায়া খনপিসী ঠেলে এল সামনে। বলল, 'ভিক্ষে দিয়েছ বেটিকে?'

সমস্ত ঘটনাটি ঘটল এত চকিতে যে, ঠাহর করতে পারলাম না কিছু। খনপিসীর ভয়ঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। চারদিকে ক্ষুব্ধ সন্দেহান্বিত কৌতূহলী রকমারি মুখ। কোতোয়ালজীও ছুটে এসেছে।

খনপিসী মুখখানা আরও ভয়ঙ্কর করে জিজ্ঞেস করলে, 'দিয়েছ কি-না?'

ভিক্ষে চেয়েছে। মন চেয়েছে দিতে। দেব না কেন? খানিকটা ঝিমুনো স্বরেই বললাম, 'হ্যাঁ দিয়েছি।'

'কত?'

'দু-আনা।'

'দু-আ—না?' খনপিসী চোখ কপালে তুলে খালি বলল, 'মুখ দেখে দিয়েছ বুঝি?' রীতিমত ভর্ৎসনার স্বর তার গলায়।

মুখ দেখে নয়। আপাদমস্তক দেখেই দিয়েছি। কিন্তু অপরাধ?

একটি নারীকণ্ঠের চাপাধ্বনি, 'মা গো! কী বলে দিলে?'

সামনে দেখি ব্রজবালা। দিদিমা। সকলের চোখেই সেই একই দৃষ্টি।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

খনপিসী ঝামটা দিয়ে উঠল, 'কী হয়েছে? ও হারামজাদী যে নষ্ট মেয়ে-মানুষ, চোর, সর্বনাশী, তা জানো না?'

সর্বনাশী? ও! সে-ই, শুধু চোর নয়, ছেলে-চোর মেয়ে! সর্বনাশ! তা জানব কী করে? ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই তো, ভিখারিনীর চোখে মুখে যে অনেক সর্বনাশের দ্যুতি ছিল।

তাকিয়ে দেখি, ছি ছি! সকলের চোখে ছিঃ ছিঃ-কারের তীক্ষ্ণ খোঁচা। তবু, দেখে ভোলবার অবসর পাই নি। কোন রকমে ভিক্ষে দিয়েছি মাত্র। কিন্তু মূঢ়বিস্ময়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কী বা উপায় আছে আমার।

জীবনে এমন বিব্রতবোধ আর কখনো করেছি কি-না, মনে পড়ে না। তাও ভিক্ষে দিয়ে। আগে জানলে পয়সা দিয়ে কে ওই মহৎ কাজটুকু করতে যেত। মহত্ত্বের অমৃতে যে এত বিষ ছিল, তা জানতাম না। জানতাম না, আমার মধ্যে গোপন ছিল এত কলঙ্ক। কালিমা তার ফুটে বেরুবে এতগুলি মহিলার তীক্ষ্ণ চোখের ধিক্কারে।

মুখ থেকে ব্রাশ নামিয়ে, একটা কিছু বলে ব্যাপারটার ইতি টেনে দিতে গেলাম। হল না। ততক্ষণে গুঞ্জনের গতি পরিবর্তিত হয়েছে। বলব কাকে, শুনবে কে। আলোচনা চলেছে নিজেদের মধ্যে, কার চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল এ দুর্ঘটনা। যে যা-ই বলুক, খনপিসীর চোখেই যে প্রথম পড়েছিল, সেটা প্রমাণ করে দিল তার বিপুল দেহ ও সর্বোচ্চ কণ্ঠ।—'ওমা! জল ভরব কী? তাকিয়ে দেখি ছুঁড়ি ফিকফিক করে হাসছে আর কী বলছে।'

যত বলে, ততই সকলের ধিক্কৃত নজর যেন একরাশ তীরের মত এসে বেঁধে আমার সর্বাঙ্গে। যেন প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, সর্বনাশের দাগ আছে আমারও গায়ে। আমার চোখে-মুখে। আমার সর্বাঙ্গে। কারুর খ্যাতি অকলঙ্ক বলে। কেউ কু-খ্যাত হয় কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে। এ দুদিনের মধ্যে বড় একটা চোখে পড়ে নি কারুর। আর সকালের এ সামান্য ঘটনা আশ্রমের সকলের সামনে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমাকে। বিশেষ করে বাঙালী মহলে। তার চেয়েও বেশী নারীমহলে। এমন জাদুকরী ক্ষমতা শুধু কলঙ্কেরই আছে। তাই তো। দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করতে সময় লাগে। লেবুর ফোঁটায় ছানা কাটে চকিতে।

ফিসফিস হল, খিলখিল হল। সাড়া পড়ে গেল। কে আমি। কোথাকার ছেলে। কার সঙ্গে এসেছি। থাকি কার কাছে। কেন-বা এসেছি এ ভরা বয়সে।

জটিল প্রশ্ন, কূট তর্ক, সন্দেহ নেই। অথচ আশ্চর্য! ভিক্ষেই দিয়েছি। সর্বনাশীর মুখখানা তো মনেও পড়ে না। কানে ভাসছে শুধু তার নির্ভীক তীক্ষ্ণ হাসি।

বলরামের হাসিতে ছিল এক বিচিত্র আনন্দ। শ্যামার হাসিতে চাপা বেদনার ছটফটানি। আর এ হাসি! যেন দুস্তর তেপান্তরের সেয়ানা পাখির ডাক। ডাকে তার আচমকা অট্টহাসি কে হো কে হো করে ওঠে। একলা পথিক চমকে তাকায় ফিরে। নিরালা ধু ধু মাঠের অদৃশ্যচারিণী ভয়ঙ্করী খেলায় মাতে পথিককে নিয়ে।

ভাবি, যদি সে মেয়ে না হয়ে পুরুষ হত। চোর হোক, না হয় যদি হত মেয়ে-চোর-ই। হত যদি তেমনি এক সর্বনেশে! তবে কি এমনি করে সবাই মিলে খাউ-খাউ করে আসত আমাকে।

ইস্! তাকানো যায় না ব্রজবালার চোখের দিকে। তার কিশোরী চোখের ভাষা পরিষ্কার, ছি ছি, তোমার মনে এই ছিল! আর ডেকো না আমাকে বৌঠান বলে।

যাওয়ার আগে বলে গেল তার দিদিমা, 'ভিক্ষে দেওয়ার আর লোক পেলে না?'

কোতোয়ালজী হাসল একটু বাঁকা মিঠে হাসি। একটু বা সমবেদনার আভাস। বলল, 'সাংঘাতিক মেয়ে মশাই। চিতাবাঘিনীর মত। চলে ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। দৈনিক এমনি মেয়ে পুরুষ কত ধরা পড়ছে জানেন? পঞ্চাশ ষাট তো বটেই। এক শো জনও হয়। সারা মেলায় সব ওত পেতে আছে। একটু অসাবধান হয়েছেন তো, গেল।'

তারপর একেবারে অ-সন্ন্যাসীজনোচিত হেসে বলল, 'ভাল লোককেই পাকড়েছিল।' বলে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চলে গেল। কি ভাগ্যি, প্রহ্লাদ কিংবা পাঁচুগোপাল নেই। তাহলে সমালোচনার ভাষা আর-একটু সরস হত নিঃসন্দেহে।

ধন্য সর্বনাশী। ঝুসির সর্বনাশী। তাড়াতাড়ি ফিরতে গেলাম তাঁবুর দিকে। কলের দিকে যাওয়ার দুঃসাহস আর হল না। ফিরতে গিয়ে থামলাম!

সামনে শুধু দুটি অতিকায় মুগ্ধ চোখ। পথরোধ করেছে একটি মহিলা। ঘাড় হেলিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মুখের দিকে। চোখে নজর কম। তাই, নজর চড়াতে গিয়ে ঠোঁট দুটি বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গিয়েছে। চোখে মোটা লেন্সের আড়ালে চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠেছে। বলিরেখাবহুল ফরসা মুখ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। পাকা অংশ-ই বেশী। পরনে থান। ফিরতে গেলাম। বলল, 'দাঁড়াও বাবা।'

ঘরপোড়া গোরুর চোখে সিঁদুরে মেঘ। দাঁড়ালাম। কী বলবে আবার!

বললাম, 'কী বলছেন?' জবাব পেলাম না। দেখল খানিকক্ষণ অমনি করে। তারপর কোমল গলায় বলল, 'বেশ করেছ বাবা। দিয়েছ, বেশ করেছ। এখানে এসে দেবে না তো, কোথায় দেবে? আর দিয়ে আনন্দ ভোগ করে কজনা?'

অবাক হলাম। চকিতে মনটিও উঠল ভরে নতুন আবেশে। চারিদিকে এত সন্দেহ ও ভর্ৎসনা, নিজের দুঃখ ও বিদ্রূপ হাসির মধ্যে গুটিয়ে ছিল মনের পাপড়ি। সে যেন নতুন রসে হাওয়া ও রৌদ্রে মেলে দিল দল। কলঙ্কে লাগল গৌরবের স্পর্শ। মুখ ফুটে বলতে পারলাম না কিছু।

সে আবার বলল, 'যে দিতে পারে না, তার চেয়ে দুঃখী এ সংসারে কে আছে বল তো বাবা?'

বলে সে তাকালে, লেন্সের আড়ালে তার সেই বিশাল দুটি চোখ মেলে। একটি লেন্স আবার ফাটা। দেখলাম, তার সেই চোখ দুটি যেন জলভারে টলমল করছে। অথচ সপ্রশ্ন দৃষ্টি। সামান্য কথা, কিন্তু কী যে জবাব দেব, ভেবে পেলাম না।

বোধ হয় পানদোক্তা খায়। ঠোঁট দুটিতে লাল ছোপ। গায়ের রঙটি বেশ ফরসা। আবার হেসে বলল, 'যে দেয়, সে-ই তো নেয়। সংসারে সবাই আসে দিতে। দিতে আর নিতে। আগে দেও পরে নেও, না-কি বল বাবা, অ্যাঁ? মা ছেলেকে দেয়। আবার ছেলের কাছ থেকে হাত পেতে নেয়। বসুমতীকে তুমি দেও, মা বসুমতী তোমাকে দেবে ঘর ভরে। বিদ্বানে তো বিদ্যা দেয়। দেওয়ার চেয়ে সুখ কি আছে?'

মন ভরে উঠল সঙ্কোচে, আত্মধিক্কারে। ভিখারিনীকে দু-আনা ভিক্ষে দিয়েছি। কিন্তু এত বড় দেওয়া, এত মস্ত দেওয়া তো দিই নি জীবনে কোন দিন। সংসারকে কিছু দেওয়া, সে তো আসল দেওয়া। সে দেওয়ার কানাকড়িটি আছে কি-না নিজের কাছে, তা-ই জানি নে। দেব কী! যার আছে থলি ভরতি, সে দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ফিরছি শূন্য থলি নিয়ে। ভরব বলে। পাব বলে। পেলেও দিতে পারে কজন? পাওয়ার গুমোরে মন যে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকে।

কী কথার থেকে কী কথা। কোন দেওয়া থেকে কোন দেওয়ার কথা। একেবারে মাটি থেকে আকাশে। সীমা থেকে অসীমে। মন আপনি খাটো হয়ে এল। নুইয়ে এল মাথা।

সে আবার বলল, 'দেওয়ায় সুখ আছে, বড় ঘেন্নাও আছে বাবা। দিয়ে যার মাটিতে পা পড়ে না। দিয়েছি তো মাথা কিনেছি। ছ্যাখো, ক-ত্তো দিয়েছি। ওই হল ঘেন্না। আবার যার আছে, সে দিতে জানে না। দেওয়ার রীতি জানে না। সে বড় অভাগা। আমি তো এই বুঝি। তুমি কী বল বাবা, অ্যাঁ?'

কি বলব? চোখে তার সেই মুগ্ধ সপ্রশ্ন দৃষ্টি। একটু যেন আত্মভোলা। কণ্ঠে সেই কোমলতা। সকলের আড়ালে কোথায় দাঁড়িয়েছিল সে আমার দু-আনার দানকে গৌরবান্বিত করবে বলে। তার নাম জানি নে, ধাম জানি নে। থুত্থুরে বুড়ি হলে মনে আসে ঠাকুমা দিদিমার কথা। সে তা নয়। যেন খানিকটা মায়ের মত। কথা তার মায়ের চেয়েও বড়। তার গৌরবে ও সম্মানে যে আমি বাক্যহারা। কী বলব?

বললাম, 'যা বলেছেন, এর বাড়া আর-কী বলব?'

সে তাড়াতাড়ি অসঙ্কোচে আমার হাত ধরে বলল, 'না না, অমন কথা বোলো না বাবা। এখেনে এয়েছেন কত বামুন-কায়েতের মা-বোয়েরা। আমার কথার বাড়া সংসারের সব কথা। ছোট কথাটিও। আমি গয়লার বেটি, গয়লার বেধবা। ছেলে আমার যা-ই বলুক, আমি গয়লার মা। লোকে আমাকে হিদে গয়লার মা বলে জানে।'

মনে মনে বললাম, জানুক। যে হিদে গয়লার-ই মা হোক সে, 'হিদয়ে' যার সবকিছু সঁপে দেওয়ার অমন ব্যাকুলতা, তার চেয়ে হৃদয়বতী কে আছে। ভাবি, জানি নে হিদের মা কী দিয়ে কত দিয়েছে। কিন্তু যে অমনি করে বলতে পারে, সে দিতেও পারে। তার কথার বাড়া আর-কি কথা আছে।

হাত-ধরা হয়ে রইলাম হিদের মার। নড়তে পারলাম না। ওদিকে বুঝতে পারছি, খন-পিসীবাহিনী দেখছে এ আদিখ্যেতা। তাদের মধ্যে ঘোরতর আলোচনা চলছে এ নিয়ে।

তারপর হিদের মা বলল, 'তোমাকে বড় ভাল লাগছে বাবা। দিও বাবা, মন চাইলে, থাকলে, অমনি দিও যত খুশি।'

বলে আবার জিজ্ঞেস করল, নাম ধাম পরিচয়। জিজ্ঞেস করল, 'বাপ-মা আছে?'

বললাম, 'বাবা নেই।'

সে বলল, 'আহা, আসলটি নেই। লোকে বলে, মায়ের চেয়ে বড় কিছু নেই। কিন্তু আমি বলি, না। না বাবা। বাপ থাকলে ছেলের মাথায় ছাদ থাকে। কিন্তু মা যে কেউ নয়, কেউ নয়।'

বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোমাকে বড় ভাল লাগছে বাবা। দুটো মনের কথা বলি। বসবে?'

বসব? তাই তো, কেমন যেন লজ্জা করছে। খন-পিসীবাহিনী না জানি কী ভাবছে। কিন্তু হিদের মাকে নিরাশ করতে মন চাইল না। বসলাম বালুর উপরে। বললাম, 'বলুন?'

সে বলল। বলল, 'বাবা, ঘরে জালা তাই বাইরে আসি। বাইরে এসে দেখি আরও জ্বালা। অমনি ঘরে ছুটি। কোথা গেলে যে দু-দণ্ড শান্তি পাই। ঘর বার আমার সমান হয়ে গেছে। বাবা, লোকে আমাকে বলে হিদের মা। কিন্তু হিদে আমাকে মা বলে ডাকে না।'

বলতে বলতে হাসি ও কান্নায় বিচিত্রভাবে থরথর করে কেঁপে উঠল তার ঠোঁট। পুরু লেন্সের আড়ালে ভেসে উঠল বিশাল চোখ দুটি।

প্রস্তুত ছিলাম না এমন কথা শোনবার জন্য। বিস্মিত ব্যথায় চমকে উঠল মনটা। বললাম, 'কেন?'

সে বলল, 'আমি যে মায়ের মত মা নই। আমি যে বউ-কাটকী, আমি যে ছেলে-ভোলানী, আমি যে ঝগড়ুটে, হিংসুটে, লাগানী, ভাঙানী।'

জানি, এর মধ্যে আমার কোন কথা নেই। তবু না বলে পারলাম না, 'কে বলে এসব কথা?'

সে বলল, যে বলার। যাদের বলার। নিজেও বলি। বলি, নইলে যে হিদে আমার হাতে ছাড়া খেত না, সে একবার ডেকে কথা বলে না। তবু

আমি মুখপুড়ি এখনো এ হাত পুড়িয়ে খাই। হিদে আমার লেখাপড়া শিখেছে। কলকাতার আপিসে চাকরি করে। কিন্তু ঝি বলে দুটো পয়সা দেয় না। কেন? আমি যে তার মা নই।'

কিছু বলতে পারলাম না। জানি নে, হিদের কথা। জানি নে তাদের ঘরকন্না। কেন বা পুত্রস্নেহ থেকে বঞ্চিত হিদের মা। সব মিলিয়ে সেখানে কোন্ পরিবেশ, কতখানি অবিচার, কে জানে! তবু, হিদের মার জন্য মনটা ভার হয়ে উঠল।

নিজের মনেই অভিমান করে উঠল সে, 'না-ই বা ডাকল, না-ই বা দিল। নিজে দুধ বেচি, খাই। আমার আছ তোমরা, আমার ভাবনা কি? এই তো চলে এসেছি। কে রাখছে তার খবর, কে দেখছে? ওকে হাতে করে না খাওয়ালে কি হয়েছে আমার?'

চোখের থেকে চশমা খুলে জল মুছল সে আঁচল দিয়ে। বলল, 'দিন রাত-ই বলি, মনে মনে বলি। তোমাকেও বললুম। বড় ভাল লাগল তোমাকে। আমাকে দু-চার আনা পয়সা দেবে বাবা?'

পয়সা? নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার কাছে পয়সা চাইছে হিদের মা? বললাম, 'কী বলছেন?'

তেমনি বিশাল মুগ্ধ চোখ দুটি তুলে বলল, 'আমাকে দু-চার আনা পয়সা দেবে?'

আচমকা আক্রান্ত শামুকের শুঁড়ের মত মন গুটিয়ে গেল হঠাৎ। এত বলে শেষে পয়সা? জিজ্ঞেস করতে গেলাম, 'কেন?' কিন্তু পারলাম না। সেই উন্মুক্ত মুখ, সেই চোখ, তেমনি ঘাড়-কাত-করা সরল অভিব্যক্তি। ভাবান্তরের লক্ষণ নেই কোথাও। তবু সন্দেহে বিরক্তিতে সিঁটনো মন খাটো হয়ে গেল বড়। আমাদের ভদ্রতায়, শিক্ষায়, আলাপনে, ভাবনায়, চিন্তায়, আত্মসন্তুষ্টির যে বেড়খানি দিয়েছি বেড় দিয়ে জীবনের চারপাশে, তার বাইরে গেলেই আমরা পেছিয়ে আসি! দল-মেলা মন আসে গুটিয়ে। গণ্ডিতে আমরা উদার। বাইরে অস্বাভাবিক।

অবকাশ নেই নিজের মন যাচাইয়ের। চিরাভ্যস্ত মন-চোখ আমার দেখল,

হিদের মার এই সারল্যের পেছনে যেন একটি বাঁকা হাসি রয়েছে উঁকি মেরে। এত যে দানের কথা, মিষ্টি কথা, তার পেছনে কি শুধু ওই দু-চার আনার অধ্যবসায়! ভাবলে নিজেকেই যেন খাটো লাগে। কলঙ্কে লাগল আমার দ্বিগুণ অপমানের স্পর্শ। হয়তো এখুনি না চেয়ে, দু-দিন বাদে চাইলে এতখানি মনে লাগত না। দু-দিন কেন, ওবেলা হলেও এতখানি মনে হত না বোধ হয়।

মনের ভাব গোপন করে বললাম, 'দোব। তাতে কী হয়েছে। দিচ্ছি, এখুনি দিচ্ছি।' বলে পকেটে হাত দিতে গেলাম। হিদের মা তাড়াতাড়ি হাত ধরে বলল, 'দিও'খনি। তাড়া কিসের? পালিয়ে তো যাচ্ছ না।'

তা যাচ্ছি না। কিন্তু তাড়া আছে বৈ কি। হিদের মার কাছ থেকে চলে যাওয়ার তাড়া। সে আবার বলল, 'তোমার পকেটে ওটি কী বাবা? কলম? কী যে বলে ওটাকে? যাতে আপনি আপনি লেখা যায়?'

কলমে তার আবার কী প্রয়োজন? বললাম, 'হ্যাঁ, ফাউন্টেন পেন।'

একটু বা অপ্রতিভ হেসে বলল সে, 'হ্যাঁ ফাউন্টেন পেন। হিদে লেখে ওই দিয়ে। তা বাবা, আমাকে একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে। দেবে তো?

মন বিমুখ হয়ে উঠেছিল। তবু বললাম, 'দেব।'

হিদের মা তাড়াতাড়ি কোমরে-গোজা আঁচল খুলে বার করল একটি কাগজ। ভাঁজ-করা, দলা মোচড়া।

খুলতে দেখলাম, একটি দু-আনা পোস্টেজের খাম। আঁচলে তার হাল এমনি হয়েছে যেন কুড়িয়ে এনেছে কোথা থেকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম চলে যাওয়ার জন্য। কৌতূহল হল ভেবে, কাকে চিঠি দেবে হিদের মা। বললাম, 'কাকে লিখবেন?'

সে বলল, 'হিদেকে। একটু জানিয়ে দিই, কেমন করে আমার হাড় জুড়োচ্ছে এখানে এসে। নইলে মনে আমার শান্তি পাব না'।

তা বটে। যাকে যত বেশী দুঃখ দিতে প্রাণ চায়, তাকেই তো দিতে হয় সুখের সংবাদ। তবে, হিদের মার চোখ দুটি অমন ভেসে উঠছে কেন।

তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলাম। খন-পিসীবাহিনী তাকিয়ে দেখছে কটকট করে। ওই দৃষ্টিতে দাহিকা শক্তি থাকলে পুড়ে মরতাম নিঃসন্দেহে। ভাবছি, যখন তারা জানবে, হিদের মাকে পয়সা দিয়েছি, তখন যদি মুখের সামনে এসে তারা হাসে, তবে আর মুখ লুকোবার জায়গা পাব না।

হঠাৎ নজরে পড়ল ব্রজবালাকে। চোখে মুখে তার ক্রোধ ও শঙ্কা। এত লোকের মাঝে তাকাতে পারছে না। কিন্তু ভ্রূ জোড়া উঠেছে কপালে।

পেছনে আমার হিদের মা। তাঁবুতে এসে ব্যাগ খুলে কাগজ বার করছি। পেছন থেকে ব্রজবালা এক ঘটি জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। মুখ ধোয়ার জল।

জলের ঘটি নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই শঙ্কিত গলায় ফিসফিস করে বললে ব্রজবালা, 'সেই কিপটে' বুড়ি। খবোদ্দার, একটি পয়সাও দিও না।'

বলে, ঘটি হস্তান্তরিত করে চলে গেল। হাসি, বিস্ময় ও দুঃখে আমার মনের এক বিচিত্র ভাব। সত্যি, ব্রজবালাই দেখছি আমার প্রকৃত সখী। এই কিপটে বুড়ির কথা, ওই সর্বনাশীর কথা, গতকাল তো সে আমাকে বলেছিল। আমারই মনে ছিল না।

মুখ ধুয়ে বসলাম কাগজ নিয়ে। বললাম, 'বলুন, কী লিখতে হবে?'

হিদের মা খামখানি দিয়ে বলল, 'আগে ঠিকেনা লেখো। লেখো, ছিরি হিদয়রাম ঘোষ।'

অর্থাৎ হৃদয়রাম ঘোষ। ঠিকানা লেখা হল। আবার বলল, 'এই আশ্রমের ঠিকানাটা চিঠিতে দেও। তাই দিলুম। তারপর বলল, 'লেখো, বাবাজীবন, হিদু বাবা—'

বলে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। বুঝলাম, পাতা-ভরতি ইতিহাস লিখতে হবে। এখনো একটু চা জোটে নি এই দারুণ শীতের সকালে। মন ছটফট করছে বেরুবার জন্য। আটকা পড়ে গেলাম। না, নতুন আশ্রমের সন্ধান করতে হবে দেখছি।

হিদের মা বলল হঠাৎ, 'লিখেছ? এবার লেখো, তোর পায়ে পড়ি বাবা ছিদে, নেদো, গোপাল, পারুল, সকলে মিলে কেমন আছিস, ধর্মত জানাস। ইতি তোর শত্তুর—মা।'

ব্যস্? একেবারে ইতি? সে কি? যার মুখের 'পরে জানিয়ে দিতে হবে সুখের কথা, শেষে তারই একটু সংবাদের জন্য এত ব্যাকুলতা? বললাম, 'আর কিছু না?'

সে বলল, 'আর কী আছে বাবা? আমার কথা? পথে পথে, ঘাটে ঘাটে, ঠাকুরের দোরে দোরে বলেছি। না বললেও যে শুনতে পায় সে যখন শোনে নি, তখন চিঠিতে লিখে কি ফল পাব? লেখা বলা অনেক হয়েছে, আর থাক। ওই লিখে দেও।'

তাই দিলাম। লিখে দিলাম। কেবল কানের মধ্যে বেজে রইল হিদের মার ক্লান্ত ব্যথিত স্বর। সংসারে আছে কত সুখ দুঃখ। কত রূপে তা কত করুণ ও বিচিত্র। ঘরে বাইরে, মনের গঠনে, সংসারের কাঠামোতে রয়েছে তার জড়। কখনো তার সমূহ শেষ দেখি কান্নাতে, কখনো হাসিতে। গতিবিধি তার মানুষের হৃদয় ও মনোজগতে। এর বিজ্ঞান আছে, কিন্তু সীমা নেই।

হিদের মা ঠাকুরের দোরে দোরে বলেছে। তাঁর কানে না পৌছুক, সে বলা যদি হিদের কানেও পৌছুত, হিদের মার ঘরে থাকত অমৃতকুম্ভ। হাহাকার করে ছুটে আসত না এখানে। কিন্তু ওইখানে যে সব গণ্ডগোল। সোজা পথ তো সোজা নয়। কখন সে বাঁক নিয়ে নতুন দিকে মোড় ফিরেছে, অচিন পথিক তার কী জানে।

চিঠি লিখে দিয়ে পকেটে হাত দিলাম। বিমুখ মন খানিকটা ভিজে উঠেছিল। পকেটে দু-আনা আছে, চার-আনাও আছে। পথের কড়ি, হাত দিলেই হিসেব করতে মন যায়। জানি নে, ভিক্ষে করা হিদের মার অভ্যাস কি-না। তবু, একটি টাকা তুলে দিলাম তার হাতে। অস্বীকার করব না, মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ করুণা ও অনুগ্রহের ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু না দিলে মন তৃপ্ত হত না।

হিদের মা চোখ তুলে বলল, 'পুরো একটি টাকা দিলে বাবা?'

বললাম, 'হ্যাঁ! তাতে কী হয়েছে।'

হিদের মা আঁচলে বেঁধে বলল, 'বেশ। সকলের কাছে তো চাই নে। যার

কাছে মন চায়। বড় অল্প পুঁজি আমার। বড় ভয় করে, তাই আগে থেকেই সামলে চলি।'

আশ্চর্য! এত সামলাসামলি হিদের মায়ের। তবু দেওয়ার কথায় পঞ্চমুখ সে।

কিন্তু আর দেরি নয়। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে আসতেই, ব্রজবালা। মুখ ভার করে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। মাথায় অর্ধেক ঘোমটা। ও! হিদের মাকে টাকা দিয়েছি বলে রাগ হয়েছে তার। হতেই পারে। সে যে আমার সত্যি সখী। পেছনে আমার হিদের মা। দৃপ্ত ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে তাকাল ব্রজবালা। আমি হাসি গোপন করে চলতে উদ্যত হলাম।

ব্রজবালা বলল, 'দি'মা তোমাকে খেয়ে বেরুতে বলেছে।'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ। আমরা আজ বেরুব।'

খুবই রাগ করেছে ব্রজ। বললাম, 'ফিরে আসি, তারপর খাব।'

সে বলল, 'আমরা এখুনি বেরিয়ে যাব। দেরি হলে, তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া থাকবে তাঁবুতে।'

হেসে বললাম, 'তথাস্তু।' মনে মনে বুঝলাম, ব্রজর রাগ বাগ মানল না তাতে।

এমন সময় হিদের মা চেঁচিয়ে উঠল, 'বউমা। অ বউমা।'

বলতে বলতে ছুটে গেল গেটের দিকে। অমনি ব্রজ আমার কাছে ছুটে এসে বলল, 'ওই যে ওই সে-ই।'

'সে-ই? সেই কে?'

কোথায় ব্রজর রাগ। বয়স যাবে কোথায়। সে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'সেই যে গো, সেই বউটা। সোয়ামী যার সাধু হয়ে বেরিয়ে গেছে। সেই বউ! সঙ্গে ওই লোকটা ওর দেওর।'

ও! মনে পড়েছে। স্বামী-সন্ধানী বউ। তাকিয়ে দেখলাম। দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা। ফরসা রং। বেশভূষায় আধুনিকা। নীল শাড়ির উপরে হালকা

গোলাপী রঙের লেডিজ কোট। ঘোমটা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। তাকিয়েছে এইদিকে। সকালের সূর্যালোকে ঝকঝক করছে কপালের ও সিঁথির সিঁদুর। পাশে একটি ভদ্রলোক, যুবক। স্বাস্থ্যবান। গায়ে অলস্টার, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখে হাসি। হেসে যেন কী বলছে মহিলাটিকে। দাঁড়িয়েছিল হিদের মার জন্য। তারপর তিনজনে মিশে গেল জনারণ্যে।

ব্রজ বলল, 'ওদের দুটিকে বেশ দেখায় না?'

সত্যি দেখায়। ঠিক কথাটি দেখছি বয়স মানে না! কেন বলল ব্রজ, কে জানে। মনে মনে ভাবলাম, দেখায় হয়তো, মানায় কি না কে জানে। মানানো যে আলাদা। কিন্তু, হিদের মা দেখছি ভারি ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

বেরিয়ে এলাম। মেলা তো মেলা। আজ যেন বড় বেশী জাঁকজমক। লোকের আনাগোনাও বেশী। খানিকটা উত্তরে এসে একটি সাইনবোর্ডে চোখ পড়তে থামলাম। বড় তাঁবুর গায়ে সাইনবোর্ড। নর্থ ওয়েস্টার্ন রেস্টুরেণ্ট। ব্র্যাকেটে, ভেজিটেরিয়ান। চারপাশে তার কাগজের ফুল আর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। ঝকঝকে পোশাকে রয়েছে দাঁড়িয়ে বয়।

উঁকি মেরে দেখলাম, লোক নেই। ভেতরটা যেন অন্ধকার, ফাঁকা। ঢুকে তো পড়ি। চা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ঢুকে দেখি, টেবিল চেয়ার পাতা আছে ঠিক। সবই বালির উপরে। কোথাও কোথাও পাতা রয়েছে কাঠের পাটাতন।

বয় এসে দাঁড়ালে ছাপানো মেনু নিয়ে। আবার কি! বালুচরে শহুরে স্বর্গ রচনা হয়েছে।

মেনুর প্রয়োজন ছিল না। বললাম, 'চা আর টোস্ট।'

পরমুহূর্তেই নজরে পড়ল, কোণের চেয়ারে একটি লোক বসে রয়েছে। সামনে টেবিল। টেবিলের উপর ফুলদানি, কাগজ কলম দোয়াতদান। ভদ্রলোক তাকিয়েছিলেন আমার দিকেই। চোখ পড়তেই উপযাচক হয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন। আন্দাজে অনুমান করলাম, তিনি উত্তর-পশ্চিম

রেস্তোঁরার প্রোপ্রাইটর হবেন হয়তো। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রতি-উত্তর দিলাম। দিতেই উঠে এলেন ভদ্রলোক। ইংরেজীতে বললেন, 'অর্ডার দিয়েছেন ?'

বললাম, 'দিয়েছি।'

অপরিচিতের সঙ্গে আলাপে যারা দুরস্ত, গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হয় না তাদের। তাছাড়া, অপরিচিতের সঙ্গে আলাপে যারা আগ্রহান্বিত, আচমকা কোন প্রশ্ন করতেও তাদের বাধে না। একটু হেসে বললেন ভদ্রলোক, 'বাংলা দেশ থেকে আসছেন নিশ্চয়ই ?' কথাটা ইংরেজীতেই বললেন। জবাব দিলাম, 'কী করে বুঝলেন ?'

পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বয়কে যে ভাষায় হুকুম করেছিলেন, তাতেই বুঝলুম আপনি বাঙালী। আমাদের বাঙালী ভায়ারা ওরকম হিন্দী-ই বলেন কিনা।' বলে একটু হাসলেন।—'আপনাকে সেজন্যে দোষ দিচ্ছি নে। শতকরা, শতকরা বাঙালীই তাই বলেন। শুনেই বুঝলুম আপনি বাঙালী।'

বুঝেও না বোঝার মত করেই অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হল, 'আপনিও নিশ্চয়ই বাঙালী ?'

ভদ্রলোক একটু হেসে, বসে পড়লেন আমার পাশের চেয়ারে। ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে নিয়ে ইংরেজীতে বললেন, 'কী মনে হয় ?'

পালটা প্রশ্ন শুনে বিব্রতভাবে হেসে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। রীতিমত চ্যালেঞ্জের হাসি তাঁর স্থূল ঠোঁট দুটিতে। বোধ হয় সে অধিকারও ছিল তাঁর। কারুর মুখ থেকে পরিষ্কার বাংলা শুনে যদি তাকে বাঙালী বলা যায়, তাহলে ইনিও বাঙালী নিঃসন্দেহে। কিন্তু চেহারার কোথাও সে ছাপ নেই।

লম্বায় প্রায় ছ-ফিট লোকটি। কপালটি রীতিমত চওড়া। কপালের ঠিক মাঝখান থেকে, তীরের মত ওল্টানো ও কোঁকড়ানো চুলের অগ্রভাগ ঘাড়ের কাছে বাবরি পাকিয়ে উঠেছে। রংটি ফর্সা, কিন্তু পোড়া তামাটে খানিকটা। সবচেয়ে দ্রষ্টব্য হল তাঁর কপালে ও গালে কয়েকটি গভীর রেখা। হাসিতে অমায়িক, রাগলে ওই মুখ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। পোশাকে, যাকে বলে ফোতো সাহেব। ময়লা জামা, তেলচিটে টাই আর লক্ষ্য করলে

দেখা যায় পোকা-খাওয়া ছিদ্র-জর্জরিত কোট। সব মিলিয়ে বাঙালী বলা মুশকিল।

বলতে গেলাম, অবাঙালী। কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম। ঠোঁটের হাসিটুকু ছিল না চোখে। ছোট গম্ভীর সেই চোখ জোড়াতে উঁকি দিয়ে রয়েছে যেন আর-একটি মানুষ। এক ঘরছাড়া, দিকহারা, ঝোড়ো দিনের এক বাউণ্ডুলে পথিক। বলে ফেললাম, 'আপনি বাঙালী।'

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে, 'রাইট ইউ আর মাই ব্রাদার। হাত দিন, হাত দিন। অবাঙালীরা আমাকে বাঙালী বলে চিনতে ভুল করে না। কিন্তু দেশী লোককে জিজ্ঞেস করলেই আমাকে অবাঙালী বলে বসে।' বলে হাত বাড়াবার অপেক্ষা না করেই ওঁর মস্ত থাবাটি দিয়ে টেনে নিলেন আমার একটি হাত। তারপর চীৎকার করে উঠলেন, 'হোই রামাইয়া ?'

নামের শেষে একটু বিসর্গজড়িত দ্রুত আকস্মিক ছেদ। অর্থাৎ রামাইয়াঃ। হাঁও নয়, হুঁও নয়, অদ্ভুত শব্দের জবাব এল তাঁবুর ভেতর থেকে। ভদ্রলোক দ্রুত দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে উঠলেন। তেমনি ভাষায় জবাব এল ভেতর থেকে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম ভদ্রলোকের দিকে।

সন্দেহ হল। সত্যিই বাঙালী তো লোকটি। না কি স্রেফ ভেলকি ? এ আবার কী ভাষা বলছেন ভদ্রলোক ?

বাহাদুরির ভঙ্গি নেই। চাপা উল্লসিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাষা বললুম, বলতে পারেন ?'

বললাম, 'না।'

'তেলেগু ভাষা। আপনার চা দিতে দেরি হচ্ছে কেন, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। ও বললে, আপনার রুটি সেঁকছে।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই চা এসে পড়ল। ট্রের উপরে সাজানো সবই আলাদা আলাদা। এমন কি মাখনটুকুও। ভুলেই গিয়েছিলাম, ঢুকেছি

এক সভ্যতাতুরস্ত রেস্তোরাঁয়। টি-পটের ঢাকনা খুলে দেখি, কাপ তিনেক চা আছে। বয়কে বললাম, 'আর-একটি কাপ দাও।'

প্রোপ্রাইটর বললেন, 'কেন?'

বললাম, 'চা খান।'

'না না না।'

অভদ্রতা প্রকাশ পেল কি না জানি নে। তবু বললাম, 'না কেন? এত চা কে খাবে? দুজনের মতই রয়েছে।'

ঠোঁট উলটে বললেন উনি, 'ও মশাই বাঙালীদের পক্ষে। নইলে, ওটুকু চা আবার একজন কি খাবে। বেশ, আপনাকে আমি সিঙ্গল কাপ দিতে বলছি।'

আমি ওঁর মত বলে উঠলাম, 'না না না। আমি আপনাকে আমার টেবিল-সঙ্গী হতে বলছি। আসুন না, চা খেতে খেতে গল্প করা যাক।'

'ও! আমাকে খাইয়ে-ই পয়সা উশুল করবেন।'

বলে হা হা করে হাসি। দরাজ গলায় হাসি। চকিতে ইশারা করলেন বয়কে। বয় কাপ এনে দিল। বললেন, 'তাহলে আমি চা-টা পরিবেশন করি আর আপনি ততক্ষণ রুটি খেতে থাকুন।'

তাই হল। চা তৈরী করতে করতেই বকবক করে চললেন উনি, 'মশাই, খাবার বিষয়ে কখনো খুঁতখুঁত করবেন না। ভারি খারাপ জিনিস। আগে আমার ওরকম ছিল। একবার কি হল জানেন? তখন ছিলুম করাচীতে। পাকিস্তান হওয়ার আগে। শহর খুব ফিটফাট। রাজপথে একটি ভিখিরী দেখতে পাবেন না, এমনি কড়া আইন। ভিতরে যান, বারাকপুরের বস্তি অঞ্চলকে হার মানিয়ে দেবে, এত নোংরা। বিশেষ হাবসী পাড়ায়। যেমন নোংরা, তেমনি দুর্দান্ত। মারামারি তাদের কথায় কথায়। বন্দরের এক হাবসী কুলি-সর্দার ইয়াকুব ছিল আমার বন্ধু। সে একবার নেমন্তন্ন করে বসল তার ঘরে। খেতে গেলুম। আরে রাম রাম রাম। মশাই দশ দিনের বাসি হাতরুটি, সাদা সাদা পোকা দেখা যাচ্ছে। তেমনি দুর্গন্ধ। তার উপরে, মাংস বলে যা এল, সে আর চেয়ে দেখা যায় না।

কালো রং, বোধহয় কোন শাক-শবজী ছিল, আর কতগুলো নাড়ি-ভুঁড়ি। তার ওই নোংরা পাজামা দিয়ে রুটি ঘসে তুলে দিল আমার হাতে। কী করি। দ্বিরুক্তি করছি দেখে সে বিদ্রূপ করে বলল, 'বাঙালী শুনেছি, কলাগাছের ছাল খেতে ভালবাসে। মাংস-রুটি পেয়ার করে না তারা।' কথাটা বড় লাগল। বাঙালীকে খোঁচা? তাও এই অমৃত-সমান মাংস রুটি দিয়ে? ভাবলুম, মরার বাড়া ভয় কি? খেয়ে ফেললুম। পেট ভরেই খেলুম। রাস্তায় এসে তুলে ফেললুম সব গলায় আঙুল দিয়ে। তারপর একদিন নেমন্তন্ন করলুম তাকে। ব্যবস্থাও করেছিলুম তেমনি। দু-দিনের পচা পান্তাভাত আর ঝোলা গুড়। খা, কত খাবি।'

বলে ভদ্রলোক ঘাড় কাত করে তাকালেন আমার দিকে। গম্ভীর বিস্ময়ে স্থানচ্যুত হল তাঁর মুখের রেখা। বললেন, 'মশাই, বেমালুম খেয়ে ফেললে? তারপর দিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে। মাইরি, কী বলব আপনাকে, লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলুম। আবার যাওয়ার সময় কী বলে গেল জানেন? বললে, 'বহুত বঢ়িয়া চীজ খিলায়া দোস্ত।' বুঝুন ব্যাপারটা। তাই বলছি, বাইরে যখন বেরুবেন বাইরের মতন হয়ে বেরুবেন। অবিশ্যি চা আপনি কম খান তাতে কিছু নয়। কিন্তু বাঙালী বলে সব জায়গায় নিজের রীতিনীতির খুঁটি আঁকড়ে থাকব, তা করতে গেলে ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন। তা হলেই গলায় আঙুল দিতে হবে। আরে মশায়, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়। এ তো বাঙালীই বলে।'

পেটরোগা খুঁতখুঁতে বলে দুর্নাম আছে বাঙালীর। আমি তার বাইরে নই। তিন কাপ চা একলা খেলে আমাকেও যে গলায় আঙুল দিতে হত। বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ। তবু, আপাত মূল্য আছে এঁর কথার। প্রতিবাদ করতে পারলাম না। বিশেষ, এঁর বাঙালী-জেদ, আর হাবসীর পান্তা-প্রীতির কথা শুনে। যে বাঙালীকে তিনি বিদ্রূপ করতে চান, সেই বাঙালী নামের জন্য সামান্য এক হাবসী কুলির পচা রুটি-মাংস খেতেও পেছপা হন নি।

কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলে উঠলেন আবার, 'বিদেশে কোন বিষয়ে পেছিয়েছেন তো, আপনি গেলেন। অমনি সবাই যো পেয়ে যাবে। ডেঁটে থাকতে হবে। যখন যেমন, তখন তেমন। লে আও তোমার কি খানা আছে। অত পটপট কিসের? সত্যি, অনেক অখাদ্য খেয়েছি। কিন্তু বমি কোনদিন করি নি আর। থাকগে যাক, ভায়ার নামটি কি, শুনি?'

গায়েপড়া অন্তরঙ্গতার হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে মুখে। স্বর ছড়াল চায়ের টেবিলে। টাইপ আসর-জমানো লোকের মত 'ভায়া' শব্দটি তাঁর মুখে একটুও বিচিত্র ঠেকল না। নাম বললাম।

'বেশ বেশ। তা এলাহাবাদে কি কোন আত্মীয়স্বজন আছে?

'না।'

'কোথায় উঠেছেন?'

আশ্রমের নাম বললাম।

আশ্রমের কথা শুনে আবার তাঁর মুখে একটু চাপা হাসির লক্ষণ দেখা গেল। যেন কতদিনের বন্ধুত্ব, কতদিনের পরিচয়। এমনি অন্তরঙ্গ স্বরে, একটু রহস্য করে বললেন, 'তা ভায়া, এ বয়সে এত বৈরাগ্য কেন?'

বললাম, 'বৈরাগ্য নয়। মন টানল, তাই চলে এলাম। দেখব আর ঘুরব বলে বেরিয়ে পড়লাম।'

চা খেতে খেতে বললেন, 'কোথায় ঘুরবেন, আর কী দেখবেন?' মুখে তাঁর কৌতূহল ও বিস্ময়। যেন ঘুরবার দেখবার কিছুই নেই।

বললাম, 'যা দেখি নি, যেখানে বেড়াই নি, সেই সবই দেখব, সেখানেই বেড়াব।'

ভদ্রলোক তাঁবুর আধো অন্ধকার কোল থেকে কয়েক মুহূর্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন বহুদূরে কী দেখছেন। চোখে তার সেই আলো-ছায়ার খেলা। তারপর হঠাৎ বললেন, 'দেখুন, আমি সত্যি মুখ্যু মানুষ।

কী বলতে কী বলে ফেলব। অনেকদিন আগে একটা জাপানী কবিতার বাংলা অনুবাদ পড়েছিলুম।

‘কি করি কোথা যাই,
কোথা গেলে শান্তি পাই ?
ভাবিলাম বনে গিয়া,
জুড়াব তাপিত হিয়া।
শুনি সেথা অর্ধরাত্রে,
কাঁদে মৃগী কম্প্র গাত্রে ॥’

বলে তিনি চুপ করে গেলেন। মনে হচ্ছিল, একটা চাপা গভীর অথচ তীব্র আর্তনাদ শুনছি কাছে। তার মধ্যে অনুরণিত এক ঘোর অস্থিরতা। কিন্তু শান্ত। তারপর আচমকা চুপ করে গেলেন। যেন নিঃশব্দ রাত্রে এক পোড়ো বাড়ির দেউড়ি একবার ককিয়ে উঠে থেমে গেল। তারপর অসহ্য নিঝুমতা, অন্ধ নিঃশব্দ রাত্রির আড়ষ্টতা।

বাইরে কোলাহল। তাঁবুর আশেপাশে গণ্ডোগোল চীৎকার। সে কোলাহল-ধ্বনি যেন ঝিঁঝিঁ-র ঝিল্লিরব। বাইরে রৌদ্রালোকিত রুপালী বালুচর। আর কালো রঙের তাঁবুটার মধ্যে এখনো অন্ধকার লেপটে রয়েছে কোণে কোণে।

তাকিয়ে দেখি সামনে আমার নতুন মানুষ। তার বিশাল তামাটে মুখটা উঁচুনীচু। যেন কোন্ দূর পাহাড়ের গড়িয়ে-পড়া এক লাল পাথর। গভীর ফাটলের মত মুখের রেখাগুলি তার গভীরতর। চোখ দুটো পাথরের মূর্তির চোখের মত নিষ্পলক, উদ্দীপ্ত অথচ অন্ধকার। যেন এই শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে বহু যুগ যুগান্তের রোদ বৃষ্টি ঝড় বয়ে গিয়েছে। পোড়া, ধোয়া, জলা।

কী বলব ভেবে পেলাম না। উনি এমনভাবে চুপ করলেন, সেটি যেন আর-এক জনকে চুপ করিয়ে দেওয়ার মত। আমার ঘরছাড়া অবারিত মন, আকুল আগ্রহে মেলে রয়েছে দু-চোখ। ডানা মেলে রয়েছে মুক্ত বিহঙ্গের মত। উৎকর্ণ কান, মনের মাঝে উত্তুঙ্গ-মর্ম। মনোবীণার তারে অজানা

সুরের ডাক। তাকে যেন দু-হাত মুঠি করে চেপে ধরলেন ভদ্রলোক। আড়াল করে দাঁড়ালেন আমার দিগবিদিক-ছোটা পথের সামনে। কী বলব।

এত লোক, এত নারী আর পুরুষ, শিশু আর বৃদ্ধ এসেছে সারা দেশ থেকে। আমিও এসেছি। কে ডাক দিল জানি নে। কী বলে ডাকল, কী সুরে বাজল সেই ডাকের সুর, তাও বুঝি নি। এ যেন সেই রাধার উক্তির মতই, খেতে সাধ নেই, শুতে আনন্দ নেই। কোন্ অতৃপ্তি রেখেছিল চার-পাশ থেকে ঘিরে, তাও খুঁজে দেখি নি। মন বলল, রইতে নারি, আর রইতে নারি ঘরে। মন ব্যাকুল হয়েছিল। তারে ঝঙ্কার দিল আগ্রহের অঙ্গুলি। তাই বেরিয়ে পড়েছি। দেখব, ঘুরব, আশ মেটাব। কিন্তু বিচিত্র বেশে এ কোন্ হরিণী সজাগ চোখে দাঁড়াল আমার সামনে। নিজের মাঝে ছিল অতৃপ্তির কত গভীর উৎস, ভেবে দেখি নি। কিন্তু এ যে অতৃপ্তির সমুদ্র। বুকে যার তীব্র গোঙানি, স্বাদ যার কটু ও লবণাক্ত।

কবিতা চীনে কি জাপানী জানি নে। হৃদয়ে যে ভাষা জোগায়, সে কাব্যের কোন জাত নেই। সে কাব্য সকল মানুষের। মনে পড়ল, কবে একদিন পাড়ার মুদীখানায় বসে শুনেছিলাম এক পথচারী গায়কের গান,

"কত ঘাটে ঘাটে বাঁধলাম নৌকা,
তোমার দেখা পেলাম না,
যারে শুধাই, এক জবাব পাই
'কার কথা কও, কোন্ জনা?'
শুধায় সবে, শুধাই আমি
শুধাই বনে বনে,
(হায়রে) বনও কাঁদে, কয় আমারে
'তার দেখা পেলাম না' ॥"

সেই একই হাহাকার। তবু কে বসে থাকবে নিশ্চেষ্ট হয়ে? ঠাঁই নেই, তবু বুকে হাত রেখে বসে থাকব কোন্ সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে? এক তারার পাশে আর-এক তারা, তারপরে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, অসংখ্য।

চোখ মানে না। মন বাধা মানে না। বলরামের কথা মনে পড়ে গেল। আর আমর এই ঘরছাড়া চোখ দেখেছে শ্যামকে। হাসিতে তার সেই মধ্যরাত্রির বিরহিণী হরিণীর কান্নাও বুঝি ছিল। শুনব বলে আসি নি। না এলে যে শুনতেও পেতাম না কথা বলতে গেলাম। উনি বলে উঠলেন, 'যেখানে যাবেন, এটি তো সঙ্গে যাবেই ?' বলে, তাঁর বুকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তারপর বললেন, 'এ কি কখনও ভরে ?'

বললাম, 'ভরে না বলেই তো !'

অতবড় মানুষটা। হাসিতে কী করুণ ও নিরীহ। বললেন, তবুও ভরতে হবে। কিন্তু ভায়া, ও তো কখনো ভরে না। এ সংসারে কার আছে ভরা ভাত, জানি নে। নিজেরটা তো দেখি, ফুটো পাত্র। যত ভরি, সে তত ঝরে। হিন্দীতে একটা গান আছে জানেন। যমুনা থেকে গাগরি ভরে ভরে বারবার জল নিয়ে এলি তুই ছোকরি, কিন্তু কি তাজ্জব! ছল্‌কে ছল্‌কে বারবার তোর সব জল পড়ে যায়। তুই আবার ছুটিস যমুনার পানে। বলি, এ কী তোর ভরানো ঝরানো খেলা ? যমুনার কালো জল কি দুরন্ত ছেলের মত এতই দুষ্টু যে, সে কিছুতেই তোর কলসীতে থির হতে চায় না ?' বলে হেসে উঠলেন। একটা তীব্র কনকনে হাওয়া ঢুকল তাঁবু দুলিয়ে। চকিত ফণার মত উঠল তাঁর তেলচিটে টাইয়ের অগ্রভাগ! বললেন, জন্মে যা ভরে নি, মরণে কি সে ভরবে ? তবু—

বলে এক মুহূর্ত থেমে নিজেই বললেন আবার, 'তবু মন মানে না, কি বলেন ? আগে বোঝাপড়া ওর সঙ্গে, তার পরে তো সব ? আপনাদের সেই খ্রীষ্টান কবির কথা মনে আছে তো ?'

"আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে ?"

আমাদের খ্রীষ্টান কবি বটে। কিন্তু মুখস্থ দেখছি ওঁরই আছে বেশী। আচমকা একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, বড় খারাপ নেশা ভাই। এই

পথের নেশার চেয়ে খারাপ নেশা আর কিছু নেই। এ ডেকে নিয়ে এসে ছেড়ে দেয়, আর ডাকে না, পেছন ফিরতেও দেয় না।'

বলে এক চুমুকে ঠাণ্ডা চায়ের কাপটি শূন্য করে দিলেন। আমার চায়ের পাট ফুরিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু আটকা পড়েছি আপনা আপনি। যেচে আলাপ করতে এলেন উনি। কিন্তু ওঁর রূপ ও কথা কী গুন্ করল আমাকে, যেচে বিদায়ের কথা পারলাম না বলতে। শুধু তাই নয়। ওঁর চোখের ওই দূরবিসারী দৃষ্টি, মুখময় ঝড়ের দাগ আর অসহায় হাসি মনের মধ্যে যুগপৎ অকারণ একটু ব্যথা ও কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার দেশ কোথায়?'

জিজ্ঞেস করতে আবার হেসে উঠলেন। এবার অট্টহাসি বলা চলে। বললেন, 'চায়ের আসরটা তা হলে জমেছে ভালো, কী বলেন? দেশ তো ভাই আমার নেই। ঘরকে পর করেছি, পরকে ঘর। এখন সবই দেশ বলে মনে হয়। তবে জন্মেছিলুম বাঙলার এক গাঁয়ে। আঠোরো বছর বয়সে সে গ্রাম ছেড়ে এসেছি। তারপর দেশ থেকে দেশান্তর, যাকে বলে দেশান্তরী।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার বাবা মা আত্মীয়স্বজন, তাঁরা কোথায়?'

'বাবাকে ভাই কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মাকেও হারিয়েছি অল্প বয়সেই। আঠারো বছর পর্যন্ত পেলেছিল এক মাসী। মাসী মারা গেল। তার ছিল কিছু জমি-জমা। দেখলুম, আমার মত অনেক বোনপো ভাইপো রয়েছে মাসীর। তারা এসে দাবি করল ঘর বাড়ি জমি গোরু বাছুর। বিশ্বাস করবেন কি না জানি নে। বেঁচে গেলুম। ভেবেছিলাম, কাকে দেব? ভাগীদারের সংখ্যা দেখে চিন্তা ঘুচল। আর আঠারো বছর বয়স। সে যে অথৈ সমুদ্র। তার কুলকিনারা নেই।'

বলতে বলতে তাঁর সমস্ত মুখখানিতে স্বপ্ন নেমে এল। জানি নে, এ শুধু তাঁর আসর-জমানো কথা কি-না। কিন্তু তাঁকে যে কোন নিশি পয়েছে, সে চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখের গভীর রেখায় রেখায়। বললেন, 'ছোটকালে বাঁশঝাড় দেখিয়ে মা বলত, খবরদার, ওদিকে যাস নি। কিন্তু বড় বড় চোখে সারাদিন তাকিয়ে থাকতুম বাঁশবনের ঝুপসি ঝাড়ে। আপনি বাংলাদেশের

ছেলে। জানেন নিশ্চয়ই বাঁশঝাড়ের হাওয়ায় কি এক 'আয় আয়' ডাক শোনা যায় অষ্টপ্রহর। লোকে শুনলে হাসবে, আমার মুখে কাব্যি? কাব্যি নয়, এখনো কানে লেগে রয়েছে সেই ডাক। বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে দেখতুম ধূ ধূ মাঠ। কে যেন আমাকে ডাকত ওই মাঠ থেকে। বিশ্বাস করুন। আমাকে ডাকত। লেখাপড়া করতে পারি নি। যেমনি পাখা গজাল, মানে একটু বয়স হল, অমনি পালিয়ে গেলুম মাঠের উপর দিয়ে। আস্তে আস্তে ভয় ভেঙে গেল। মাসী কাঁদত, মাসী আমাকে বেঁধে রেখেছিল। তারপর যেদিন মাসী ছেড়ে দিয়ে গেল সেইদিন, সেইদিন কে-ই বা তৈমুরলঙ্গ, আর কেই-বা চেঙ্গিস খাঁ। বেরিয়ে পড়লুম দিগ্বিজয়ে। শুধু একজনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম গিয়ে। সে ছিল আমার সোনার বাঁধন। মাসী ছিল রক্তের। জানেন তো, মানুষের ব্যাপার! রক্তের চেয়ে দামী সোনা। তাকে ছাড়াতে পারলে যেন সব ছাড়া গেল। সে কোন কথাই বলে নি। শুনল, তাকাল, তারপর ঘাড় কাত করে জানাল, যাও। চলে গেলুম। কেন যাচ্ছি, কিসের দিগ্বিজয়, কিছুই জানতুম না। তবু বেরিয়ে পড়লুম। সেইদিনটি ছিল আমার বড় আনন্দের দিন, আর আজ ভাবি, কী ভয়ঙ্কর, কী সর্বনাশের দিন ছিল সেটি!'

আমি নিতান্ত বোকার মত জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?'

জিজ্ঞেস করতে করতেই তাকিয়ে অবাক হলাম। একি, এত অজস্র রেখা তাঁর মুখ-ভরতি!

যেন একরাশ শুকনো দগ্ধ বর্ণের তৃণকুটার মুখ একটি। চোখে ব্যক্ত অব্যক্ত যন্ত্রণা। বললেন, 'কেন? কেন নয়? কোন্ নিশি ডেকে নিয়ে এল আমাকে, এখন মাথা খুঁড়ে মরছি। ফেরবার জায়গা নেই, এগুবার জায়গা নেই, কোথায় ঘুরে মরছি! কেন এসেছিলুম, কোথায় এসেছিলুম, সব ভুলে গেছি। ঘুরছি শুধু গোলক ধাঁধায়। শুনেছি অনেকে বেড়ায়, বেড়িয়ে লেখে ভ্রমণকাহিনী। আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে ওই বইগুলোকে। দু চক্ষে নয়। ভ্রমণ-কাহিনী, সে আবার কি? দু-দিনে বেড়ানো? তাহলে আমি কি? আমার এ কোন্ বেড়ানো, এ কোন্ সর্বনেশে ভ্রমণ। শুকনো ঝরা পাতা উড়ছি পথে পথে। উঠছি পড়ছি, তারপর একদিন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাব কার

পায়ের চাপে। কী যে চাইলুম, আর কী যে পেলুম। বড় ভয়ঙ্কর নেশা ভাই, ভয়াবহ নেশা। ও-ই নিয়ে আবার লোকে বই লেখে?'

চুপ করলেন। মনে হল একটা তীব্র যন্ত্রণার স্বর ঢেউ দিয়ে ফিরছে কানের কাছে। ভুলে গেলাম কুম্ভমেলার কথা। ভুলে গেলাম, কোথায় এসেছি। এ যে মাতালের ধিক্কারের কান্না। একদিন যা আকণ্ঠ পানে মাতাল করেছে, আজ তার-ই বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কিন্তু পথ কি মন্দ? ঘরছাড়া মানুষের সে যে তৃষ্ণার জল। যতক্ষণ সে জীবনস্বরূপ, ততক্ষণ সে আনন্দময়। সে আনন্দ অশ্রুভরা। সে ব্যথার ব্যথী। অগতির গতি। নিঃস্বের সঞ্চয়। পথ না হলে চলব কোথায়।

কিন্তু জানি নে, বুঝি নে, পথ কখন এমনি প্রতিশোধ নেয়। আর কী ভয়ঙ্কর তার প্রতিশোধ। সেই প্রতিশোধেরই এক প্রতিমূর্তি যেন আমার সামনে!

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম 'আপনার নামটি কিন্তু জানা হয় নি।'

বলতেই আবার হাসি। উচ্চহাসি হেসে বললেন, নামটা ভাই বড় খারাপ আমার। এই বাউণ্ডুলে জীবনে সেটাও একটা ঠাট্টা। তাহলে আর একটু চা খেতে হয়।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই'। বলে বয়কে ডাকবার আগেই উনি নিজেই সেই দাক্ষিণী ভাষায় হুকুম করলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কখনো দেশে যান নি?'

বললেন, 'বাংলাদেশে? অনেকবার। তবে গাঁয়ে গেছি একবার।'

'মাত্র?'

'হ্যাঁ। যুদ্ধের পর গেছলুম। সারাটি দিন ঘুরলুম, কেউ চিনতেও পারল না। গাঁয়ের হরে মুদী তেমনি বসে ছিল দোকানে। শুধু গায়ের চামড়া তার ঝুলে পড়েছিল থলের মত। কী বলব ভাই, আমাকে দেখে বললে, কি মাংতা সাহেব? মনে মনে হাসলুম। বললুম, পৌয়া ভর চিঁড়ে দাও, দো পয়সা, কী গুড়। সাহেবকে চিঁড়েগুড় খাইয়ে তার ভারি আনন্দ। বললে, 'কার বাড়ি আসা হায়?' বললুম, সোনার বাঁধন কি বাড়ি।' সে বললে, 'ও, সোনার বেনে? পচ্চিমপাড়ায় আছে বটে দু-ঘর। নাক কি বরাবর চলে

খাইয়ে। হাসিও পেল। ছুঃখও হল। সত্যিই, সোনার বাঁধনের বাড়ি নাক বরাবরই বটে। গেলুম। গিয়ে দেখলুম, ভাঙা বাড়ি আর ঘন জঙ্গল। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা ভূতুড়ে বাড়ি। বুঝলুম, কেউ নেই। হয়তো আমার সোনার বাঁধন অন্য কোন দেশে আর কাউকে বেঁধেছে। তার চোখের দিকে তাকালে না বাঁধা পড়ে উপায় ছিল না।···ফিরে গেলুম।'

আবার চুপচাপ। চা এল। এবার ছুটি সিঙ্গল কাপ। বুঝলাম, সে-ই যে গেলেন, সেই যাওয়া আজো শেষ হয় নি।

বললেন, 'যদ্দিন আছেন, আসবেন একটু আধটু। একটু বকব প্রাণভরে সে মানুষও পাই নে।'

বললাম, নামটা?'

হেসে বললেন, 'ভোলেন নি দেখছি। হাসবেন না যেন। নাম আমার রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়।' বলে কী হাসি। হাসি আর থামতে চায় না। বললেন, 'কি আশ্চর্য বলুন তো, টো টো মোহন কিংবা বাউণ্ডেলে মোহন নাম রাখলেই ঠিক হত।'

স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, চা খেতে ঢুকে এমনি এক রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হবে। তাঁবুটার অন্ধকার তখনো কাটে নি ভাল করে। বাইরে বালুচরের আকাশ রূপার পাতের মত ঝকঝক করছে। আর বসে থাকতে পারি নে। পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলুম।

রমণীমোহন গল্পের নায়কের মত বাধা দিলেন। বললেন, 'পয়সাটা ভাই পাওনা থাক, কাল দিয়ে যাবেন।'

বুঝলাম, আসবার জন্যই এই কথা। বললাম, 'যদি না আসি?'

'তা হলে একলা বসে বসে হাসব!'

অদ্ভুত কথা। ছুজনেই হেসে উঠলাম। বললাম, 'কিন্তু ব্যবসা করতে বসেছেন। পয়সা না নিলে আসব কী করে?'

'ওটাই তো ফন্দী।' হেসে আবার বললেন, 'দোকানটি আমার এক মাদ্রাজী বন্ধুর। আড়াই হাজার টাকা দিয়ে দোকান নিয়েছে। বুঝতেই পারছেন অবস্থা। সকাল থেকে আপনি একমাত্র খদ্দের। তবে সে সম্মান

আপনাকে দেব না। আমার আত্মীয়তাটুকুই মেনে নিতে হবে আপনাকে। কি ভাগ্যি আপনি এসেছিলেন। প্রাণে একটু হাওয়া লাগল। আসবেন, আসবেন। রোজ পয়সা নেব, আজকের দিনটি পারব না ভাই।'

বলতে বলতে উনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন আবার। আমার মুখের হাসিটি আড়ষ্ট হয়ে রইল। এই বিরাট সুপুরুষ চেহারার মানুষটির ভেতরের সেই ক্লান্ত অসহায় প্রাণটি কখন যে মন দিয়ে মন কেড়েছে, টের পায়নি। যাবার সময় ওঁর এই গাম্ভীর্য খচ করে উঠল বুকের মধ্যে।

একসঙ্গে বাইরে এলাম। রমণীমোহন বলে উঠলেন, 'আঃ!'

দেখলাম, বুকটা ওঁর ঠেলে উঠেছে সামনের দিকে। মাথাটি উঁচু করে তুলে ধরেছেন দূরের আকাশের দিকে। দু-চোখে মুগ্ধতা। বুঝলাম, নেশা লাগছে। বিষ এখনো মাঝে মাঝে অমৃত হয়ে ওঠে। খোলা আকাশ দেখলেই মন ছুটে যেতে চায়। বোধহয় ওইটুকুই এখনো প্রাণবায়ু হয়ে আছে।

বললাম, 'চলি।'

সেকথার জবাব না দিয়ে বললেন, 'মানুষের ভিড় একটু বেড়েছে দেখছি। কাল পূর্ণিমা কি-না। স্নান রয়েছে।'

পথের মানুষ। বাইরের কথা ভুলতে পারেন না কিছুতেই। বললাম আবার, 'চলি।'

হাত ধরে বললেন, 'আসুন।'

খানিকটা গিয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। হাসি পেল, লজ্জাও হল। তবু বললাম, 'একটা কথা বলব?'

'একটা কেন, একশোটা বলুন।'

বললাম, 'কেন এসেছি বলছিলেন, না এলে আপনাকে দেখা হত না তো?'

বলতেই ওঁর ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠেই চকিতে ফেটে পড়লেন হাসিতে। হাসিটা তাকিয়ে দেখতে পারলাম না। ফিরে চললাম। শুনতে পেলাম, চীৎকার করে বলছেন, 'তাহলে এ যাত্রা আপনার নিষ্ফল তীর্থযাত্রা। কুম্ভ আপনার শূন্যই থেকে যাবে। হা হা হা…।'

উত্তরে হাওয়ায় ভেসে এল ওঁর হাসি। শূন্য কুম্ভ আমার ভরবে কি না জানি নে। কিন্তু হৃদিকুম্ভ যে ভরে গিয়েছে মানুষ-রসের স্বাদে। যে মানুষ দেখে চেখে স্বাদ মেটে না, সেই অতৃপ্তি উনি বাড়িয়ে দিলেন হাজার গুণ। এ বৈচিত্র্যের শেষ নেই, রূপের সীমা নেই। এ নামেরও মৃত্যু নেই।

হঠাৎ বুকে আমার আনন্দের সীমা রইল না। চারিদিকে মানুষ। বিচিত্র রংবাহার। কোলাহল, ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা, ঊর্ধ্বশ্বাস মানুষ। সকলে চলেছে সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে। মনের মধ্যে বেজে উঠল সহস্র রাগিণী এক-ই তারের ঝঙ্কারে।

দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম পূর্বদিকে। বালি শুকিয়ে ঝুরঝুর করছে। তেতে উঠেছে এর মধ্যেই। শীতে বড় আরাম লাগছে তাতে। পূর্বদিকের সমুদ্র-গুপ্তের টিলার দিকে চললাম।

একলা চলছি নে। শত শত, লক্ষ লক্ষ চলেছে। যেন আমারই সঙ্গে চলেছে সবাই। যেন চলেছে আমারই পায়ে পায়ে, আমারই হৃদস্পন্দনের তালে তালে, ছায়া ফেলে আমরাই হৃদয়-সরসী-নীরে। যেন সবারই ডাক পড়েছে আজ পূর্বদিগন্তে।

সত্যি, জনবন্যার ঢেউ যেন বেড়ে উঠেছে অনেকখানি। একটি রাত্রের মধ্যেই সেই বন্যার গতি যেন চারদিক থেকে পাক খেয়ে খেয়ে আবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয়। কোন দিক থেকে আসছে মানুষ, যাচ্ছে কোন দিকে, কিছুই ঠাহর করা যায় না।

সামনে উঁচু-নীচু বালুচর। এদিকে তাঁবুর সংখ্যা ক্রমে কমে এসেছে। কমে আসতে আসতে শেষ হয়ে গিয়েছে একেবারে। শুধু সাদা বালু। তার উপর দিয়ে মানুষের বন্যা এ সকালের বেলায় যেন ঘন অরণ্যের সারি হয়ে উঠেছে। টাঙ্গা ছুটে চলেছে। ছুটে নয়, ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এরই উপর দিয়ে, মানুষের ভিড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে প্রাইভেট মোটরকার। হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বালি।

দেহ শীতার্ত। অথচ আকাশে আশ্চর্য মেঘ ও রোদের সমারোহ। সাদা মেঘের দল চলেছে নীল আকাশের আঙিনা জুড়ে। ছোট ছোট মেঘের টুকরো রোদের ছোঁয়া লেগে, তার ধারে ধারে খেলছে রূপালী ঝিলিমিলি।

ঝুসির গ্রাম থেকে নেমে আসছে উটবাহিনী। পিঠে তাদের কাঠের বোঝা। দূর থেকে দেখা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দুলতে দুলতে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আসছে গাধাবাহিনী। তাদের পিঠে শুধু কাঠ নয়। কাঠ তরি-তরকারি, ফল।

মানুষ, পশু ও প্রকৃতির বিচিত্র সমারোহ। হাসি ও কলকোলাহল। অন্ধ সুরদাস চলেছে গান গাইতে গাইতে। তার ভাষা বুঝি নে। দরাজ গলায় তার ভৈরবী সুরের মধ্যে শুধু ঘরছাড়ার আহ্বান। শুধু ডাক। এই ভিড় কোলাহলের মধ্যেও সে সুরে কী বিচিত্র প্রসন্নতা। মুক্তি ও আনন্দের স্বাদে ভরপুর।

তাকিয়ে দেখি, শীত নেই অন্ধ সুরদাসের। খালি গা। ছিন্ন ময়লা উত্তরীয় বেঁধেছে কোমরে। রুক্ষ চুলের জটা উড়ছে বাতাসে। হাতের লাঠিখানি ঘুরে ফিরে চারিদিক দেখে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে থামছে গান। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, সুরদাস হাসছে থেকে থেকে। ডাইনে বাঁয়ে দেখছে, দেখছে আকাশের দিকে। যেন সে সত্যি দেখতে পাচ্ছে। হাসছে, আর তার মাতৃভাষায়, গেঁয়ো টানে থেকে থেকে জিজ্ঞেস করছে, 'ওগো, শুনছো, ঠিক যাচ্ছি? পথ আমার ঠিক আছে তো?'

কেউ জবাব দেয়, কেউ দেয় না। কেউ বলে, অন্ধ কেন এ পথে? সে হাসে। হেসে হেসে আবার গলা ছেড়ে গেয়ে উঠছে গান।

আমি ভাবি আমারই পায়ে পায়ে চলেছে মানুষ। অন্ধ সুরদাসের উল্লাস দেখে মনে হল সারা মেলা চলেছে ওরই পায়ে পায়ে। চলেছি যেন ওরই গানের সুরে সুরে।

চলেছি মনের বেগে, দেহের বেগে। তবু, আশ্চর্য! এ—মনপবনের নায়ে

কোন এক নেয়ে যেন ক্লান্ত সুরে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে আমারই পাশে পাশে। সে যেন গুন গুন করছে,

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি।
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে···

ও! মনের দিকে তাকিয়ে দেখি, রমণীমোহন মুখোপাধ্যায় চলেছেন আমার সঙ্গে সঙ্গে। রেখে এসেছি, ছেড়ে আসতে পারি নি দেখছি। পারা কি যায়? সেই শৈশবের কেষ্টযাত্রার নিমাইয়ের সন্ন্যাসযাত্রার কান্না মনে পড়ছে। স্বামীসোহাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যাচ্ছে। নিমাইয়ের অঞ্চল তার ঘুমন্ত শিথিল মুঠিতে চাপা রয়েছে। নিমাই সাশ্রুনয়নে ধরেছে গান,

মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়?
যাই যাই মনে করি, যাইতে না পারি
মহামায়া আমার পিছনে ধায়॥

কে জানে, কাল যেতে পারব কি-না রমণীমোহনের কাছে। কে জানে, কোন দিন যেতে পারব কি-না! ঋণ? কই, মনে মনে একটুও ঋণভার অনুভূত হচ্ছে না তো। জানি, দিয়ে সুখ, নিয়ে দুঃখ। কিন্তু, রমণীমোহনের ঋণ তো ঋণ বলে লাগছে না। কত কত ঋণ নিয়েছি, ভোগ করেছি মনোকষ্ট। কিন্তু সে ঋণে তো বাঁধে নি আমাকে সে। সে যে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বাঁধলে, সে যে ধরে রাখলে আমাকে মুক্তি দিয়ে।

তার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী, সংক্ষিপ্ততর তার সোনার বাঁধনের কথা। যে কাহিনীর তরী ভাসছে রক্ত আর অশ্রুর নদীতে। জানি, এ চলার পথে হারিয়ে যাবেন উনি। হারিয়ে যাবেন হয়তো সূর্যাস্তেরই আগে। তবু বুঝলাম, মনসৈকতে আঁকা রইল যে রেখা, সে অদৃশ্যে ফিরবে আমার চলার পথে ক্লান্ত নেয়ের মত। তাকে তো আটকাতে পারব না।

ঝড় এল বালুচরে। একরাশ ভিখারী। যেন চৈত্র-ঘূর্ণির ঝরাপাতা, ফুটোফাটা। কোথা দিয়ে এল, কোনখান দিয়ে এল, কেউ জানে

না কেউ জানে না, এ ঘূর্ণি যাবে ঘুরতে ঘুরতে কোন পথের উপর দিয়ে, কাদের দলে মাড়িয়ে।

হঠাৎ আমরা একরাশ নরনারী পাগলা ঘূর্ণির আবর্তে যেন পথরুদ্ধ, বিব্রত অসহায় হয়ে পড়লাম। হে পুণ্যবান, দাও দাও। হে তীর্থযাত্রী, দাও দাও। হে দয়ালু, হে রাজা রানী, দাও দাও, দাও দাও, দাও দাও।

কিন্তু, প্রতিবাদ নেই, ক্রুদ্ধ গর্জন নেই, হা হা করে বিতাড়ন নেই। সকলেই বিব্রত তবু হাসিমুখর। দিই দিই, দেব দেব। যা আছে, তাই দেব। গতিক খারাপ। পকেটে হাত দিলাম। কোনরকমে একজনের হাতে তুলে দিলাম পয়সা।

দেবার পরমুহূর্তেই সেই হাসি। নিঃশব্দ, নিরালা, দুস্তর তেপান্তরের সেই একাকী পথিকের বুকে আতঙ্ক ধরানো পাখির বিচিত্র তীব্র হো হো ডাক। সেই লাল জামা, আর পালতোলা ময়ুরপঙ্খী পাড়। তেপান্তরের সেই বন্য বিহঙ্গিনী।

সচকিত চোখে তাকিয়ে দেখি, একলা নয়। অনেক, একরাশ। ভিখারী নয়। ভিখারিনী বাহিনী। বেশভূষায় প্রায় সকলেই একরকম। তার মধ্যেই, ময়লা ছিন্ন শাড়ি ও জামার ভাগ-ই বেশী। রুক্ষ চুল, ধূলিধূসরিত মুখ আর লজ্জাহীন ছিন্ন পোশাক। সবচেয়ে আশ্চর্য! তার মধ্যেও সিঁদুরের প্রসাধন, জটায় শুকনো ফুলের সজ্জা। কারুর বুকজোড়া সন্তান।

. তারই মাঝে ওই লাল জামা। দলের মধ্যে রয়েছে মিশে। তবু যেন কেমন করে আলাদা হয়ে উঠল চোখের সামনে। বোধহয় চোখেরই দোষ। বুঝি দোষ মনের-ই। কে জানত, আবার পকেট থেকে পয়সা তুলে দিয়েছি তাকে। ছি ছি, কী কলঙ্ক। কী ভাগ্যি, নেই খনপিসী, পিসীর বাহিনী।

চোখ পড়তে দেখি, তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আবার ঠকেছি, বুঝি তাই। আবার ঠকিয়েছে, বুঝি তাই। দেখি, ঠোঁটের কোণে তার জয়ের হাসি। জয়ের মধ্যেই তো থাকে স্পর্ধা ও বিদ্রূপের ছোঁয়া। ঠোঁটের তীব্র বঙ্কিম রেখায় তার সেই দুর্জয় ছলনার হাসি। চাউনি দেখে চমকে উঠলাম। হেলানো ঘাড় আর বাঁকা চোখে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আমাকে।

স্খলিত আঁচল পড়েছে লুটিয়ে বালুচরে। বাতাস থরথর কাঁপছে তার লাল-জামায়, তার রুক্ষ চুলে, তার মেটে সিঁদুরের অস্পষ্ট এলোমেলো সিঁথিরেখায়, তার সর্বাঙ্গে। সব মিলিয়ে এই উন্মাদিনী বালুচরের আর-এক বেশ যেন দেখা দিয়েছে এই সর্বনাশী যাযাবরীর মধ্যে।

একে রূপ বলব কি-না জানি নে। কী রূপ বলব, বুঝি নে। একে রূপ বলতে বাধে। অরূপ বলতে সায় পাই নে মনে। এ রূপের খাদ নয়। অথচ মন ভরে উঠছে না অপরূপ বলে। একি ইস্পাতের তলোয়ার, নাকি রূপালী রঙের বাঁকা কাষ্ঠখণ্ড মাত্র?

মনের তলে আমার বিস্ময়ের ঘোর। যাযাবরী ভিখারিনীর চোখে মুখে এত আয়োজনই বা কেন? এত শাণিত দীপ্তি কিসের। করুণাপ্রার্থিনীর এ নির্লজ্জ বহ্নি ছড়ানো কেন? একি শুধু যাযাবরী রক্তপ্রবাহেরই স্বভাব? নাকি, ঘরছাড়া মেয়ের সেই চিরাচরিত অভিশপ্ত জীবন পয়োনালীর ক্লেদ। অথবা, জীবন-প্রস্তরে ঘা খেয়ে খেয়ে প্রতি মুহূর্তে সে শাণিত ও দীপ্ত।

চোখ সরিয়ে নিলাম। লজ্জা হল, সঙ্কোচ হল মনে মনে। নিজেকে আমরা ভুলতে পারি না বোধহয় ক্ষণেকের তরে। সবাই বলেছে সে সর্বনাশী, আমিও বলি সে সর্বনাশী। শুধু সর্বনাশী। সর্বনাশেরই আয়োজন তার চোখে মুখে বেশে।

যে সব হারিয়ে, পথে এসে দাঁড়িয়েছে হাত পেতে, সর্বনাশের আগুন তো জ্বালাবেই সে। যার কিছু নেই, সর্বনাশের খেলা তো সাজে তারই।

তাকে ভিক্ষে দিচ্ছে কেউ কেউ যেচে। কত লুব্ধ চোখের পেছনে, ভিখারিনী হয়েও রানীর মত মাথা তুলে রয়েছে দাঁড়িয়ে। মাথা নুইয়ে অগ্রসর হলাম পথে। পথিকের স্বভাবসুলভ চাউনি দিয়ে অভিনন্দিত করতে পারলাম না তার দীপ্ত হাসিকে। সে মন নেই, সে সাহসও নেই।

ঘূর্ণি ঝড় এল, আবার চলে গেল। যেন সেই রূপকথার কাহিনীর আউ মাউ কাউ শব্দের মত ভিখারিনী-বাহিনী ছুটে চলল আবার। ওই শব্দের মধ্যে ব্যাকুলতা, ব্যস্ততা। এ ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, ও একে ঠেলে ফেলে

দিচ্ছে। পরস্পরের মধ্যে হিসেব হচ্ছে, কে কত পেয়েছে। ঝগড়া হচ্ছে, হাসি হচ্ছে।

সমস্তটা মিলিয়ে শোনাচ্ছে একটা ব্যস্ত ত্রাস আর্তনাদের মত।

কারা নিজেদের মধ্যে কথায় কথায় বলছে, হিন্দীতে বলছে, ভিখারিনী-গুলো মারাঠার আওরত। জানি নে কোন দেশের আওরত। কিন্তু এদের দেখেছি চিরকাল। দেশের মেলায়, বাজারে, শহরে। কলকাতার শহর-তলীতে, শনি-রবিবারে দেখেছি দল বেঁধে ঘুরতে।

বিদেশে বেড়ানো নাকি কপালে লেখা থাকা চাই। লিখে দেন নাকি কোন এক বিধাতা। জানি নে, কে সেই বিধাতা, যে ঘরছাড়ার বৈরাগ্যের তিলক এঁকে দেন কপালে। কিন্তু আমার পোড়াকপালে তো সে তিলক কোন দিন পড়ে নি জানি। তবু কয়েকবার গিয়েছি নিকট ভারতের এদিকে ওদিকে। কিন্তু ওই জাতের মেয়েদের দেখেছি সর্বত্র।

সেই চিরাচরিত চেহারা। চুল বাঁধার এদের কোন ছিরি-ছাঁদ নেই। তবু কেমন একটা রকম আছে। যা শুধু মানায় ওদের রুক্ষ জটায়। কাপড় পরার বিচিত্র ধরন। আমাদের ঘরের মেয়েদের আয়াসসাধ্য দেহসজ্জার চেয়ে ওদের ময়লা কাপড়ের অনায়াস বেষ্টনী তৈরী করে একটি বিচিত্র ছন্দ। আর কেন জানি নে, ওদের ধূলিমলিন কীটসমাচ্ছন্ন দেহে দেখেছি অটুট যৌবন।

ভাবি, আমরা কত সঞ্চয় করে বেরুই তীর্থযাত্রার পথে। মন্দিরে মন্দিরে ফিরি মাথা কুটে কুটে। ওরা ফেরে শুধু আমাদের পেছনে পেছনে, দুটো পয়সার জন্য। এত যে তীর্থক্ষেত্রের আনাচে কানাচে ঘুরে ফেরে ওরা, ভগবানের এক ছিটা পুণ্যও কি বর্ষিত হয় না ওদের মাথায়?

কোলাহলমুখর জনবন্যার সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে চলছিলাম, আর ভাবছিলাম এমনি এক দার্শনিক তত্ত্ব। আচমকা কানের কাছে হাসি শুনে থমকে গেলাম। আবার সর্বনাশী! পাশ দিয়ে, আঁচল উড়িয়ে তীরবেগে ছুটে গেল সামনের দিকে। কিছু ঠাহর করবার আগেই, চকিতে তার পাল-তোলা নৌকা আঁচলের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে উঠল দুই খর চোখের দীপ্ত

তারা। তারপর নিরালা বনের পাখির ডাকের মত আকাশে উধাও হয়ে গেল হাসি। পেছনে তাকিয়ে দেখি, তিন-চারটি প্যাণ্ট-কোট-পরা আধাবয়সী মানুষ লুব্ধ উৎসুক চোখে লক্ষ্য করছে তার গতিবিধি।

পাশ থেকে কে বলে উঠল, 'হাঁসতি হ্যায়।'

ফিরে দেখি অন্ধ সুরদাস। আপন মনেই বলছে। তার লাঠি এসে ঠেকছে আমার পায়ের কাছে। চোখের দুটি সাদা পর্দা ঠেলে এসেছে সামনের দিকে। পর্দা দুটি কাঁপছে থরথর করে। আর হাসছে। হাসতে হাসতে আপন মনেই আবার বলে উঠল, 'হাঁসতি হ্যায় কৌন?'

বলে আবার হেসে উঠল নিজের মনে। যেন কথোপকথন করছে কারুর সঙ্গে। হাসতে হাসতেই আবার জিজ্ঞেস করে উঠল, 'রাস্তা তো ঠিক হ্যায়?'

জানি নে, এ শুধু তার কথার কথা কি-না। জানি নে, এ শুধু তার স্বগতোক্তি কি-না। তবু, বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ, রাস্তা ঠিক আছে।'

'ঠিক হ্যায়?' বলে সে আবার হেসে উঠল। সরল ও বোকাটে মনের অভিব্যক্তির মত সে হাসি। তবু যেন, সামান্য একটু বিস্ময়ের ঘোর তার গম্ভীর কণ্ঠে। একটু বা রহস্য ছোঁয়ানো। তেমনি হেসে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাবুজী, আপ-কা-রাস্তা ঠিক হ্যায়?' বলে সে হাঁ-করা হাসিমুখে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। রোদ লেগে সাদা পর্দা দুটি রূপোর মত উঠল চকচকিয়ে। যেন আকাশের বুকে পেতেছে কান। জবাব আসবে ওখান থেকে।

জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেলাম। এ আবার কেমন প্রশ্ন? আমি রীতিমত চক্ষুষ্মান মানুষ। অন্ধকে বাতলে দিচ্ছি ঠিক পথের ঠিকানা। সে উলটে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমার ঠিকঠিকানা। তবু কথা বলতে গিয়ে আটকাল। পথের ঠিক আছে কি-না কে জানে! কিন্তু এক কথায় তার জবাব দিতে পারলাম না। বিশেষ করে ওই মুখের দিকে তাকিয়ে। আমার জবাব দেওয়ার আগেই সে হেসে উঠল। এই ভিড় ও কোলাহলের মধ্যে অপূর্ব শান্ত উদাস তার কণ্ঠস্বর। বলল, 'কোই নহি বতা সকৃতা, কিধর গয়ী সড়ক, কহাঁ গয়া রাস্তা। হ্যায় না বাবুজী?'

মনে মনে ভাবলাম, তবে কি সে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করছিল শুধু? রাস্তা তার ঠিক আছে কি-না, এ শুধু জিজ্ঞাস্য নিজেকে। এত লোক চমকে ফিরে তাকে বার বার জবাব দিয়েছে, আর সে শুধু এমনি হেসেছে মনে মনে। তারপর আবার নিজেই বলল হিন্দীতে, 'বাবুজী, আমি তো অন্ধ। জন্মান্ধ! মায়ের পেট থেকে পড়ে এক-ই বুলি শিখেছি আমি, রাস্তা ঠিক আছে তো? সারা সংসার যখন চেঁচিয়ে বলে, সব ঠিক হ্যায়, তখন আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। সব ঠিক হ্যায়? দুনিয়ার সব ঠিক আছে? তবে আমি কেন সবকিছুর ঠিক পাই নে? বাবুজী, ওহিসে পুছা কি, আপ-কা-রাস্তা ঠিক হ্যায়?'

বলে আবার সে লাঠিটি চারপাশে একবার ঘুরিয়ে বলে উঠল, 'রাস্তা ঠিক হ্যায়?'

তারপর তার কম্পিত সাদা পর্দা দুটি ঠেকে রইল আকাশে। ওই ভাবেই সে এগিয়ে চলল আমার পাশে। আর ঘুমন্ত শিশুর দেয়ালা করার মত তার হাঁ-করা মুখে কখনো হাসি, কখনো গাম্ভীর্য।

কে বলে উঠল, 'কা হো সুরদাস, গানা কাহে বন্দ্ কর দিয়া?'

সুরদাস বোধহয় গানই ভাঁজছিল। আবার গান ধরল।

সামনে তাকিয়ে দেখি, পথ রোধ করেছে ঝুসির উচ্চ ভূমি। সেই উঁচু জমির উপরে, নীচ থেকে উঠে গিয়েছে সিঁড়ি, হঠাৎ বাঁক নিয়েছে বাঁদিকে। হারিয়ে গিয়েছে একটি বিশাল বটের আড়ালে। তার উপরে, মনে হল প্রাচীরবেষ্টিত কেল্লা মাথা তুলেছে আকাশে। উত্তরাংশের কার্নিসবিহীন সরল প্রাচীর নীচের দিকে নেমে এসেছে। সেই প্রাচীরের গায়ে মস্ত একটি অন্ধ গুহামুখের গহ্বর। গহ্বরমুখ থেকে আর-একটি সিঁড়ি নেমে এসেছে বালুচরে। সেই গুহামুখ থেকে, পিঁপড়ের মত পিলপিল করে নেমে আসছে নরনারী! সিঁড়ির ধাপ, এমন এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে, চলন্ত নরনারীর-বাহিনীকে দেখাচ্ছে যেন দূর-থেকে-দেখা ধীরগতি ঝরনার মত।

শুনেছিলাম, এটি সমুদ্রগুপ্তের কূপ। কিন্তু কূপ কোথায়? এ যে দেখছি, চারিদিক থেকে একটি সুরক্ষিত সু-উচ্চ গড়ের মত। হঠাৎ মনে হয় যেন এক সামরিক গাম্ভীর্যে ও কৌশলে এর চারপাশে গোপন রয়েছে সমরায়োজন।

দুদিকের দুই সিঁড়ি দেখে বুঝলাম, দক্ষিণেরটি আরোহণী। উত্তরে অবতরণিকা। আরোহণীর মধ্যপথে ঝুড়ি-নামা প্রাচীন বটগাছ। ছায়া ভরে রেখেছে সিঁড়িতে। যে দিকে তাকাই, সেদিকেই শত শত বছরের এই অশ্বত্থের ঝুপসী ঝাড়। মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত, উচ্চভূমির কোলে কোলে, ফাটলে, গর্তে সর্বত্র ছাপ প্রাচীনতার। কেবল সরল ও খাড়া প্রাচীরের রোদ-চমকিত সাদা রঙ যেন নতুনের ছোঁয়ায় ঝকমক করছে।

আমার পেছন থেকে অন্ধ সুরদাস জিজ্ঞেস করল, 'বাবুজী, সামনে টিলাকে সিঁড়ি হ্যায় না?'

টিলা? সমুদ্রগুপ্তের কূপ নয়? লোকের মুখে মুখেও একই কথা। সমুন্দর গুপ্তের টিলা। কিন্তু এ অন্ধ কেন জিজ্ঞেস করছে? সে কি উঠতে পারবে?

বললাম, 'হ্যাঁ সিঁড়ি। কিন্তু, তুমি তো উঠতে পারবে না সুরদাস।'

সে একটু হেসে বলল, 'নহি সকেঙ্গে?' বলে ঘাড় তুলে তাকাল উপর দিকে। মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে-পড়া জিভ নাড়তে লাগল। যেন সে দেখতে পাচ্ছে, দেখে নিচ্ছে, কত উঁচু। তারপর বলল, 'বাবুজী, এ তো আমার পহলী দফা নয়। আরো তো কত্‌নি দফা উঠেছি।'

বলে হাসল। হেসে ঘাড় ফেরাল ডাইনে বাঁয়ে। দেখল পেছনে। আবার বলল, চাপা স্বরে, বাবুজী, আপ চলা গয়ে?

বললাম, 'না।'

যেতে পারছিলাম না। সে অন্ধ। কত অন্ধ দেখি পথে পথে। পথ চলতে তাদের সঙ্গে কথা বলি নে। তাকাই নে ফিরে। জিজ্ঞেস করলে জবাব দিই। দয়া হলে অন্ধ ভিখারীকে পয়সা দিই দুটো। ওই পর্যন্তই।

কিন্তু ফিরে তাকাতে হল আজ। তাকাতে হল এই কুম্ভমেলায় এসে। সুরদাস অন্ধ। কিন্তু তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি যেন চক্ষুষ্মানের মত। তার ওই আত্মভোলা হাসির মধ্যে কোথায় যেন আত্মগোপন করে রয়েছে এক গম্ভীর সচেতন, অভিজ্ঞ সহৃদয় মানুষ। এক উদাস কৌতুক ও রহস্যের ছোঁয়া লেগে রয়েছে যেন তার ভাবে-ভোলা মুখে। আমি তাকে দেখছি। কথা শুনে মনে হয়, আমাকে সে তার চেয়ে বেশী দেখছে।

সে তেমনি হেসে বলল, 'বাবুজী, বোলি হ্যায় সব-কি, চঢ়না মুশকল, উতারনা সরল। মগর, হম্ তো অন্ধা বাবুজী। জনম সে অন্ধা। হমকো চঢ়না সরল, উতারনা মুশকল।'

বলে সে হাসল আবার ঘাড় কাত করে। এমন হাঁ-করা হাসি যে তার মুখগহ্বরের মধ্যে আলজিভটি পর্যন্ত নড়তে দেখা যায়।

কিন্তু অবাক হলাম তার উলটো কথা শুনে। চিরকাল তো শুনে আসছি উঠতে পারলে নামা যায়। উঠতে পারে কজনা। 'ওঠাই তো কঠিন সুরদাস। নামতে পারে সবাই।'

সে বলল, 'হবে হয়তো বাবুজী। মগর, বাবুজী, আপনার আঁখ বন্ধ করে দিই। ধরিয়ে দিই রাস্তা। আপনি চড়ে যেতে পারবেন। কিন্তু নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়বেন। তাই নয়? একবার শোচিয়ে বাবু আঁখ বন্দ্ করকে।'

বলে সে ছুটি ঘসা পাথরের মত চোখ নিয়ে তাকাল আমার দিকে। হাসি চিকচিক করছে তার ওই ঘষা পাথরে।

কিন্তু চোখ বুজে তো নামি নি কখনো। ভাবব কেমন করে। আমি এক শহুরে বুদ্ধি-অভিমানী মানুষ নীরবে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। এ অন্ধ আমাকে বলছে ওঠা-নামার কথা।

সে আড়-মাতলার মত হাসল মাথা নেড়ে। ডাকল যেন কোন সুদূর থেকে, 'বাবুজী।'

বললাম, 'বল।'

'ওইসা শোচ্না বড়ি মুশকল, হ্যায় না? বলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে গুন গুন করে উঠল, আঙুল দিয়ে তাল ঠুকল নিজের লাঠিতে। কী বলল, গানের কথায় বুঝতে পারলাম না। তবে তার ঘাড়দোলানি দেখে বুঝলাম, নিজের বক্তব্যের অর্থ বোঝাচ্ছে সে কোন এক সজনীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে। তারপর বলল, 'বাবুজী চঢ়কে উঁচা যো মিলি হাতমে, উতরানে কি বখত রাখো সামালাকে। নহি তো, ও গব্ যায়েগী, হরা যায়েগী, ঢুন্না বেকার হোগী। কেঁও কি, তুম তো অন্ধা হ্যায় না? অন্ধা, তুমকো রো'নে পড়েগা।

মনে করলাম, এ বুঝি শুধু অন্ধেরই বেদনা। দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ কেমন করে তা অনুভব করবে।

বললাম, 'তাই হবে হয়তো, সুরদাস।'

সে বলল, 'সায়েদ নহে বাবুজী, সচ্চা। মহাপুরুষ লোক উজান চলে আপনা সাধনপথে। কাঁহে? পাপের দরিয়া বয়ে চলেন তিনি পুণ্যের উজানে। মগর বাবুজী, দরিয়া বয়ে কে নামে আপ্না সাধনপথে? নীচের পথকে হর্ আদমি ভরতা। পাপ ঔর মরণের মায়া তো হ্যায় ওহি রাস্তার কিনারে কিনারে। তবে? হুঁশিয়ার সে চড়ো, মগর উতারো জায়দা হুঁশিয়ারসে। সহজ ভেবে যদি সহজে নামো সজনী, তবে তোমার পা পিছলে কোথায় চলে যাবে, হারিয়ে যাবে কোথায়। গর্দা পড়বে তোমার সারা গায়ে, আর অন্ধ সংসার তখন হাসবে, ধিক্কার দেবে তোমাকে।

সহজ সমজ্‌কে মৎ চলিহো সজনী,
রাস্তা বহুৎ টেঢ়া হ্যায়॥

বাবুজী, ক্যায়া হম্ গলত্ বতায়া?'

অন্ধকারের ঘূর্ণি জলরাশি যেন, আচমকা আলোর মাঝে নির্মলরূপে টলমল করে উঠল। সত্যি, পদস্খলিত মানুষ যখন নামে, মৃত্যু ওত পেতে থাকে তার জন্যে। প্রাণের জিনিস মুঠোয় নিয়ে যখন শিশু নাচে, তখন-ই তো কোন ফাঁকে সব হারিয়ে তার কান্না আসে। মানুষ উঠতে গিয়ে পড়ে না। নামতে গিয়ে পড়ে। পড়বেই তো। নামার পথে টান যে বেশী। আনন্দে অধীর পদযুগল যে তখন শিথিল ছন্দে চলে নেচে নেচে।

চোখ থাকতে বুঝলাম না। বুঝতে হল অন্ধের কাছ থেকে। তাকিয়ে দেখি, তার সারা মুখ আলোয় আলোময়। আলো তার অন্ধ চোখে, মুখে, তার পাথরের মত শক্ত চওড়া বুকটিতে উজ্জ্বল বর্মের মত ঝলকিত রোদ! রূপ-অন্ধ চোখে আমি তাকিয়ে রইলাম অন্ধ জীবনসন্ধানীর দিকে।

সে বলল, 'বাবুজী, গোঁসা তো করলেন না আপনি?'

গোঁসা? রাগ করব তার উপরে? কেন? বললাম, 'রাগের কথা তো তুমি কিছু বলো নি সুরদাস?'

সে হেসে বলল, 'সচ বাবুজী? আমি মুর্খ। আমার কথায় সবাই হাসে, গোঁসা করে। বাবুজী, দুনিয়া অন্ধ, সবসে বড়া অন্ধা হম্। সেই জন্যই তো বারবার বলি, রাস্তা তো ঠিক হ্যায়। সোচ্ বুঝকর চলো সজনী। রাস্তা তো ঠিক হ্যায়?'

বুঝলাম, অন্ধ যা-ই বলুক, যে রাস্তার জন্য তার অত জিজ্ঞাসাবাদ, তা নিশ্চয়ই ভগবানের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাস্তাটা কিসের সুরদাস? ভগবানের?'

সুরদাস বিনয়ে হাতজোড় করে যেন ক্ষমা-চাওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াল নুয়ে। বলল, 'বাবুজী, ভগবান কে, তা তো আমি জানি নে। দুনিয়া অন্ধকার। আমি আলো খুঁজে ফিরছি। বাবুজী, আপনি কী খুঁজছেন, সে তো আপনি জানেন। আর রাস্তা? হাজারো রাস্তা পড়ে আছে। কোন রাস্তা ধরবেন, সে তো জানে আপনার মন। যব্ মন ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায় রাস্তা।'

বলে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ বলল, 'বাবুজী' লকরী কা দুকান হ্যায় না এহাঁ?'

দেখলাম, সত্যি, একটি জ্বালানী কাঠের স্তূপ রয়েছে অদূরে উত্তরে। সেই স্তূপের উপর দুটি কিশোর-কিশোরী দিব্যি গা এলিয়ে দিয়ে রয়েছে পড়ে। বোধ হয় রোদ-পোহানো হচ্ছে। বললাম, 'আছে। কী করে বুঝলে?'

'হাওয়াসে লকরীকে বাস আতি হ্যায়। হম্‌কো থোড়া নিশানা দিজীয়ে বাবুজী, হম্ হুঁয়া হি বৈঠেঙ্গে।'

বললাম, 'কেন? তুমি ওপরে উঠবে না?'

সে বলল, 'নহি।'

হাত ধরে তাকে কাঠের স্তূপের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। দিয়ে বললাম, 'তুমি কেন এসেছ সুরদাস এই ভিড়ের মেলায়? তোমার তো কষ্ট হবে।'

চলতে গিয়ে দাঁড়াল সে। বলল, 'বাবুজী, ঘর ভি অন্ধার, বহার ভি অন্ধার। তখলিফ হর্ জায়গা'পর। তব্ আনন্দ কঁহা হ্যায়?'

বলে সে লাঠি ঠুকে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ ভাবি নি। এখন তার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করলাম সতর্ক দৃষ্টিতে। যদি হোঁচট খায়। কিন্তু সে ঠুক ঠুক করে গিয়ে বসল ঠিক কাঠের গাদার নীচে উষ্ণ বালুতে। বসে ফিরল আবার এদিকে। মুখে সেই হাসি। যেন আমার দিকে ফিরে তাকাল বিদায়ের হাসি নিয়ে।

ঘরে ও বাইরে যার অন্ধকার, সর্বত্র যার নিরানন্দ, তার আনন্দ কোথায়? সে কি শুধু এই পথের পরে পথে, পথচলার মধ্যে? টিলাতে ওঠবার সিঁড়িতে পা দিয়ে থামলাম। তাই তো একটি পয়সাও দিলাম না সুরদাসকে। কিন্তু সেও তো চায় নি। ফিরে দেখি, সে ওই কিশোর-কিশোরীর সঙ্গে হাসি ও গল্পে মেতে উঠেছে। আর আশ্চর্য! কিশোর-কিশোরী দুটি দিব্যি তার দুপাশে এসে বসেছে। হাত তুলে দিয়েছে সুরদাসের ঘাড়ের উপর। আর সুরদাস যেন সদা হাস্যময় একটি আনন্দের প্রতিমূর্তি। শিশুদের সঙ্গে খেলায় মাতা, ওই কি তার আলো খোঁজা?

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম উপরে। উপরে উঠে, সামনে পেলাম একটি পরিষ্কার চত্বর। বাঁয়ে কয়েকটি ছোটখাটো খুপরি। মন্দিরের গম্বুজের মত সাজানো রয়েছে সেই খুপরির মাথা। ভিতরে সিঁদুর-লেপা ছোট ছোট পাথরের নুড়ি। শুধু নুড়ি নয়। ছোটখাটো পাথরের মূর্তিও আছে। কারুর হাত ভাঙা, পা ভাঙা। মুখ ভেঙে গেছে অনেকের। বুঝলাম, বছরের পর বছর এসব খুপরির পাথরের দেবতারা থাকেন নিরালায় ঘুমন্ত, উপবাসী। মরসুম এসেছে, তাই ধোয়া পোঁছা হয়েছে। প্রতি খুপরির পাশে বসেছে পাণ্ডারূপী শিখাধারী ব্রাহ্মণ। পরিচয় পাড়ছে দেবতার। দানধর্মের উপদেশ উপরোধ চলেছে রীতিমত গলা ছেড়ে। আর তীর্থযাত্রীর পয়সা ঝুন ঝুন করে বেজে উঠছে খুপরি-ঘরে।

বালুচর থেকে উঠে এলাম এক ছায়াচ্ছন্ন গ্রামে। গ্রাম-ই তো। ঝুসি গ্রাম। প্রতিষ্ঠানপুর। প্রাচীন বৎস দেশ। কিন্তু এখানে কোথায় সমুদ্র-গুপ্তের কূপ?

বাঁদিকে পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, গৃহস্থের বাসভূমি ডাইনে গভীর খাদ। খাদের ভিতরে ঘন জঙ্গলে বাসা বেঁধেছে অন্ধকার। নীচে থেকে সোজা উঠে এসেছে একটি নাম-না-জানা গাছের সবুজ শির। হাত দিয়ে তার পাতা ধরা যায়। এ শীতরুক্ষ ঋতুতে এত দাক্ষিণ্যে কে ভরে দিল সারাটি গাছ! এই কি কূপ?

উঁকি দিলাম। খাদের মধ্যে মানুষের ছায়া। গুঞ্জন ও কলকাকলী। কী ব্যাপার? লক্ষ্য করে দেখলাম, খাদের গায়ে একটি সরু রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে পিল পিল করে চলেছে মানুষের স্রোত। স্রোত গিয়ে ঢুকেছে একটি অন্ধ সুড়ঙ্গে। তাহলে ওই কি কূপ? কিন্তু যাওয়ার পথ কোথায়?

মুখ তুলে তাকালাম খাদের ওপারে, দক্ষিণ দিকে। ওপারেও একটি বাড়ি। পুরনো বাড়ি, গায়ে তার মেরামতের তালি। সেদিকেও চলেছে জনস্রোত। সামনে তাকিয়ে দেখি, এ উঁচু টিলার মাটি গিয়ে ঠেকেছে পুবের আকাশে। ওই দিক দিয়েই ঘুরে চলেছে সবাই দক্ষিণ দিকে। পাঁচিলের পাশে ঘেঁষে ভেসে গেলাম পথের স্রোতে। এমনি করেই পথ। একজন চলে গিয়েছে কবে। তারই পায়ের দাগে দাগে আর-এক জন, তারপর শত শত লক্ষ লক্ষ। পথের পরে পথে, নতুন থেকে নতুনের সন্ধানে। জানি, যাচ্ছি নে কোন নতুনের সন্ধানে। পথও নতুন নয়। কিন্তু পুরনো পথে আমি তো নতুন। আমার যে সবই নতুন।

পথের ধারে ধারে, দলে দলে সাধু। অপলক চক্ষু আর গম্ভীর মুখ। নজরটি তীর্থযাত্রীদের মুখের দিকে। কোথাও কাঠের আগুন আর গঞ্জিকা-সেবন চলেছে। তীর্থযাত্রী ও যাত্রিণীরা কেউ কাছে বসছে আবার বসছেও না।

হঠাৎ দাঁড়াতে হল। ভয়ঙ্কর ভিড়। সামনে সেই পুরনো ভাঙা বাড়ি। একটা নয়। কয়েকটি ঘর। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে ছড়িয়ে। সবাই ভাঙা, পুরনো, নোনা-ধরা। চোখে ভেসে উঠল, ঘোষপাড়ার দোলমেলার ছবি। কাঁচরাপাড়ার ঘোষপাড়া। তবে তফাত আছে অনেকখানি। সেখানে চলে খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তন ও নামগান। মেয়ের দল গায়। পুরুষের দল গায়। আবার ওরই মধ্যে, কোথাও ভাঙা হারমোনিয়ামের ভাঙা সুর।

তার চেয়েও ভাঙা হাঁফ-ধরা রুগ্ন মেয়ের সরু গলায়, 'পীরিতের রীতি না বুঝিলেন গো সখী' গান। চোখের কাজলের চেয়ে কালো তার চোখের কোল। হারমোনিয়ামের সাদা রীডের চেয়েও সাদা তার শীর্ণ আঙুলের নখ। বাংলার দূর জেলার গ্রাম্য বাবুরা দাঁড়িয়ে বসে বাহবা দেন। পকেট থেকে গুনে গুনে পয়সা তুলে দেন প্যালা। হাল আমলের কথাই বলছি।

সেখানেও এমনি পুরনো বাড়ি রয়েছে কয়েকটি। ভাঙা বাড়ি। কোনটিতে সতীমায়েব স্মৃতি। কোনটিতে বাবার।

কিন্তু এখানে গান নেই। হারমোনিয়ামের শব্দ নেই। নেই ভাঙা বন্দরের বারবনিতার আসর। পূর্ণিমার রাত্রে ঘটা করে ফাগ মাখানো, খাওয়ানো আর ভয়াবহ উৎসবের মাতামাতি। এখানে ব্যস্ততা, ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা। যানে দো বাবুয়া। যেতে দাও, দেখতে দাও, দর্শন করতে দাও। আর সমতল থেকে অনেক উঁচুতে, ঝরাপাতা আর পুরনো ইঁট ছড়ানো, ছায়া-ভরা ও তীর্থাঙ্গন বিষণ্ণ ও উদাসীন। একই সঙ্গে উদার ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ এ বহু কণ্ঠের আরাধনা আহ্বান ও হাসি। এ যেন অনেক বিশাল। আলোর ছড়াছড়ি চারিদিক। আকাশ যেন হাতের কাছাকাছি। আর বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর বেশ নরনারী, তার ভাষা, তার রূপ।

বুঝলাম, কোন দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন এখানে। তাই ঠেলাঠেলি ও ভিড়। ভাবছিলাম, ভিড় ঠেলে ঢুকব কি-না। কে যেন জাপটে ধরল পেছন থেকে। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম শুধু একখানি বহুরঙে রঙীন ছাপা উড়নি। অবাক হয়ে, মানুষটিকে দেখবার জন্য কষ্ট করে ফিরতে হল। ক্লান্ত কম্পিত একজন মারোয়াড়ী বৃদ্ধা। পোশাক দেখে আমার মনে হল তাই। বেচারীর ঘাড়ের উপর মাথাটি পর্যন্ত ঠকঠক করে কাঁপছে। স্তিমিত দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। শণ নুড়ি সাদা চুলে সোনার টিকুলি। গলায় ভরি দশেকের একটি সোনার হার নয়, শিকল বিশেষ। চোপসানো গাল, দাঁতহীন মাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে জিভ। সর্বাঙ্গে আবিরের মত ধুলো ছড়ানো।

আমি যে মানুষ, সেটা বোধহয় খেয়াল-ই নেই। যেন পাথরের মাঝে একখানি খুঁটি ধরে বুড়ি টাল সামলাচ্ছে, বিশ্রাম করছে। সরতে গেলে

পড়ে যাবে। কিন্তু আর-কিছু না হোক, বৃদ্ধা যা ভারী, তাতে আমাকেই টাল সামলাতে ব্যস্ত হতে হচ্ছে। কিন্তু বলব কাকে? যাকে বলব, সে তো ফিরেও দেখছে না। দু-হাতে শুধু জাপটে রয়েছে ধরে। আর আশ্চর্য! এমন একটা ব্যাপারের প্রতি এ ভিড়ের ভ্রূক্ষেপও নেই।

কয়েক মিনিট পর বৃদ্ধা হঠাৎ মুখ তুলল। তার মাথাটি দ্বিগুণ জোরে নড়ল ঠকঠক করে। চোখ দুটি গেল বুজে, মুখটি হাঁ হয়ে বেরিয়ে পড়ল দাঁত-হীন মাড়ি। এর নাম হাসি। সত্যি, যেন এক অনির্বচনীয় সুধা ঝরে পড়ল সারাটি মুখে। তারপর দু-হাত দিয়ে আমার মুখে মাথায় বুলিয়ে দিল হাত। দিয়ে আবার হাঁপাতে হাঁপাতে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

বুঝলাম, আমার কাজ ফুরিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে না গিয়ে, পুব দিকে এগিয়ে গেলাম। দক্ষিণদিকে ভাঙা পাঁচিলের বেষ্টনী, পুব ও উত্তরে পাতা-ঝরা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে আকাশ দিচ্ছে উঁকি। কিন্তু ওসব দিকে মানুষের বড় আনাগোনা দেখছিনে। সকলের ঠেলাঠেলি, মাথা কোটাকুটি মন্দিরের দরজায়।

দক্ষিনের ভাঙা পাঁচিলের উপরে উঁকি মেরে নীচে দেখলাম মানুষের স্রোত। কিন্তু এমনভাবে নেমে গিয়েছে টিলার ঢালু জমি, এত তার চার পাশে ছোট-খাটো সুড়ঙ্গ, যেন ভেরী বেজে উঠলে এখুনি তীরধনুক হাতে বেবিয়ে পড়বে শত শত সৈনিক। পুবদিকে গেলাম। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূর সমতলের অড়হরের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে উত্তর দিকের সমতলে, এদেশীয়া গ্রাম। আমাদের বাংলা চোখে কেমন যেন শ্রীহীন ঠেকে এই গ্রামগুলি। গ্রাম নয়, যেন বস্তি। খোলা-ছাওয়া চালাঘর। কোথাও বেড়া ও পাতার ছাউনি নেই। একটি হিন্দী প্রবাদ আছে,

> ছাজা বাজা কেশ।
> তিনো মিল্‌কে বাংলা দেশ॥
> চিনি······দহি॥
> বাংলামে নহি॥

কতখানি সত্য জানি নে। তবে, ঘরছাওয়া ও বাংলাদেশের ঢাকের বাজনা, এর সঙ্গে পাল্লা চলে না। আর এদেশের তুলনায়, বাঙালিনীর কেশরচনা

সেকথা বলতে হয় না রূপদর্শীকে। সেই করবী-বন্ধনে-বাঁধা বাঙালীর মন ও হৃদয় গাছের ফাঁকে ফাঁকে, ওই সমতলের গ্রামেও দেখছি ভিড়।

গ্রাম দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম। সামনেই একটি থোকা থোকা ফুলে-ভরা শজনে গাছ। নিজের দেশের গাঁয়ে পথে এর ছড়াছড়ি। কিন্তু এখানে, শজনে-সুন্দরীর এ বিচিত্র অঙ্গসজ্জা দেখে ভরে উঠল চোখ। ভেতরে আমার খুশি-বিষাদের ছায়া। মনে হল, কত যুগযুগান্ত না জানি আছি দেশ ছেড়ে। সেই বিরহ আমার ঘোচাল এবং বাড়াল এই ফুল শজনে।

সাদা সাদা ফুল। বোঁটায় তার কাঞ্চন বর্ণের ছোঁয়া। সোনা-রূপোর অজস্র ঐশ্বর্যে যুবতী শজনে হাসিতে খুশিতে তুলেছে মাথা। তারি মধ্যে নবীনার লাজে ভয়ে সর্বাঙ্গ তার কিছুটা বা নম্র। হালকা গন্ধে ভরে উঠেছে তার চারপাশ।

চমক ছিল আরও। শজনের নরম ডাল কেঁপে উঠছে থরো থরো করে। ফুল পড়ছে তলায়। উপুড় হয়ে ফুল কুড়োচ্ছে এক রক্তাম্বরী। কুড়োচ্ছে আর ভরছে কোঁচড়ে। ব্যাকুল হাতে কুড়োচ্ছে যেন পড়ে-যাওয়া অতুল্য ধন।

দেখতে দেখতে দেখলাম। চোখ ফেরাই-ফেরাই করেও দেখতে হল। রক্তাম্বরীর যে বাঁয়ে আঁচল। আঁচল বেঁধেছে কোমরে। যাকে বলে গাছ-কোমর। বাঙালিনী? এ যে বাংলা-গাঁয়ের পাড়ায় এসে পড়েছি।

মুখ তুলল রক্তাম্বরী। সর্বনাশ। এ যে সত্যি করালরূপিণী রক্তাম্বরী। কালো মেয়ে। মেয়ে নয়, কালো বউ। না, বউ নয়, আর কিছু। মাথায় তার ঘোমটা নেই। এলানো রুক্ষ চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে কোমরের নীচে। কাঁধ-হাতা দৃষ্টিকটু লাল জামা। নিরলঙ্কার দেহ। গলায় মালা রুদ্রাক্ষের। অস্পষ্ট সিঁথি লেপা সিঁদুরে। বাংলা সিঁদুরে। খাটো আঁটো শক্ত দেহ। বয়স অনুমান করা কঠিন। কিন্তু চোখ দুটি প্রকৃত রক্তাম্বরীর-ই বটে। জন্মের সময় কেউ বুঝি ফালা ফালা করে কেটে দিয়েছিল ওই চোখের ফাঁদ। নইলে অত বড় চোখ হয় কখনো? এ যে পটে-আঁকা কালীর আকর্ণবিস্তৃত চোখ।

ঘাড় ফিরিয়ে ওই বিশাল নিষ্পলক চোখে তাকাল সে আমার দিকে অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে তার কৌতূহল ও বিস্ময়। নাকি ক্রোধ ও সন্দেহ, বুঝতে পারলাম না।

ওদিকে কোলাহলের গুঞ্জন। আর এখানে, এই ঝরাপাতা-ছাওয়া, টিলার বনভূমি হঠাৎ যেন আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে রইল চোখের চাউনিতে। চকিত মুহূর্তে চারদিক নিঃশব্দ, স্তব্ধ হয়ে গেল।

এ কোন্ বনবিহারিণী কপালকুণ্ডলা পড়ল আমার চোখের সামনে। ঠোঁটে নেই তার বিচিত্র হাসি, ভ্রূলতায় নেই ত্রস্ত আহ্বান। কিন্তু এখুনি কি টিলা-ভূমির এ নিঃশব্দ বনাঞ্চলটুকু আচমকা বিস্ময়ে শিউরে উঠবে এ যুগের কপাল-কুণ্ডলার কথায়, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

কিন্তু ঘুমন্ত বনানীর স্বপ্নভঙ্গের মত শোনা গেল না সেই বিচিত্র কণ্ঠস্বর। উত্তরপ্রদেশের টিলাভূমি উঠল না শিউরে কুম্ভমেলার এই কপালকুণ্ডলার নতুন উপাখ্যানে, তার আগেই কাপালিকের প্রবেশ।

'নমস্তে বাবুজী, নমস্ত হই। কাঁহাসে আসতা হ্যায়?'

আসতা হ্যায়? ঘোর বাঙালী। পেছনে ফিরে দেখি, রক্তাম্বর। কালো মুখে আপ্যায়নের বিকট হাসি। লাল ধুতি, লাল চাদর। খোঁচা খোঁচা গোফ দাড়ি ও লাল চক্ষু। তাও আধবোজা, কিন্তু উজ্জ্বল। মাথায় পাগলের মত জট-পাকানো চুল। ওজন বোধহয় মণখানেক। গলায় রুদ্রাক্ষের বোঝা।

বলতে গেলাম, 'তুমি?' মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'আপনি?'

আধবোজা লাল চোখ বিস্ফারিত করে বলল সে, 'আজ্ঞে, আপনি বাঙালী? মানে, দেশের মানুষ?'

তা বটে। আমি যে এ যুগের প্যাণ্ট-অলেস্টার-শোভিত আধুনিক নবকুমার। কাপালিকদের নিশ্চয় ওতে বিলক্ষণ ভয় আছে। আমার জবাব শোনবার আগেই সে জবাব দিল। জোড় হাতে, নত হয়ে বিনয়ে গলে পড়ল, 'আজ্ঞে আমার নাম অদ্ভুতানন্দ ভৈরব। লোকে বলে ভূতানন্দ, নয়তো আজ্ঞে, ভূতবাবা। আমি কালীসাধক ভৈরব। নিবাস ছিল যশোরে। পাকিস্তান হয়ে গে, ধর্ম রক্ষে হয়-কি না-হয়, সেই ভয়ে আজ্ঞে এখন চব্বিশ

পরগনায় বারাসাতে আশ্রম করেছি। উনি, আজ্ঞে ওই মেয়েমানুষটি, আমার ভৈরবী। বড় আশা ছিল মনে প্রোয়াগে তীর্থদর্শন সাধন-ভজন করব। দিলাম আজ্ঞে পাড়ি জয় মা কালী কালী বলে। সে যাক। আজ্ঞে আপনের নিবাস ?

যাক। কথা তাহলে থামল ভূতানন্দ ভৈরবের। কথা তো নয়, যেন 'আজ্ঞে' সম্বোধনের মালা গাঁথা। কালীসাধক, কিন্তু কথায় দেখছি হার মানে বৈষ্ণব। বোধহয় যশোহরের হরিবংশের রক্ত আছে দেহে।

ওদিকে ভৈরবী নির্বিকার। সে ব্যস্ত ফুল কুড়োতে। বোধহয় নবকুমার থেকে আশ্বস্ত হয়েছে ভৈরবের দর্শনে ! জবাব দিতে গেলাম। তার আগেই ভূতানন্দ বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই, আজ্ঞে, কলকাতায় আপনার বাড়ি ?'

বললাম, 'কাছাকাছি।'

হাত জোড় করেই বলল, 'তবে আসেন আজ্ঞে, আমার আশ্রমে একটু ধূলা দে যান।' তবে, মানে কলকাতার কাছাকাছি বলে ? তাছাড়া এখানে আবার আশ্রম কোথায় ? তার উপরে ভূতানন্দের আশ্রম। ভয় অবশ্য নেই। শত হলেও আধুনিক কাপালিক তো বটে। বলি দিতে পারবে না।

গেলাম তার সঙ্গে। অদূর পুবেই গাছের মাঝখানে হোগলা-দিয়ে-ঘেরা ঘর। সামনেটি ঝাঁটপাট দেওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারপাশে শুকনো পাতার ডাঁই। অদ্ভুতানন্দ ভৈরবের আশ্রম। হোগলার মাথায় আবার একটি লাল কাপড়ের ফালি নিশান। চালার ভিতরে একটি টিনের রঙ-ওঠা সুটকেশ, অ্যালুমিনিয়ামের থালা দু-একটি। কম্বল-বিছানো বিচালি-শয্যা।

ভূতানন্দ তাড়াতাড়ি কম্বলের চেঁড়া টুকরো দিল পেতে। বলল, 'বসেন আজ্ঞে, মন খুলে একটু ধর্মের কথা কই। রাতে আজ্ঞে ভল্লুকের ভয় করে, দিনের বেলা কেউ মাড়ায় না এদিকে। আর বাঙালী আসে কি-না তাও জানি নে। যত পাঞ্জাবী আর মাড়োয়ারী, কি বলব আজ্ঞে আপনাকে, যথার্থ জোয়ান জোয়ান মেয়েমানুষ, মহা মহা সব সুন্দরীও বটে, আমার আশ্রমের চারপাশে সব, কী বলব, একেবারে দিনমানে, কী বলে, একেবারে ইয়ে করতে বসে। আমি সেরকম মানুষ নই আজ্ঞে, তাই। নইলে পরে আজ্ঞে,

খ্যাঁকাড়ি দিলেও শোনে না; অথচ, আমার এখানে না হলে সাধনা চলে না। যাক, আপনি যখন এসেছেন—

কথা তার থামল। বুঝলাম, তখন আজ্ঞে, আসুন একটু ধর্মালোচনা করা যাক। কিন্তু আমার মুখে যে ধর্মের বুলি ফুটবে না।

এদিকে ভৈরবী একটি অ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে পা ছড়িয়ে বসল অদূরে। কোঁচড় থেকে ঢালল শজনে ফুলের গোছা। তার পর বিশাল চোখ দিয়ে আগে দেখল আমাকে, তারপর তার ভৈরবকে। মনে হল একটু যেন ফুলে উঠল নাকের পাটা, ওই চোখেও বা একটু অগ্নিঝলক।

ভৈরবীর চোখে মুখে, গায়ে পায়ে, বসায় নড়ায় একটা আসন্ন দুর্যোগ্যের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে যেন। ভৈরবী যখন, তখন চোখে কিঞ্চিৎ অগ্নিঝিলিক থাকাই হয়তো স্বাভাবিক। পাকানো পাকানো ভাবটিও অস্বাভাবিক নয় হয়তো। কিন্তু ভাব-ভঙ্গিটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না।

কিন্তু ভূতানন্দের সেদিকে খেয়াল-ই নেই। সে দিব্যি জমিয়ে বসে বলল, 'আচ্ছা দাদাবাবু'।

দাদাবাবু? ভূতবাবা দেখছি আত্মীয়তাতেও দুরন্ত। বুঝলাম ধর্মালোচনার ভূমিকা বিস্তার করা হচ্ছে। কিন্তু ভূতানন্দের গোল রক্ত চোখের ভাবটি যেন, আটঘাট বেঁধে পাতা হচ্ছে কোন বিশেষ ফাঁদ। একবার ধরতে পারলে আর রেহাই নেই। হঠাৎ চোখ বুজে, ভ্রূ দুটি কপালে তুলে বলল, 'বলেন তো, জগৎটি কার?'

সর্বনাশ! এমন বিরাট প্রশ্ন! ঝুসি-টিলার এ নির্জন স্থানে, এতবড় দার্শনিক প্রশ্নও অপেক্ষা করে ছিল আমার জন্য তা জানতাম না। আর প্রশ্নের পরেই ভূতানন্দের চাপা চাপা হাসি, মৃদু মৃদু ঘাড়দোলানি। অর্থাৎ, সহজ কথা নয়। জবাব দিয়ে তবে উঠুন।

জবাব শুনে ভূতবাবা খুশী হবে কি-না জানি নে। তবু বললাম, দেখে শুনে তো মনে হয়, জগৎটা মানুষেরই।'

ভূতানন্দ খুশী হয়েছে বোঝা গেল। চকিতের জন্য চোখ দুটি খুলে, আবার বুজিয়ে বলল, 'বেশ বেশ, অর্ধেকখানি বলেছেন। কিন্তু কোন্ মানুষের?'

কোন্ মানুষের? কোন্ মানুষের আবার। আমাদের মত মানুষেরই। বললাম, 'বুঝলাম না তো।'

সে চোখ বুজেই বলল, 'বুঝলেন না?' চোখ খুলে বলল, 'পুরুষ মানুষের না মেয়ামানুষের আঁজ্ঞে?'

মানুষের এ ভাগাভাগি রীতিতে তো কখনো বিচার করে দেখি নি। কিন্তু ভূতানন্দ যে রকম চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে, বোঝা গেল ওইটাই তার আসল প্রশ্ন। যদি বলি, উভয়েরই, তা হলেই সঠিক জবাব হয়। কিন্তু তার মনঃপূত হবে কি? তার চেয়ে ভূতানন্দের জবাবটাই শোনা যাক। বললাম, 'তা তো ঠিক জানি নে।'

ভূতানন্দের হাসি ও দ্রুত ঘাড়দোলানিতে বোঝা গেল, আমার এ অজ্ঞতাই সে আশা করেছিল। তারপর এক খাবলা মাটি তুলে বলল, 'এর নাম কি আজ্ঞে?'

শঙ্কিত হলাম। ভূতানন্দ কোন ভৌতিক ভেলকি দেখাবে না তো? বললাম 'মাটি।'

ভূতানন্দ বলল, 'আঁজ্ঞে ঠিক! মা-টি। অর্থাৎ?'

বলেই চকিত ভৈরবীর দিকে ফিরে বলল, 'কানটা এদিকে খাড়া রাখিস গো চণ্ডিকে।'

চণ্ডিকে অর্থাৎ ভৈরবী, বোঝা গেল। কানটা খাড়া রাখতে হবে কেন, বুঝলাম না। কিন্তু ফিরে দেখি, অন্য রকম। ভৈরবীর বিশাল চোখজোড়া দপদপিয়ে উঠল বারকয়েক। ঠোঁটের কোণে বাঁকা ঝিলিকে তার কপট হাসি না দুরন্ত রাগ, বোঝা মুশকিল। তারপর কান খাড়া করল কি-না বুঝলাম না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, সারা দেহে তার একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল। দেখা গেল, সেই তরঙ্গের ধাক্কায় সে অন্যদিকে ফিরে বসেছে। কে জানে, ওইটিই কান খাড়া করার ভঙ্গি হয়তো!

ভূতানন্দ ফিরে দেখল না সেদিকে। সে ভ্রূ নাচিয়ে বলে চলল, 'এই মাটি আঁজ্ঞে, আমার মা তা হইলে ? আমার মা-টি! অর্থাৎ কি-না, মা ধরিত্রী। তা হইলে, জগৎমণি হইলেন মেয়ামানুষ। কেমন কি-না দাদাবাবু ?

ধরিত্রীকে যখন মা বলেছি, তখন ভূতানন্দের ভাষায় মেয়ামানুষ বলতে আপত্তি কি। বললাম, 'তাই হবে।'

একমণী মাথাটিকে বোঁ করে আর-এক পাক ঘুরিয়ে একেবারে নিশ্চল হল ভূতানন্দ। বলল, 'তা হইলে মায়েরও মা আছেন, কেমন কি-না আঁজ্ঞে ?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিতে হল। মা থাকলে, তাঁর মা থাকবেন, এতে আর সন্দেহ কি।

ভূতানন্দ বিস্ফারিত চোখে, ভয়ঙ্কর হেসে বলল, 'তবে সেই মা কে ?

তা তো জানি নে। আমার এ অজ্ঞতা দেখে ভূতানন্দ খুশী বই দুঃখিত নয়। গলা নামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল সে, 'হুঁ হুঁ, তেনার নাম জগৎমাতা জগত্তারিণী, শক্তিরূপিণী মা কালী। উনিই আঁজ্ঞে জম্মো দিলেন, দিয়ে আবার খেলতে লাগলেন। এর নাম মায়ের নীলে।'

বলতে বলতেই আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে, গলা আরও নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কিন্তুন্ একটা কথা হলপ করে কইতে পারি, প্রোয়াগে আঁজ্ঞে মা কালী নাই।'

চমৎকৃত হলাম। এতবড় গুহ্য সংবাদ তো আমার জানা ছিল না। বললাম, 'তাই নাকি ?'

'তবে আর আপনারে কী বলতেছি আঁজ্ঞে ? সারা মেলাটা টহল দিয়া আসেন, একটা মানুষের মুখে যদি, হুস্ হুস্…'

কথার মাঝেই ভূতানন্দ হাততালি দিয়ে উঠল। দেখলাম, সামনের গাছটিতে দুটি কাক এসে ডাকছে কা কা করে। তাড়া খেয়ে কাক দুটো পালাল। ভূতানন্দ বিরক্ত হয়ে বলল, 'মা নাই, মায়ের চ্যালারা সব ঠিক আছে। ওই যে দেখলেন, গায়ের রঙ কালো। ওই কালো কাউয়া আর কুকিল, সব মায়ের চ্যালা। কিন্তুন্ ডাকের ভেদ দেখছেন তো ? আচ্ছা,

একটু রয়েন, চ্যালা যখন আসছে, শান্তিতে বসতে দিবে না। এট্টু জমিয়ে বসা যাক।'

বলে সে তড়াক করে উঠে, দিব্যি তরতর করে সামনের গাছটায় উঠতে লাগল। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, গাছটি প্রাচীন ও মস্তবড় নিমগাছ। আশ্চর্য! কাক তাড়াতে ভূতানন্দ একেবারে গাছে উঠে বসল। এ যে পাঁচু-গোপালের থেকে আর-এক কাঠি উপরে।

ভৈরবীও দেখলাম, ওইদিকেই তাকিয়ে আছে। থাকতে থাকতেই তার সরু ও তীব্র চাপা গলায় ঝঙ্কার শোনা গেল, 'মরণ। মুখে আগুন!'

এই তার প্রথম কথা। জানি নে, উত্তরপ্রদেশের এ টিলাভূমি তার হাজার হাজার বছরের জীবনে এমন কড়া পাকের বিচিত্র বাংলা কথা কটি আর কোন দিন শুনেছে কি-না। কিন্তু ওই শব্দেই যেন চমকে উঠল নির্জন টিলাভূমি। মড়মড়িয়ে উঠল শুকনো পাতা। আর আমার কানের মধ্য দিয়ে এক নতুন স্বর গিয়ে পশল মরমে। একথার স্বাদ মিষ্টি নয়, ঝাল। কিন্তু বড় মিষ্টি ঝাল।

একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

প্রশ্ন শুনে, ভৈরবীর রাগান্বিত কালো মুখে যেন হঠাৎ হাসির জগজগার ঝিকিমিকি দেখা দিল। যাকে বলে রাগের হাসি। বলল, 'বিষ।'

বিষ! আমার অবাক মুখ দেখে ভৈরবীর হাসি একটু দুর্জয় হল। বলল, 'আপনেগো ভৈরব কয়, মা কালীর চন্নামিরতো। মুণ্ড! ওইতে ওনার নিশার মরণ হয়।'

নিশা অর্থ নেশা। কিন্তু নিমগাছের রসে? জানা ছিল না। আর জানতাম না সেজন্য কেউ আবার এমন আয়োজনও করতে পারে। ফিরে দেখি, এক হাতে ডাল ধরে, আর-এক হাতে একটি সের-পরিমাণ টিনের কৌটা নামিয়ে আনছে ভূতানন্দ। যেখান থেকে টিনটি খুলেছে, সেখান থেকে তেলের গাদের মত রসের ধারা নেমে এসেছে কালো নিমডালের গা বেয়ে।

ভৈরবী আবার আমার দিকে ফিরে বলল, 'বোঝলেন গো দাদাবাবু? ওই যে কইল না, এখানে ছাড়া ওনার সাধনা হয় না, তা এই মরণ-রসের জন্যে। এ ছেড়ে যাবে কম্‌নে?'

কথা কটি নীচু গলায় বলল ভৈরবী। বসে হাসতে গিয়ে একটা বিষাদের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে। হাসল। কিন্তু হাসিটি করুণ হয়ে উঠল হঠাৎ।

ভূতানন্দ খুশী মোরগার মত তড়িঘড়ি এসে বসল টিন নিয়ে। বলল, 'কই গো চণ্ডিকে, এট্টু ন্যাকড়াখানি দেও। ছেঁকে নিই।'

আমার দিকে ফিরে বলল, 'সবই আমার মায়ের নীলে আঁজ্ঞে। মা নেই কিন্তন্‌ মায়ের প্রেত্যক্ষ কিরপা আছেন সবখানে। নইলে বলেন আঁজ্ঞে দাদাবাবু, মায়ের এমন পদোদকের ভাণ্ডটি কে আমার জন্যে এখানে রেখে দিল। কী বলব আঁজ্ঞে, যথার্থ ভালো বস্তু, অমর্তভুল্য। আপনারা আঁজ্ঞে লেখাপড়া-জানা ভদ্দরলোকের ছেলে, নইলে, ঘাটাঘাটি ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে এমন পবিত্তর বস্তু, কী বলব।'

তার 'কী বলব'র মানে বোধ হয়, আঁজ্ঞে দাদাবাবু আপনিও একবার চোখে দেখতে পারেন। বুঝলাম, কিন্তু নিমের রস নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কটু স্বাদ হবে। খাবে কী করে? জিজ্ঞেস করলাম, 'খাবে কী করে? তেতো হবে না।

ভূতানন্দের মুখে বোধহয় রসের ধারা বইতে আরম্ভ করেছে। তাড়াতাড়ি ঝোল টেনে বলল, 'তিতা? আজ্ঞে, কথাই তো আছে, আগে তিতা পাছে মিঠা। ভোজনে বসে আগে নিমপাতা ভাজা খান না? আগে তো তিতাই লাগবে। সুখের আগে আঁজ্ঞে দুঃখু। নইলে সুখ হজম হইবে না। বসেন, আজকে সাক্ষাৎ কথা বলব আপনাকে।'

বলে আবার তাড়া দিল, 'কই লো চণ্ডিকে, ন্যাকড়াখানি দিবি না এমনি ঢেলে দেব?'

কিন্তু চণ্ডিকের গরজ বড় বালাই। হঠাৎ শজনে ফুল মাটিতে রেখে, এলো চুলে ঝাঁকানি দিয়ে রক্তাম্বরী ফণা তুলল। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'বড় যে কালী কালী হচ্ছে, বলি নজ্জা করে না?

দুর্বিপাক। বুঝলাম আমার ওঠার সময় হয়েছে। ভূতানন্দ নিতান্ত বিস্মিত হতভম্ব হয়ে বলল, 'এই ছাখো, কী হইল তোর?'

চণ্ডিকে উত্তেজনাবশত দু-হাত তুলে আঁট করে বাঁধল চুল। ঠোঁট বেঁকিয়ে তেমনি তীব্র গলায় বলল, 'কী হইল, তার মরণ-ই তো দেখছি। ভদ্দরনোকের সামনে কইব সে কথা, অ্যাঁ? বড় যে কালী কালী হচ্ছে, বলি নজ্জা করে না?'

কে বলবে, এটা এলাহাবাদ। কে বলবে, প্রয়াগের কুম্ভমেলা। কে বলবে; এ সেই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুর। এখানে বসে যে বাংলাদেশের গেঁয়ো কোঁদল শুনছি। কোথা থেকে কোথায় এলাম, অমৃতের সন্ধানে। এ যে চিরকালের অমৃত বর্ষণ আরম্ভ করল চণ্ডিকে আর ভৈরব। ফেলে পালানো ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু ততক্ষণে ভৈরব ভৈরবমূর্তিতে উঠেছে দাঁড়িয়ে। গায়ের রক্তবর্ণ উত্তরীয় টান মেরে কোমরে বেঁধে চীৎকার করে উঠল, 'কী! কালীনামের নিন্দে করছিস তুই? এত বড় সাহস?'

ভৈরবী চীৎকার করে না। চিবিয়ে চিবিয়ে বিঁধিয়ে বলে, 'কালী নিন্দে করব ক্যান? তোমার গুণ গাইছি যে গো। বলি, আর-কত দিন চালাইবে এমনি করে। এত যে হাঁকাহাঁকি, ও চণ্ডিকে, শজনে ফুল তুলে নিয়ে আয়, চচ্চড়ি হইবে। তা কোন্ কালী দিয়া চচ্চড়ি হইবে?'

ভূতানন্দ আমাকে সাক্ষী মেনে বলল, 'দেখেন, দেখেন আঁজ্ঞে দাদাবাবু, সাবধান করে দেন, নইলে বলি হইয়ে যাবে, এই বলে দিলাম।'

কি বিপদ। নিজের সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। তার উপর আবার ভৈরবীকে। সে ক্ষমতা আমার নেই।

ভূতানন্দই আবার বলে উঠল, 'খুন হইবি চণ্ডিকে। আজ তোর বাপের কেষ্টোরই একদিন কি, আমারই একদিন। খবোরদার।'

বুঝলাম না কে বাপের কেষ্ট। ভৈরবের মূর্তি দেখলে আতঙ্ক হয়। কিন্তু চণ্ডিকে অবলীলাক্রমে এই মূর্তির আরও সামনে গিয়ে বলল, 'আমার বাপের কেষ্টোর গুণ আছে। তোমারই কালীনামের মুরোদ নাই। ওই

যে বলে না, মুরোদ বড় মান, তানার ছেড়া দুইখান কান। জানলেন গো দাদাবাবু…'

কী জানব, জানি নে। কিন্তু প্রমাদ বড় ভারি। তবু ফিরে তাকাতে হল ভৈরবীর দিকে। সে তার লাল আঁচলখানি আরও কষে বেঁধে বলল, 'তখন বোলে কত কথা। রেলের টিকিট ফাঁকি দিয়া আসলো, কইলাম, ওইখানে গিয়া গিলবো কি? বললে, চল্ না, নাখ নাখ নোক আসবে, আর দেদার চাল ডাল পয়সা দিবে। খাওয়ার আবার ভাবনা? নোকে যেচে দিবে। তা নোক এখানে কী করতে আসে, সে তো শুনলেন ওনার নিজের মুখে। দিনরাত ওই মরণ রস পাড়তিছে আর গিলতিছে। দু-দিন ধইরা দাঁতে কুটা কাটি নাই গো দাদাবাবু, কুটা কাটি নাই। শীতে মইলাম, এক কণা আগুন নাই। এত এত সাধু হাত পেইতে বেড়াইতেছে, উনি নীচে লামতে পারেন না। অমন গোটো গোটো ফুলগুলান কি কাঁচা চিবুবো?' বলতে বলতে গলাটা ধরে এল যেন ভৈরবীর।

কিন্তু ভূতানন্দ এতবড় অপমান আর সইতে পারল না কিছুতেই। বিশেষ আমার মত একজন অপর ভদ্রলোকের সামনে। কোথায় মৌজ করে একটু ধর্মালোচনা চলবে, তা নয়, শেষে, মুরোদ নিয়ে টানাটানি! বড় দুর্বল স্থানে ঘা দিয়েছে ভৈরবী। তাই আমার দিকে আর ফিরে তাকাতে পারছে না ভূতানন্দ। মানুষের সম্মানে আঘাত লাগলে সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সে সম্মান যদি মিথ্যে হয়, তবে তা সহ্য করা আরও মুশকিল। তখন সে আত্মরক্ষার জন্য শেষ উপায় অবলম্বন করে। ভূতানন্দের অবস্থা যেন খানিকটা তাই। সে রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে বলল, 'তোর মত মেয়েমানুষের মুখে এতবড় কথা। বজ্জাত, নষ্ট মেয়েমানুষ কমনেকার। তুই কি আমার ঘরের মাগ যে, তোরে দু-বেলা খাওয়াব বলে কিরা কাটছি মা কালীর দোরে—অ্যা?'

চণ্ডিকা মুহূর্তে মাথা তুলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। কী চোখ! বিশাল চোখ দুটিতে তার সত্যি আগুন ঠিকরে পড়ছে। লাল কাপড়ে ঢাকা তার বলিষ্ঠ দেহে কী অপূর্ব তেজ! দুদিনের উপোসী কালো মুখে তার কেউটের

ফণার মত চমকানি। ভৈরবীর রূপ আছে কি-না, সন্ধান করে দেখি নি কিন্তু কালো মেয়ের এমন বিচিত্র, ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ আর কখনো দেখি নি। জানি নে, এমন রূপের সামনে কোন পুরুষ কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে কি-না। কিন্তু ভূতানন্দ পারল না।

বোঝা গেল, ভূতানন্দ দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই সম্মুখ সমর ছেড়ে সে আচমকা পেছন থেকে আক্রমণ করেছে চণ্ডিকাকে। কিন্তু, মানুষ একবার যখন দুর্বলতাবশত পেচনে আশ্রয় নেয়, তখন তার পরাজয় অনিবার্য। সেই পরাজয়েরই শেষ ধাপে নামল ভূতানন্দ। লাথি মেরে ফেলে দিল সে তার অতি সাধের মাতৃপাদোদক। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'রইল তোর লজ্জা আর মুরোদ! চললাম আমি। মর তুই এখানে। আর খোলকরতাল এনে তোর বাপের কেষ্টোর ভজনা কর, লোক জুটবে'খুনি।'

বলে দুপদাপ করে সোজা উত্তরদিকে গাছের আড়ালে আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাসতে হাসতে মাথা ব্যথা। কোথা থেকে কী হয়ে গেল। মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম যেন আপদবিশেষ। কোন্ এক অদৃশ্য অপরাধের খোঁচা এসে যেন লাগল আমার মনে। মনে হল অপরাধের মূল আমি। আমি না থাকলে, এমনি করে হয়তো বলত না ভৈরবী। সম্মানহানিতে অতখানি ক্ষিপ্ত হত না ভূতানন্দ।

কোথায় সমুদ্রগুপ্তের কূপ। আর কোথায় কী!

ফিরে যেতে উদ্যত হলাম। তবু যাওয়ার আগে একবার ভৈরবীর দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। কিন্তু তাকিয়ে আর পা উঠল না। থমকে দাঁড়ালাম।

ভৈরবীর গাল বেয়ে নেমেছে জলের ধারা। কী সান্ত্বনা দেব। যাদের কোনদিন দেখি নি, জানি নে পরিচয়, তাদের হঠাৎ কলহের মাঝে কী কথা বলব। যেটুকু জানি, সেটুকু তাদের উপোসের বেদনার কথা। আর যেটুকু ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছে ভূতবাবা, তাকে ভিত্তি করে সান্ত্বনা দেওয়া আমার সাজে না।

তবু এই টিলাভূমির নিরালা গাছের ছায়ায় ওই চোখের জল দেখে বিদায় নিতে বাধল। নিতে হবে জানি। তবু, এই মুহূর্তে পারলাম না।

হঠাৎ ভৈরবী আদুরে বউটির মত বলে উঠল, 'দেখলেন তো দাদাবাবু, কেমন করে কইয়া গেল। আজ দশ বছর তোমার সঙ্গে রইছি, আমি কী তোমার কেউ নয়? ওই কথা কইয়া আমারে অষ্টপোহর যাতনা দেয়। তোমার বউ না হইতে পারি, বউয়ের চাইতে বড়, আমি তোমার ভৈরবী। তোমার ধম্মে আমি, কম্মে আমি। তোমার সুখ আমি, দুঃখু আমি। কি বলেন গো দাদাবাবু, অ্যাঁ? কী আর কইছি। দুইদিন খাই নাই, শরীলে তো এট্টু কষ্টও হয়। কিন্তন্, দেখলেন তো'—বলতে বলতে তার ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠে, বিশাল চোখে অশ্রুর বান ডাকল। আর দূরদেশের এ টিলাতে দাঁড়িয়ে আমার বুকের মধ্যে ভরে উঠল চাপা বেদনা। ভৈরবীর ক্ষুধাও আত্মপ্রকাশ করেছিল, তেমনি এবার আত্মপ্রকাশ করল এক প্রেমবতী নারী।

চোখের জল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ভৈরবী আবার বলল, 'বল, আমি কি তোমার কেউ নয়? সাত পাক ঘুরি নাই ঠিক। ষোল বছরের মেয়া আইজ তিরিশ হইল। দাদাবাবু, এই চইদ্দ বছরে কত লক্ষ পাক দিছি তা জানেন ভগবান। উনি তো সাক্ষী আছেন! তবে? তবে ক্যান দেও ওই খোঁটা? আমি দুঃখু পাইলে তোমার পাপ হইবে না? আমার পুন্যি তোমারে লাগবে না? মা কালীর নামে ইস্তিরি হইছি, ছান্নাতলার বিয়ার চাইতে কি তা কম? ক্ষুধায়ও তুমি, ভরা পেটেও তুমি। আর কারে কইব গো, অ্যাঁ? আর কারে কইব?'

জল-ভরা মুখখানি কাছে এনে সে যেন আমাকেই বলল। আমাকে জিজ্ঞেস করল। বলে সে নতমুখে, এলো চুলে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে।

কোথায় রোষবহ্নি। কোথায় বা চণ্ডিকার চণ্ডালিনী মূর্তি। ক্ষুধা ও প্রেমের অপমানে দুর্ভাগ্যবতী অশ্রু-অন্ধ সেই চিরদিনের পাড়াঘরের মেয়েটি। এই বিরাট তীর্থক্ষেত্রে যখন সবাই দানে ধ্যানে ধর্মে ব্যস্ত-ত্রস্ত-উন্মত্ত, যখন আপন মনে মানুষ অরণ্যের বুকে খুশী বিহঙ্গটির মত ফিরছে মনের আশ মিটিয়ে তখন সে আমার সামনে খুলে ধরল মানুষের হৃদয় ও দেহের, বাস্তব ও

বিচিত্রের এক রূপমহলের দরজা। ভাবি, এই তো বিশ্বের সবটুকু রূপ। হৃদয় ও জঠরের কামনা বাসনা সৌন্দর্য-ই তো অপরূপ। এর শেষ নেই। এর বাড়া বৈচিত্র্য কই? এর রূপ বদলে দিল আবার আমার সুর। তাই তো নিয়ম। সুর তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু রূপান্তর—ভয়রোঁ থেকে গজল, গজল থেকে পূরবী, পূরবী থেকে ইমন, ইমন থেকে বেহাগের অশ্রুভরা অন্ধকার রাতে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকব মৌন নক্ষত্রের চোখে।

তাই তো! থামবার কী আছে। কী আছে নিরানন্দের। সে তো আমার চলার পথের পায়ে দিয়েছে নতুন চলার রস। সংযোজন করল নতুন সুর।

ফিরে তাকালাম। ভূতানন্দের আশ্রম নয়, কুঁড়েঘর। সূর্য খানিক বেঁকেছে মাঝ আকাশের কোল থেকে। নিম, তেঁতুল, শজনে, পিপুলের ছায়া ঝিলিমিলি। নতমুখী রক্তাম্বরী কালো মেয়ে। পায়ের কাছে তার অভুক্ত হাতের ছোঁয়া শজনে ফুল। মধুলোভী মৌমাছি এসেছে ছুটে, গন্ধে গন্ধে।

ভাবি, নিজের চোখজোড়ার মন ফিরিয়ে দেখি, সারা দেশে এমনি কত কুঁড়ের কত ঝি-বউয়ের পায়ের কাছে পড়ে আছে শজনে ফুলের গোছা। এক ছিটে নুন, দু-ফোঁটা তেল আর এক কাঁসি ভাতের অভাবে এমনি কত শজনে ফুলের গোছা গিয়েছে শুকিয়ে। জানি, যে শুধু করুণার জল দিয়ে ভেজাতে চায় এ বিশ্বের চিঁড়ে, সেও করুনার পাত্র। করুণা করতেও চাই নে। জানি আমারও 'মুরোদ বড় মান।' আমার মত মানুষকে দান ধ্যান করে শুধু ছেঁড়া কান-ই দেখতে হবে। জানি, তবু সমুদ্রগুপ্তের টিলার উপর এ অভাবিত শজনে ফুলের গোছাও যদি যায় শুকিয়ে, তবে নিয়ত মরুবাসের যে রসটুকু সান্ত্বনা, তাও যে হারিয়ে যাবে বিষবাষ্পে।

অনেক দ্বিধা করে হাত দিলাম পকেটে। ডাকলাম, 'ভৈরবী!'

ভৈরবী আচমকা ঘোমটা তুলে বলল, 'আমার নাম তো ভৈরবী নয় দাদাবাবু।'

বললাম, 'তবে বুঝি চণ্ডিকা?'

তার উপোসী শুকনো মুখে এখনো জলের দাগ। সেই মুখে তার অপূর্ব লজ্জিত হাসি। বলল, 'না।'

'তবে?'

'আমার নাম ময়লা।' বলতে তার কালো মুখে চিরুনির মত সাদা দাঁতের সারি ঝকমক করে উঠল। বলেও তার এত আনন্দ, উপোসী মুখখানিও ভরে উঠল আলোয়। চমকে ভাবলাম, রহস্য নয় তো!

বললাম, 'ময়লা? সে আবার কী?'

সে বলল, 'আমার নাম গো! বড় যে কালো। তাই ছোটকালে নাম রাখছিল ময়লা।'

বলার সুযোগ পেলাম। যদি কাটিয়ে ওঠা যায় গ্লানিটুকু। বললাম, 'ময়লা কোথায়? দিব্যি ঝকঝকে দেখছি।'

কাজ করল ওষুধটি। ময়লা হেসে উঠল সশব্দে। তবু কী বিচিত্র! চোখের জলের দাগটুকু আছে গালে।

বললাম, 'আমি কিন্তু আলোই বলব।' বলে পকেট থেকে পয়সা নিয়ে বললাম, 'তা আলো-ভৈরবী, কিছু মনে কোরো না। দেখা হয়ে গেল পথে, এইটুকুনি লাভ। আবার কে কোথায় যাব! পয়সা কটি রাখো, শজনে ফুলের চচ্চড়ি কিন্তু রেঁধো আজ, কেমন?'

কিন্তু গোলযোগ ঘটল। ভেবেছিলাম মেঘ কেটেছে। তবে যে হঠাৎ আবার তার চোখে জল। তাড়াতাড়ি আমার আসনখানি তার লাল আঁচল দিয়ে বৃথাই ঝেড়ে দিল। বৃথা, কেন-না ধুলো যাবার নয়। দিয়ে ধরা গলায় বলল, 'একটু বসেন।'

অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করলাম। ময়লা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় তবে ভুল করেছে। পথের নিয়ম ঘরে চলে না, ঘরের নয় পথে। আমরা পরস্পর কৃতজ্ঞ এই পথের দেখাদেখিতে। পর মুহূর্তেই দুশ্চিন্তা হল। বললাম, 'ভূতানন্দ ফিরে আসবে তো!'

সে বলল, 'আসবে না? যাইবে কমনে? স্থান, পয়সা স্থান।'

বলে, নিঃসঙ্কোচে হাত পাতল। দিলাম। পয়সা কটি আঁচলে বেঁধে, জল চোখে টিপে হেসে বলল, 'ওইরকম কয়। শোনা আমার কপাল দাদাবাবু। কিন্তন্ সামনে যদি থালায় কইরা কিছু দিতে পারি, তখন কালী নামে কি হাসনের ফোয়ার', একবার দেইখ্যা যাইয়েন। সুখ বড় বেইমান। ত্যাখন যে দুঃখুর কথা মনে থাকে না। মানুষটারে চিনি তো! বলতে বলতে তার কালো মুখে সলজ্জ হাসি ফুটল। লজ্জিত ত্রস্ত চোখে একবার আমার দিকে চেয়ে নত করল মুখ। বড় বিচিত্র তার এ লজ্জা হাসি কান্না। আমাকে মাঝে রেখে মনের কোন্ গোপন লীলাখেলায় লীলাবর্তী হয়ে উঠল সে। বললাম 'কিছু বলবে?'

ভৈরবীর এত লজ্জাও ছিল! ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। তারপর, তার ডাগর চোখ দুটি মেলে দিল পুবে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূর আকাশের দিকে। বলল, 'দাদাবাবু, মানুষটার উপর রাগ করবেন না। ও-ই রকম। ছোটকাল থেইকে জানি, ও সাপুড়ে, ডাকাবুকো। আমি ঘোর বোষ্টমের মেয়া। দেখলে চোখ বুজতাম। ওই যে কইল না, তোর বাবার কেষ্টর-ই একদিন, কি আমার-ই একদিন। আমার বাপ যে কেষ্টভক্ত বোষ্টম, তাই। খোঁটা দিল। তা দাদাবাবু বোষ্টমের মেয়া, ওনার কাছ থেকে তফাতে-ই থাকতাম। ত্যাখন আমার ডাগর বয়স। তা ওই মানুষটি য্যাখন-ত্যাখন আমার আগু-পাছু ফিরত, চোরের মত আড়ে আড়ে দেখত, চখে চখে পড়লে হেইসে বলত, ময়লা, কী বাহার তোর কালো রঙখানি। শুইনে ভয় হইত, আর কী হইত আইজও জানি না। নোকে কইত, কালী ময়লার যে রূপ আর ধরে না। ক্যান, কী জানি। তারপরে, একদিন তিনো সইন্ধ্যেবেলা আড়ালে আমার হাত দুইখান ধরে কইল, 'ময়লা, তোর মধ্যে যে মা কালীর অংশ রইছে লো। তোরে আমার চাই।' চাই কইলেই চাওয়া? কী সাহস! ডরে মরি। কয় কী? তবু, মেয়েমানুষের মন তো। কইলাম, কী যে মনে লইল, হেইসে হেইসে কইলাম, 'ওমা! ছি, আমি কালা পেঁচি, কালামুখী, মা কালীর নাম-টাম কইও না বাপু।' কে শোনে। কইল, 'আমি যে দেখি। মা কালীর সঙ্গে আমার কথা, খাওয়া, বসা। তিনি কইলেন, ময়লা আমার পরান।

আমিও যে চখ বুজলে তাই দেখি ময়লা। তোর হাসি কথা, চখের তরাসে তুই সাক্ষাত কালী। তোরে লইলে, নিজের চিতা নিজেরে জ্বালাইতে হইবে।' শোনেন কথা।…'

বলে হেসে উঠল ময়লা। চোখের জলে, কৈশোরের স্মৃতিতে, হাসি কান্নায় কী বিচিত্র রঙের ছোঁয়া লাগিয়ে দিলে সে আমার পথ-চলা ব্যস্ত মনে। আমি জানি, উত্তরপ্রদেশের এ টিলার বুকেও সে লাগিয়ে দিল ওই রঙের ছোপ।

হেসে বলল, 'মনে মনে বুজলাম, ময়লা, এইবার মলি। কইলাম, 'হুঁ, তুমি তো সবই দেখতে পাও। ভূত-পেরেতও নাকি দেখতে পাও। আমারে এট্টু দেখাইতে পার?' কইল, 'খুব পারি। আমি থাকব লাটাই চণ্ডিতলায় কাল সন্দেয়, আসিস্, ডরাইস্ না, দেখাইব।' গেছিলাম দাদাবাবু, সত্য কই আমায় ভূত দেখাইল।'

অবাক হয়ে বললাম, 'ভূত দেখতে পেলে?'

বলল, 'হ্যাঁ দাদাবাবু।'

হাসি পেল। চেপে গেলাম। অমন সহজ স্বীকৃতি ময়লা ভৈরবীর দ্বারাই বোধহয় সম্ভব। তবু বললাম, 'কেমন দেখলে? কী দেখলে?'

নিরাভরণ হাতখানি শূন্যে মেলে দিয়ে বলল, 'কী জানি কী দেখলাম। চখ অন্ধকার, কী দেখাইল, উনি-ই জানেন। খালি বুজলাম, সোম্‌সার ওনার বশ। দেব দেবী যক্ষ রক্ষ, সব-ই ওনার গুণবশ। আমিও বশ হইলাম। এমন বশ হইলাম, বোষ্টমের মেয়া হইয়া কালী ভক্তের সঙ্গে সেই রাত্রেই লাটাইচণ্ডিতলা থেইকেই সকলের মায়া কাটাইয়া ওনার সঙ্গে বার হইয়া গেলাম। সেই থেইকে, ওনার-ই সঙ্গে সঙ্গে। দাদাবাবু, উনি যাইবে কম্‌নে? এমননি কতবার গেল, কতবার আসল। যাওয়া আসা নিয়া সোম্‌সার। আর যদি ময়লা হই তোমার জীবনে, তবে ধুইয়া সাফ কইরে যাও, নইলে ময়লা কি সঙ্গ ছাড়ে।'

হাসতে গিয়ে কাঁদল। বলল, 'তবু দাদাবাবু আইজ আমার কী পুন্যি গো! এখানে চাইলের বড় দাম, আলা চাইল; পঁচিশ তিরিশ টাকা মোন।

তবু, ওনার সামনে শইজনে ফোলের চচ্চড়ি দিয়া হাত-পোড়া গরম ভাত দুইটে দিতে পারব, নিজেও পাইব। যা শীত! সাপের ছোবল। গতরে এট্টু যুত পাইব, কালীনামের ফোয়ারা ছোটব। দাদাবাবু আপনারে পেন্নাম করি।'

ছি ছি ছি, একে রক্তাম্বরী, তায় ভৈরবী। উঠে দাঁড়ালাম তাড়াতাড়ি। সেই করুণা ও কৃতজ্ঞতা। কেন? বললাম, 'এবারে যাই।' বলে তারপরে আবার আবেগবশত না বলে পারলাম না, 'আলো ভৈরবী, ময়লা ধুয়ে সাফ করার কথা বললে। ময়লা মাথায় নিয়ে তুমি কিন্তু হীরে হয়ে গেছ, ও আর ধুয়ে সাফ হবে না।'

মনে মনে বললাম, তুমি গেলেই ভূতানন্দের জগৎ অন্ধকার। ময়লা হেসে উঠল। বলল, 'আসবেন তো আবার দাদাবাবু?'

ফিরে দেখে বুঝলাম, ভৈরবীর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। বললাম, 'যদি পারি, আসব।' মনে মনে বললাম, যদি না পারি, তবে এ টিলার ছবি তোমারই মূর্তি ধরে অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার চোখে। এ অস্বচ্ছন্দ জীবনের ক্ষেত্রে, বিশেষ উন্নাসিক স্বদেশ-পরিচয়-অজ্ঞ কূপমণ্ডুক শহুরে সভ্যতার কাছে সত্য অনেক সময় অসত্য ও অস্বাভাবিক। এখানে যে এমনি এক ময়লা ও ভূতানন্দের দেখা পেলাম, কিছুই নয়, তবু দেখলাম এমনি এক বিচিত্র নাটক, তা হয়তো নিজেই ভুলে যাব এই টিলা থেকে নেমে। তবু জানি মানুষের ধর্ম, প্রেম ও ক্ষুধার এ ঘটনা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জানি নে, কী শুনলাম। দুদিনে কত মানুষের সঙ্গে দেখা হল, কত কী শুনলাম। মনের সহস্র তারে বাজল কত সুর। অধ্যাত্মের উপলব্ধি নেই। সবই মানুষের মধ্যের হেরফের বলে দেখলাম। এও কি ভৈরব-ভৈরবীর কোন গূঢ় তত্ত্বসূত্রের বন্ধন, নাকি যা শুনলাম, তা শুধু মানব-মানবীর বিচিত্র প্রেমোপাখ্যান, জানি নে। তবু আমি সাধারণ। সেই সাধারণের হৃদয় তো টাবুটুবু ভরে উঠল এই হাসি-কান্নার কাহিনীতেই।

হঠাৎ কেশো গলার হাসি শুনে চমকে দাঁড়ালাম। একটি দেবদারুর আড়ালে, কপালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ভূতবাবা। বলল, 'চললেন, আজ্ঞে?'

হাসি চেপে বললাম, 'সে কি, একেবারে এত কাছাকাছি, এখানে যে?'

কিমাশ্চর্যম্! লজ্জায় ও বিনয়ে ভূতানন্দ মাটিতে মিশল যে! চোখ পিট-পিট করে গলার রুদ্রাক্ষ খুঁটে, সে এক কাণ্ড। বলল, 'আজ্ঞে দেখলেন তো সাক্ষাৎ চণ্ডীঠাকরুন, হেঁ হেঁ।'

মানে বোধহয়, কী করে আর তবে যাব। বলল, 'ভৈরব একেবারে চণ্ডাল। মায়ের চরণামিতোটুকু গেল। আবার আসবেন, মা কালীর কথা বলব।'

কি ভাগ্যি, ভূত দেখাতে চায় নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কূপ কোথায়?'

সে বলল, 'ওই যে পাঁচিল-ঘেরা-বাড়ি, ওর উঠোনেই দরজা পাবেন।'

'চলি তা হলে?'

ভূতানন্দ জোড়হাতে নত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'রাগ দেখলেন তো? আসল ভৈরবীর ও-ই লক্ষণ আজ্ঞে; আর আমি—'

মুখখানি অন্ধকার ও করুণ হয়ে উঠল তার। ওকে আর সান্ত্বনা দিলাম না। এগিয়ে গেলাম। বুঝলাম, ওইরকম করুণ মুখে জোড় হাতে এবার তার আর-একজনের কাছে যাবার সময় হয়েছে।

বলতে কি, ডিগবাজি-খাওয়া বিটলে পাখিটির মত, খুশিতে আমার ডানা ঝটপট করে উঠল। একটা মস্ত নিশ্বাস ফেললাম। গুনগুনিয়ে উঠল মনটি আপনি আপনি, চল, চল, চল হে। আকাশতলে আজ সব-ই খোলা। চল চল।

পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটির উঠানে এসে দেখি, লোকের ভিড়। বেশী নয়। অনেক নারী পুরুষ বসে বসে গল্প জুড়েছে। বোধহয় বিশ্রাম হচ্ছে। সামনে দেখি মন্দির। মন্দিরে যার পট রয়েছে, দেখে মনে হল গুরু নানক। পাশের সেবাইতও শুভ্রবেশধারী শিখ সম্ভবত। দেখলাম চরণামৃত বিতরণ হচ্ছে।

উঠোনের মাঝখানে, ছাদ থেকে নামার মত একটি সিঁড়ি-মুখের দরজার ভেতর দিয়ে পিলপিল করে অদৃশ্য হচ্ছে মেয়েপুরুষের দল। সামনে গিয়ে

উঁকি দিলাম। কিছু দেখবার উপায় নেই। মানুষের ঠেলায় মানুষ যেন ওই অন্ধ সুড়ঙ্গে গলে গলে পড়ছে। সিঁড়ি-মুখের কাছটিতে ভিড়ও হয়েছে বেশ।

একটা ব্যাপারে অবাক হলাম। একটি অবাঙালী, রীতিমত দশাসই চেহারার ভদ্রলোক সিঁড়ি মুখের কাছে একবার এগুচ্ছেন আর পেছুচ্ছেন। তাঁর হাত ধরে, একেবারে বিপরীত রূপ কাঠিসার মহিলাও একটি আগে-পাছে করছেন। এই সিঁড়ি-মুখের ভিড়ের মধ্যে তাই নিয়ে সাড়া প'ড়ে গিয়েছে হাসির।

জিজ্ঞেস করলাম একজনকে, 'কী হয়েছে ভাই?'

শুনলাম, ওই বাবুজী এই সুড়ঙ্গে অবতরণে ভয় পাচ্ছেন। যদি দম আটকে মরে যান, কিংবা মাটি ধসে চাপা-ই পড়েন।

ভাল। কি দরকার নামার। কিন্তু ওই তো মুশকিল। শুনলাম, ভদ্রলোক বলছেন, 'ভগবান আমার উপর বিরূপ, আমার কী উপায় হবে?' আর অতবড় মানুষটাকে 'ডরপুক' অর্থাৎ ভীতু বলে এক চিলতে মহিলাটি মুখ ঝামটা দিচ্ছেন।

সাধ আছে, সাহস নেই। কিন্তু ভগবানের যা চরিত্র, তিনি যে নীচের অবতরণিকাকে আরোহণী করে দেবেন, তেমন সম্ভাবনা কম। সুড়ঙ্গের মুখটি যেরকম সরু ও অন্ধকার, সে যে হঠাৎ আলোয় মুখব্যাদান করে বিস্তৃত হয়ে উঠবে, তাও বোধহয় না। অতএব, ওই চলতে থাকুক।

নেমে গেলাম ভিড়ের মধ্যে মিশে। সিঁড়ির মধ্যপথে গিয়ে মনে হল, ভাল করি নি নেমে। মাঘ মাসের এই দারুণ শীতে ঘাম ছুটল শরীরে। নিজে চলছি নে। আমি একজনের পিঠে লেপটে আছি। আমার পিঠে আর-একজন। যেন দলা-পাকানো মানুষের একটা পিণ্ড। নারী-পুরুষের বাছবিচার নেই। পেছনের চাপ আর-একটু বাড়লেই শেষ। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যদি মরিও, তবু মাটিতে পড়ব না। এমনি দাঁড়িয়ে মরে থাকব।

চাপে পড়ে দ্রুত নিশ্বাসে কার গলায় ঘড়ঘড় শব্দ উঠেছে। কে যেন ফোঁপাচ্ছে আঁতকে-ওঠা চাপা গলায়। মনে হল, ভাল করি নি। এ যে

সত্যিই কূপ! পাতালপুরী! ফিরব, সে আশা-দুরাশা। লৌহদরজা ভাঙ্গা যায়। কিন্তু এই মানুষ-পিণ্ডের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। দেখছি উপরের লোকটির আতঙ্ক অলীক নয়।

হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল গায়ে। কোত্থেকে এল? বাঁ দিক থেকে একটি আলোর রেখা এসে পড়েছে ভিতরে। যেন দুর্ভেদ্য অন্ধকারে এসে পড়েছে সার্চ লাইটের আলো। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি নে স্থির হয়ে। ডান দিকে তাকিয়ে মনে হল, কোন এক অন্ধ পাতালপুরী থেকে মানুষ-জলের হোস্ পাইপ খুলে দিয়েছে কেউ। কিছু দেখতে পাচ্ছি নে। দূরে শুধু একটু বুঝছি, একটা আবর্তিত বন্যা ওইদিক থেকে ছুটে এসে এগিয়ে চলেছে ওই সার্চ লাইটের দিকে। এই এক বন্যা। আমার পেছন থেকেও আসছে সিঁড়ি-দিয়ে-নামা জলপ্রপাতের ধার-বন্যা। কোন দিকে যাই। এই বন্যার মধ্যে ছিন্ন বস্ত্র, ধূলিমলিন কম্বল, ত্রিশূল, চিমটা, মতিবাঈ থেকে জর্জেট শাড়ির খসখস, স্বর্ণালঙ্কারের ঝিকিমিকি রিনিঠিনি, রঙীন উত্তরীয়, ধুতি ও কোট-প্যাণ্টের পরিপাটি, সবই ছিল। ছিল না শুধু স্বাভাবিক রূপ। তিক্ত ওষুধ গোলার মত এক দুরূহ কাজে নেমে এসেছে সবাই। পেটে গেলেই নিরাময়। এখানকার কাজ শেষ করে একেবারে বেরুতে পারলেই স্বর্গের চাবিকাঠি আপনি এসে জুটবে পকেটে।

দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। যেদিকে হোক চলা ভাল। দাঁড়িয়ে থাকলেই পেষাই। এখানে কী আছে, তাই তো জানি নে। শুধু শুনছি, হনুমানজী আছেন। ডান দিকে মোড় নিয়ে, জিজ্ঞেস করলাম একজনকে, 'এখানে হনুমানজী আছেন?'

সে বলল, 'জী বাবু!' কিন্তু কী আশ্চর্য। লোকটি ওর মধ্যেই আরম্ভ করল, 'হনুমানজীকে একবার এখানে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। মানে—'

আর বলার দরকার ছিল না। কেন-না, রামায়ণের অনেক পরে নিশ্চয়ই সমুদ্রগুপ্তের কূপ তৈরী হয়েছিল। হনুমানের লুকিয়ে থাকার কোন ইতিহাস তাতে থাকতে পারে না। কিন্তু এই ভয়াবহ ভিড়ের মধ্যেও লোকটার খৈনি-টেপা মুখে রামায়ণের বিচিত্র বুলি ঝাড়বার বাসনা দেখে অবাক হতে হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এগুচ্ছ না কেন?'

হেসে বলল 'মরতে?' তারপর পকেট থেকে পয়সা বার করে ডান দিকে একটি জায়গা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। দেখে বুঝলাম, ওইখানেই আছেন তিনি। ওইখানেই ঘূর্ণি-জলের আবর্তের মত নরনারীর রঙ-বেরঙ-এর মাথা পাক খেয়ে উঠছে।

এগিয়ে গেলাম। অস্বীকার করব না, পুণ্যার্থী নরনারী আমার তুলনায় অনেক ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু। এগিয়ে গিয়ে অন্ধকার দেখলাম। মনে হল, আমার ওভারকোটের বোতামগুলি পড়পড় করে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। অসহ্য চাপে, মনে হল, কোটটা খুলে পড়ছে, টেনে নিচ্ছে কেউ গা থেকে। ঠোঁটের কোণে চোখের জলের মত নোনতা ঘামের নির্ঝর এসে পড়ছে।

তারপর, টিমটিমে প্রদীপ, মনে হল, তৈলসিক্ত চত্বর, সিঁদুর, ক্ষয়িষ্ণু পাথরের মূর্তি, পাণ্ডা ও পয়সা, সমস্তটা মিলিয়ে একটা বিচিত্র ছায়ার খেলা।

বেরিয়ে এলাম তন্মুহূর্তেই। কার একটা হাত এসে পড়ল গলায়। পড়ুক। লক্ষ্য এখন সার্চ লাইট। যেন, মুমূর্ষুর জীবনে এখনো আছে জীবনের সাড়, ওই আলোকরেখা।

কার একটা হাত এসে পড়েছে কোমরের কাছে। ওভারকোটের বোতাম তবে খুলেই গিয়েছে? কিন্তু, কিন্তু একি? হাতটা যেন কাশফুলের মোলায়েম সুড়সুড়ির মত পেটে বুকে হাতড়ে ফিরছে। তারপরেই আটকা-পড়া বিছের মত স্পর্শটি পিছলে নেমে এল কোমরের নীচে। পরমুহূর্তে আবার বুকে। অন্ধ নাকি? ভিড়ের চাপাচাপি ও ঠাসাঠাসি। একরাশ রুক্ষ চুলের গোছা ঢেকে দিল আমার চোখের দৃষ্টি।

কিন্তু, বুকে হাত? আমার যে সব ওই বুকে? আমার ছুটে আসা, আমার হৃদি-কুম্ভ-সায়রে ডুব দেওয়া, আমার অমৃতকুম্ভ যে ছোট্ট একটি চামড়ার ছোট্ট ব্যাগে ভরা। এখানে মনের চেয়ে কাজ দ্রুত।

কোন বস্তু নয়, বুকের স্পর্শটি চেপে ধরলাম হাত দিয়ে। একটি হাত। নরম নয়, শক্ত কিন্তু ছোট। হ্যাঁচকা দিচ্ছে সরিয়ে নেওয়ার জন্য। চকিতে

চুলের গোছা সরে গেল চোখের কাছ থেকে অস্ফুট আর্তস্বর। কালো ওভারকোটের তলায় একটি মুখ। একজোড়া চোখে চকিত আলোর মায়া-দীপ্তি। সেই চোখে একই মুহূর্তে শঙ্কা ও ক্রোধ, হাসি ও ভিক্ষা।

মনে হল, ছিন্ন ময়লা কাপড় ও ধুলো-মাখা একদল মেয়েবাহিনীর ব্যূহ আমাকে ঘিরে ঠেলে নিয়ে চলেছে। হাত ছাড়িনি। চেঁচাব কি না ভাবছি।

দাবি ও অনুরোধের যুগপৎ চাপা আর্তস্বরে শুনলাম, 'ছোড় দো, ছোড় না?'

স্বর আমার কানের কাছে। সেই ভয়ঙ্কর টানাটানা চোখ আমার মুখের কাছে। চোখ নামিয়ে তাকালাম। পালতোলা পাড়ের শাড়ি। লালজামা। আর এই অসহ্য ভিড়ের মধ্যে সেই মুহূর্তেই অনুভব করলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই, এক অব্যক্ত ভাষাহীন নরম ও বিচিত্র স্পর্শ আমার বুকে।

সর্বনাশী! খনপিসীর সর্বনাশী, ঝুঁসর ভয়ঙ্করী, ব্রজবালার আতঙ্ক, ছেলেচোর। নিরালা মাঠের সেয়ানা পাখি।

ছেলেচোর কোথায়। ও যে আসল প্রাণচোর। সর্বস্ব-চোর। আমার হৃদপিণ্ডের খোঁজ করছিল মৃত্যুর মত সর্বনাশী স্পর্শে।

চকিতে কটাক্ষ বিলোল হল। ঘন হল স্পর্শ। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে এক বিচিত্র জড়ানো ও সানুনাসিক কণ্ঠ আমার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে দিল, 'ছোড় দো মেরী বাবু, ছোড় জী।'

যে মুহূর্তে টের পেয়েছি, সে মেয়ে, সেই মুহূর্তেই শিথিল হয়েছে হাতের মুঠো। আমি ভদ্রলোক, আমার আত্মাভিমান আছে। ভদ্রলোক এবং পুরুষ, মনের কানায় কানায় আমার আছে সভ্যতার সংস্কার। আমার অর্থের প্রতি যার লোভ, তার প্রতি আছে ঘৃণা ও ক্রোধ। তবু মাঝারি ঘরের বাংলার ছেলে, স্পর্শকাতরতা আমাদের পায়ের তলা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত। বয়সের কারুণ্য ও উদারতা বাস্তব মানে না নিয়ত। সেখানে বিচিত্র রঙের রঙমহল। তা ছাড়া নারী। নারী নামে ধিক্কার দিচ্ছি নে। নিজের মনকে ফাঁকি দেব কোথায়।

হাত আপনি শিথিল হল। আমার ঘর্মাক্ত হাতের মুঠো থেকে তার ছোট হাতখানি পিছলে অদৃশ্য হল। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ হল মুক্ত। পরমুহূর্তেই ঠেলাঠেলি পড়ল একটা। বিহঙ্গ পালাচ্ছে, উল্লসিত ডানার ঝটপটানি ভিড়ের মধ্যেও লাগল একটু হুড়োহুড়ি। তারপর অদূরেই ভিড়ের মধ্যে ভেসে উঠল সেই মুখখানি। মুক্ত পাখিটি যেন নিঃশব্দে ঘাড় বেঁকিয়ে জানাল খুশি। ঠোঁটের কোণে তার বাঁকা হাসিতে বিদ্রূপ না করুণা জানি নে। চোখের উদ্দাম কটাক্ষে তার স্বভাব-সর্বনাশের খেলা।

হাওয়া লাগল গায়ে। ঠাণ্ডা হাওয়া। ঘর্মাক্ত শরীরে আচম্বিতে লাগল শীতের শিহরণ। অথচ রোদ ছড়িয়ে আছে। সামনে আমার সিঁড়ি, নীচে মেলা। চেয়ে দেখি, তীব্র জলস্রোতের বুকে পুচ্ছ-নাড়া রুপালী মাছটির মত তরতর করে নেমে চলেছে সর্বনাশী। তারপর নীচে থেকে আবার ফিরল তার বাঁকা চোখ, আর উত্তরে হাওয়ার হিম-ঝাপটার মত খিলখিল হাসি।

সামনে তাকালাম। কেল্লার ধূসর আকাশে রক্তমেঘের সারি। কে যেন তীব্র ঝকমকে লাল ওড়না ছড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত মেঘ হালকা লাল আবীরে রাঙিয়ে দিয়েছে কে। ধূলিস্তম্ভে পড়েছে রক্তিম আলো। সেই আবছায়া ধূলিস্তম্ভে, সারা কুম্ভমেলা, মেলার মানুষ এক দূর রহস্যের ছায়ার মত বেড়াচ্ছে নড়েচড়ে।

আরো দূরে কেল্লার দক্ষিণ কোণে, পশ্চিমের আকাশ ঘেঁষে রক্তসূর্যের বুক থেকে নেমে আসছে এক তীব্র আলোর ধারা। রঙ লেগেছে কালিন্দী যমুনায়। লজ্জা, আনন্দ, সুখের তীব্রতায় যেন কোনও কাঞ্চন-বরনীর মুখ উঁকি মারছে নীল যমুনার বুকে।

দু-হাত মুঠ করে ধরেছি বুকে। মুঠিতে আমার সেই ক্ষুদ্র চর্মপটিকার অমৃতকুম্ভ। চুরি যায় নি, তবু ভয়। কানে শুনতে পাচ্ছি নিজেরই বুকের ধুক-ধুক শঙ্কাধ্বনি। আর ওই আকাশের নীচের তীব্র ঝিলিক যেন বিদ্রূপ করে উঠেছে আমাকে।

নেমে এলাম। সর্বনাশী উধাও। শ্বাসরুদ্ধ ধূলিস্তম্ভের রঙ-ছায়ায় হারিয়ে গিয়েছে।

আমি নিজেও মিশে গেলাম ধূলি-রঙ-ছায়ায়। পাশের মানুষ যেন অনেক দূরে। দূর ঢাকা পড়ে গিয়েছে ধূলি-আস্তরণে। কাছের কথা, কাছের হাসি সবই যেন দূরাগত ধ্বনির মত স্তিমিত। রহস্যজালে আবৃত বিচিত্র গোধূলি। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। অন্ধ হয়ে আসছে চোখ। দিক ভুল হল। পথ ঠাওর হল না। ছায়ার মধ্যে ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ।

মন বিষণ্ণ, কিন্তু অস্থির। ভাবি, অগণিত সাধু-ফকিরের ছিন্ন বেশ, ধূলিশয্যা। তার মধ্যে যে পরম ঔদাস্যের নিঃশব্দ শান্ত হাসিটুকু সে বিলিয়ে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে কি কোথাও অভিশাপের স্ফুলিঙ্গ নেই! নেই হয়তো। কিন্তু আর-এক ছিন্ন বেশে ধূলিসজ্জার যে ভয়ঙ্কর অভিশাপ, যে নির্দয় ভ্রূকুটি, তীব্র বিদ্রূপ, তাতে প্রতি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়েছে অগ্নিকণা। হাসিতে তার সর্বনাশ, ঔদাস্য তার ঝড়ের মত। যে ঝড় আপন খেয়ালে যায় বয়ে আর সভ্যতার মিনার যায় উৎখাত হয়ে, তারই প্রতিমূর্তি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই সর্বনাশী। তাদের ফকির বেশে শুধু আগুন। তারা কবে হবে শান্ত। বিলিয়ে বেড়াবে শান্ত হাসি।

গোধূলি আকাশে অস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল দু-একটি তারা। টিলার কোল-আকাশে লেগেছে আগুন। তপ্ত-তামার মত আগুনের আঁচ-লাগা আকাশ। ধীরে ধীরে তার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ধূলা ও কুয়াশার মধ্যে কুহকী আলো ফুটছে! চাঁদ উঠছে। বোধহয়, এই-ই সন্ধ্যা।

পূরবী সুরের শেষ রেশ লেগেছে। যেন সাঙ্গ হয়েছে সারাদিনের খেলা। খেলাশেষে এবার মৌন ও শান্তি। কিন্তু এখানে ভিড় ও কোলাহল। গান ও কথকতার উচ্চ রোল।

টিলার কোল ঘেঁষে দক্ষিণে এসে দেখলাম, একটি আশ্রম। বড় আশ্রম। আলোর ছড়াছড়ি খুব। মণ্ডপটিও রীতিমত সুসজ্জিত। আঙিনায় ছোট ছোট গাছের সারি দিয়ে আঁকা হয়েছে ভারতবর্ষ।

ঢুকতে গিয়ে বাধা। জুতো রেখে যেতে হবে। কার কাছে? সে ভাবনা নেই। তার জন্য লোক আছে। জুতো দিন, নম্বর মারা কার্ড নিয়ে যান। কার্ডটি ফিরিয়ে দিলেই জুতো। সেই ভাল।

মঞ্চে গান হচ্ছে। সুরটি ভজনের অনুরূপ। যাঁরা গান করছেন তাঁরাও রীতিমত সুবেশ যুগল তরুণ। কিন্তু ভাষা দুর্বোধ্য। শ্রোতার চেয়ে বেশি শ্রোত্রী। যদি পাপ না হয় তবে বলি, এখানে রূপের বড় ছড়াছড়ি। রূপে ও পোশাকে দশ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আশ্রম-প্রাঙ্গণের। তার উপরে তীব্র আলোয় রূপের বাড়াবাড়িও হয়েছে। আশ্রমের সুদীর্ঘ ঘেরাওয়ের মধ্যে বহু ঘর। কল্পবাসীদের নিঃসন্দেহে। কিন্তু কল্পবাসিনীরা যেন বড় বেশী চুমকি বাহার ও হীরে-জহরতের আলোয় পথ দেখে চলেছেন।

মুখে ছিল সিগারেট। একটা বিরক্ত ও গম্ভীর কণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কানের কাছে, 'বাঙালীবাবু?'

কণ্ঠস্বরে কিছু টান ও বিসর্গযুক্ত ইতি। পাঞ্জাবীদের মত খানিকটা। ফিরে দেখি, মস্ত বড় পুরুষ, গৌরমূর্তি, গৈরিক বেশ। মাথায় চুলের রাশি, নাকে কাপড়। সারা মুখে অত্যন্ত বিরক্তি।

ফিরতে বলল, 'ফেক্ দিজীয়ে সিগরেট্। মহারাজলোগ্ হরবখত জানা আনা করছেন, তাঁদের নাকে বাস লাগলে আপনার নরকবাস হবে।'

চমকে প্রথমে সিগারেট নিভালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, শিখদের আশ্রম?'

সিগারেট নেভাতে দেখে সে একটু বোধহয় খুশী হল। বলল, 'না। তবু এ আশ্রমের মহারাজ ওটা পছন্দ করেন না। তাছাড়া শিখভক্ত এখানে সব সময় আসে। আপনারা হরটাইম্ সিগরেট পিনেসে কৈসে চলেগা। আপলোগ কিসীকো ধরম নহি মানতা।'

আপলোগ মানে কোন লোগ? বাঙালী কি? তেমনই যেন খোঁচাটি। কার ধর্মে সে বাধা দিয়েছে? জিজ্ঞেস করলাম, 'সো' কয়সে মহারাজ?'

প্রশ্ন শুনে একটু বিব্রত হল সে। হঠাৎ সে বলল, 'ওইসা শুনতা হ্যায় বাবুজী। কেলকত্তা কভি নহি দেখা। মগর, উনলোগ বড়ি জয়দা সিগ্রেট পিতেঁ হ্যায়।'

প্রতিবাদ নিরর্থক। পালটা অভিযোগ অনেক তোলা যায়। তুলব কার কাছে? যাক। দেখে যাই। সাধু নিজে ধূমবিরোধী। তাই

বিরক্ত। কথার দরকার ছিল না। বললেই নিভিয়ে তার মনস্তুষ্টি করতে পারতাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কোন্ আশ্রম মহারাজ?'

বলল, 'সাধুবেলা আশ্রম।' বলে নিজেই চমৎকৃত হয়ে ফিরে আবার বলল, 'সিন্দকে সবসে বড়িয়া আশ্রম বাবুজী। পাকিস্তানের এলাকায় পড়ে এখন বেনারসে আশ্রয় নিয়েছে। লাখ লাখ টাকা আশ্রমের সম্পত্তি। শ শ আদিম আগে খেত সাধুবেলা আশ্রমে।'

লাখ টাকার ঔজ্জ্বল্য আছে সন্দেহ নেই। নেই মিষ্টি ও উদার হাসির স্নিগ্ধতা। জুতো নিয়ে বেরুতে গিয়ে গেটের কাছে চোখে পড়ল রিডিংরুম। মনটা প্রফুল্ল হল। টেবিলের উপর অনেক পত্র-পত্রিকা। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক। রাজনীতি, সিনেমা ও সাহিত্য সবই আছে। ইংরেজী, হিন্দী, উর্দু, তামিল, মারাঠী, উড়িয়া সবই আছে। অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও পেলাম না বাংলা কাগজের একটি টুকরো। কেন, বুঝতে পারলাম না। যাকে নইলে চলবে না শুধু সে-ই নেই?

বেরুবার মুখে একজন বাড়িয়ে দিল খাতা ও কলম। দর্শকের স্বাক্ষর। আপত্তি কি? অনেক প্রদেশের বিচিত্র অক্ষরমালার মধ্যে বাংলায় লিখে দিলাম নিজের নামটি। নীচে লিখলাম, বাংলা দেশ।

এ আমার প্রতিবাদ নয়। নয় মনের বিরূপতা। অনেকের মাঝে যে শোভার আধার বাঙলা ভাষা, এ লেখনে শুধু সেই তুষ্টি। রূপের মাঝে অপরূপকে দিলাম বসিয়ে।

বেরিয়ে এসে সোজা পাড়ি পশ্চিমোত্তর কোণে। যেখানে আলোর সারি ও লোকের ভিড়। কিছুটা আসতেই এক বিরাট বাহিনী। নেতৃত্ব করছে পাঁচুগোপাল। পাঁচবখ্যি। চোখ বটে তার। দেখেই হুঙ্কার দিল, 'অ্যাই য্যা! চাঁদ, কোথায় ছিলে সারাদিন, অ্যাঁ?'

শোন এবার বাঙলা কথা। হকচকিয়ে বললাম, 'কোথায় চললেন?' সে কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বলল, 'খুড়ি, এই সে তোমার ছিরিমান। হাঁকপাক করছিলে, কোথায় গেল। এবার জিজ্ঞেস কর।'

তাই তো। তাকিয়ে দেখি, আশ্রমের সমস্ত বাঙালী সবলা ও অবলা যে আজ বেরিয়ে পড়েছে আশ্রম খালি করে। কম করে জনা পনেরো তো বটেই। তার মধ্যে কি অপরূপ। পাঁচবখ্যির গা ঘেঁষেই খনপিসি! শুনেছিলাম, দুই শক্তি একত্রিত হলে বিস্ফোরণ অনিবার্য। কিন্তু চাপা জ্যোৎস্নালোকে দেখলাম, শালজড়ানো শীতে কাঁটা খনপিসির মুখখানি বেশ প্রশান্ত। খালি বলল, 'সেই ছেলেটা না?'

আর-এক জন, 'হ্যাঁ।'

দিদিমা বলল, 'খেয়েছ কিছু সারাদিনে?'

মিথ্যে বলতে হল। বললাম, 'হ্যাঁ, খেয়েছি।'

পাঁচুগোপাল বলল, 'তবে বাওয়া মুখখানি অমন শুকু-শুকু দেখাচ্ছে কেন?'

বললাম, 'অনেক ঘুরেছি কি-না।'

প্রায় ভেংচে উঠল পাঁচুগোপাল, 'থ্যাক্, অ্যার পাক দিতে হবে না। পড়েছ বোধ হয় কোন মায়াবীর পাল্লায়? খবোদ্দার, মরবে। চাঁদপানা মুখ দেখাবে আর জানটি নেবে, এর নাম কুম্ভুমেলা, বোয়েচ? হ্যাঁ।' না বুঝে উপায়? তার কথার প্রতিবাদ করছি নে আর।

খনপিসি বলল, 'নেও, চল বাপু। গায়ের মধ্যে কাঁপুনি দিচ্ছে। কাল আবার পুন্নিমে। আজ-ই এত শীত, কাল না-জানি কী হবে।' পাঁচুগোপাল বলল, 'চল চল।'

হুকুমটা আমাকেই করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ঘুরলেন?'

চাপা গলায় বলল, 'নরকে। ঘোরার কি শালা মাথামুণ্ডু আছে?' গলা ছেড়ে বলল, 'রামকৃষ্ণ আশ্রম গেলুম, আনন্দময়ী দর্শন করলুম।'

চলতে চলতেই কানে এল দিদিমা বলছে, 'খায় নি তার আমি কী করব? ঘরে বাইরে কি আমি এই করতেই আছি যে, একজনকে না একজনকে চিরকাল ডেকে ডেকে খাওয়াতে হবে? তুই ধরে বেঁধে খাওয়ালেই পারতিস্?'

পাশ ফিরতেই চোখে পড়ল ব্রজবালার মুখ। জ্যোৎস্নালোকে দেখলাম। অভিমানক্ষুব্ধ চোখ। চোখে চোখ পড়তেই ঘোমটা টেনে আড়াল করল চোখ।

কিশোরী হলেও হৃদয় যে তার রাঙা। মনে মনে বলি, সই বোঠান আমার বোন! দিন যাচ্ছে, শেষ হয়ে আসছে দেখাদেখির পালা। ঘর থেকে এসেছে দূরে। তবু ঘরের হৃদয়, মন আর চোখ ফিরছে সঙ্গে সঙ্গে, পথে পথে। কে এক পথের মানুষ আত্মীয়তা পাতায়। তাকে ঘিরে রাগ হাসি। তার না খাওয়ার জন্য অভিমান। নিষ্ঠুর ও তিক্ত জীবনে বুঝি এই বোধগুলিই জীইয়ে রেখেছে আমাদের মানবিকতা।

সারা রাত ঘুম হল না। শীত তো ছিলই। তার উপরে সারা রাত ধরে লোকের চলাফেরা কথাবার্তার বিরাম নেই। কাল পূর্ণিমার স্নান আছে সঙ্গমে। স্নানার্থীদের আগমন হচ্ছে। কিন্তু সে কি সারারাত ধরে? শুধু তাই নয়। জানি নে কিসের এত গান। তাঁবু-কোটরের শীতেই আমরা আধখানা। আর বাইরে স্নানার্থীদের শীত-কাঁপা মিলিত গলার গানের শেষ নেই। বুঝতে পারছি সব দলে দলে আসছে। শুনেছি, সঙ্গমে ভিড় হবে সাংঘাতিক। তাই রাত থাকতেই সবাই ভিড় করছে এসে আশেপাশে। স্নানের সময় বাঁধা আছে পাঁজি-পুঁথিতে। ঠিক সময়টিতে ডুব দিতে না পারলেই ফসকা গেরো। বুঝতে পারছি দিদিমারও ঘুম নেই চোখে। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছে, আবার ভেঙে যাচ্ছে। ঠাকুরের নাম নিয়ে জেগে থাকার প্রয়াস শোনা যাচ্ছে ভাঙা গলায়।

শেষ রাত্রের দিকে বুঁজে আসছিল চোখ। পাঁচুগোপালের চেঁচামেচিতে তা-ও হল না। তার 'ওঠ গো' 'ওঠ গো' ডাকে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তাঁবুতে তাঁবুতে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির হিড়িক। তার মধ্যে শীতের কামড়ের হি-হি-হু-হু। আর দিকে দিকে ব্যস্ত উৎকন্ঠিত গলা।

'ও নন্দ, নন্দরে, আমাকে ফেলে যাস নি যেন।......'

'ও মাসি, তোমার গামছা কোথা গেল ?.........'

'ও মা, কাল যে অত করে বেলপাতা কটা পুঁটলিতে রেখেছিলুম সেগুলো তো দেখছি নে।......'

'ননীবালা, আতপচালগুলান নিতে ভুলিস নে লো।……'

'বড় বউমা, ও বড় বউমা, তুমি যে আর শীতে বাঁচচো না বাছা। সধবা মানুষ, পইপই করে রাত থাকতে বলে রেখেছি, সিঁদুরটুকু আঁচলে বেঁধে নিয়ে শোও, সঙ্গমে নাইবার সময় দিতে হবে। তা আর……'

এমনি সব নানান কণ্ঠে সাড়া পড়ে গিয়েছে। এটা নাও, ওটা নাও। বুড়িরা কাঁদছে শঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায়। আমাকে নাও, হাত ধর! বুড়োরা গোঙাচ্ছে, হে ভগবান, শক্তি দাও, শক্তি দাও!

অসহ্য শীত। দুরন্ত উত্তরে হাওয়া। শীত নয়, যেন লক্ষ লক্ষ বিষধরেরা অদৃশ্যে ছোবলাচ্ছে চেরা জিভ বার করে।

কিন্তু সময় নেই, চল চল! সঙ্গমে সঞ্চারিত হচ্ছে অমৃত। জীবন-যৌবন, ধ্যান-ধারণা, কামনা-বাসনার অমৃত ঢেউ লেগেছে, ডুব দিতে হবে, চল চল।

'বেরজো, ওঠ। চল্ চল্। পেল্লাদ, দাদুভাই আমার, আমার সোনা-মানিক, চল্ চল্।'

'খনপিসি, চল্ চল্।'

'ওগো তোরা আমায় ধর, আমার পা টলছে। আমায় নিয়ে চল্।' শীত! সরে যাও! মৃত্যু! দূরে যাও। দুর্বল! শক্তি ধর। অন্ধকার! আলো হও। চল্ চল্! কী পড়ল? ঘটি? থাক। কী রইল? জামা-কাপড়? থাক। সময় নেই! ক্ষণ বহে যায়, চল চল!

বাইরে পাঁচুগোপালের তীব্র মোটা গলার ডাক ভেসে আসছে, 'বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়।'

শুনছি। শুধু ডাক, শুধু চল চল আহ্বান। তবু পড়ে রইলাম। বিস্ময়ে হতবাক, দেহ আড়ষ্ট। মন ছটফট করছে, তবু পড়ে রইলাম।

কে ডাকছে। কে ডাক দিল সবাইকে এমনি করে। কার বাঁশি বাজল। কোন্ মন্ত্র শুনল সবাই কানে কানে। কেন এত ব্যাকুল হল। কেন এমন দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলল সবাই। আশ্চর্য! এই ভয়ঙ্কর শীতে সঙ্গমে ডুব দিতে পাগল হল সকলে?

দিদিমা বলছে, 'পেল্লাদ, ছেলেটাকে ডাক।'

প্রহ্লাদ ডাকল, 'কই দাদা, উঠুন, সব কিন্তু ফাঁক গেল নইলে। উঃ! ও হো হো হো, দি'মা কী শীত রে!'

বেরিয়ে পড়েছে সবাই। খুলে দিল তাঁবুর ঢাকনা। তারপর কে হ্যাঁচকা দিয়ে খুলে দিল আমার কম্বল।

চেয়ে দেখি ব্রজবালা। উল্লাসে, উৎকণ্ঠায়, শীতে কাঁপুনিতে অদ্ভুত তার মুখের ভাব। বলল, চাপা গলায় ফিসফিস করে, 'চল, চল তাড়াতাড়ি।'

ব্যাকুল ও করুণ আকৃতি। তারপর বেরিয়ে গেল দিদিমা আর স্বামী— দুয়ের মাঝে দেহলগ্ন হয়ে। ডাক পড়েছে। ত্রিপূর্ণীতে ডুব দেবে আজ ব্রজবালা। তার জীবনে ডুব দেবে, তার যৌবনে ডুব দেবে, ডুব দেবে তার শাঁখাসিঁদুরে, মাছভাতে, স্বামীর পরমায়ুতে, তার ভবিষ্যতের জাদুমানিকের অমৃতমথিত ওষ্ঠ-গহ্বরে।

কে গান ধরে দিয়েছে।

চল গো তোরা ত্বরা করে।
সে যে আর রইবে না রে।
সোনার বরন কালি হলে,
দেখবি অন্ধকার॥
তখন কাঁদবি বসে ধূলায় পড়ে,
দেবতা কাঁদবে দেখে তোরে,
দেখবি, চারদিকে তোর ভরাডুবি,
পাবিনেকো পারাপার॥
তোরা চল গো চল॥

পাঁচুগোপালের গলা শোনা গেল, 'সবাই এসেছে? চল, এবার পা চালাও, চালাও।' পাঁচুগোপাল চালক। পুণ্যসঞ্চয়ের হাত-ধরা খুঁটি। জানি নে, এতে পাঁচুগোপালের কতখানি আনন্দ ও লাভ। কিন্তু তার কণ্ঠে একটা চাপা উল্লাসের ধ্বনি বাজছে।

খনপিসি বলছে, 'পাঁচুদা, নাপতে ব্যাটা কোথায় গেল?'

জবাব শোনা গেল, 'আছে আছে, চল চল। সঙ্গমের ধারে বসে মাথা মুড়োবে, ভাবনা কী ?'

মনে হল ফাঁকা হয়ে গেল আশ্রমটা। সবাই চলে গেল, পড়ে থাকি কেমন করে ? ডুব না দিই, একলা থাকব কেমন করে ? আমি যাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে। ডুব না দিই, ডুবেই তো আছি।

বেরিয়ে এলাম ওভারকোট চাপিয়ে। সামনে দেখা কোতোয়ালজীর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল, যান নি ?'

কোতোয়াল বলল, 'আমাদের আজ নয়। অমাবস্যায়, মৌনী অমাবস্যার দিন। ওই দিন পূর্ণকুম্ভ যোগ আছে। আজকেও কম নয়। গ্রহণযোগ আছে। কিন্তু সাধুসম্প্রদায় আজকে এ যোগে যোগ দেবেন না।

তাড়াতাড়ি মুখ ধোয়ার জন্য গেলাম পেছনের কল-পাড়ে। গিয়ে অপ্রস্তুত হলাম। ভেবেছিলাম, কেউ নেই আশ্রমে। কিন্তু রয়েছে।

দেখলাম, তাঁবুর একপাশে নিরুদ্দেশ-স্বামী-সন্ধানী বৌদি। খসা ঘোমটা। আঁচল এলিয়ে পড়েছে ধুলোয়। সিঁথি ও কপালে সিঁদুর। চোখে জলের ধারা। তাকিয়ে আছেন শূন্য দৃষ্টিতে। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে দেবর। গম্ভীর, ম্লান ও ব্যথিত।

কোন কথা নেই। দুজনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপচাপ। আশ্রম পেছনের এই নিরালা প্রাঙ্গণটিও যেন একান্ত হয়ে ছিল তাঁদের সঙ্গে। গতকাল, দূর থেকে পোশাকের ঔজ্জ্বল্যে তাঁদের এই রূপটি আমার চোখে পড়েনি, মনেও আসেনি। শুধু ব্রজবালার কাছে শুনেছিলাম, বউটি কথা বলে না কারুর সঙ্গে। সে নির্বাক।

ইতিমধ্যে রোদ উঠতে আরম্ভ করেছে। আজ এই সোনার মত সকালে সবাই মৃত্যুর বিনিময়ে যখন ছুটে চলেছে প্রাণের সঙ্গমে, তখন এই নিরালায় দাঁড়িয়ে তাঁরা দুজন।

তাঁদের পরিচয় জানি নে। জানি নে মন। মনে হল, এই নিঃশব্দ আসরে বেদনার ও চোখের জলের একটি আবেগময় সুর বাজছিল। এই নিরালা অবসরেই মানুষ তার ব্যথার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, ব্যথার গৌরবে পারে হাসতে কাঁদতে।

আমি অজান্তে এসে কেটে দিলাম সুর। ভেঙে দিলাম আসর। বৌদি চকিতে একবার আমাকে দেখে ঢুকে গেলেন তাঁবুতে। দেবর রইলেন দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত নত মস্তকে। তারপর ঢুকে গেলেন তিনিও।

আমার মুখ ধোয়া হল না। কলে গিয়ে জলে হাত দিয়ে চলে এলাম তাড়াতাড়ি।

বাইরে বেরিয়ে আসতে ভিন্ন রূপ। কোন কিছু ভাববার অবসর ছিল না। চোখ ও মন টেনে নিয়ে গেল আদিগন্ত বালুচর। দিশাহারা করে আমাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমুদ্র।

কোথায় যাব, কোন দিকে যাব। যেদিকে তাকাই, মানুষ। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ। এক বিরাট পাগলা বন্যার ঢল নেমেছে দক্ষিণে। দিগন্তবিস্তৃত মৌমাছিরা চাক ভেঙে যেন কোন এক সংক্ষিপ্ত সরু পথে উড়ে চলেছে। সেই সরু পথ দক্ষিণে। গঙ্গার এপার ওপারের ছুটে-চলা মানুষ যেন কোন এক নিয়মের বশবর্তী হয়ে চারদিক থেকে এসে এক জায়গায় অগ্রসর হচ্ছে।

দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া সম্ভব বোধ হল না। পুল পেরিয়ে চলে এলাম প্যারেড গ্রাউণ্ডে, বাঁধের নীচে।

সবাই ছুটে চলেছে সঙ্গমের দিকে। দড়ি বেঁধে যাওয়া-আসার পথের নির্দেশ দিয়েছে পুলিস। দাঁড়িয়ে থেকে পরিচালনা করছে উদ্বাস্তু ভলান্টিয়ারবাহিনী। দিকে দিকে কর্ণবিদারী তাদের হুইস্‌লের তীক্ষ্ণ ধ্বনি। ঘন ঘন বিপদ সঙ্কেতে বাজছে বাঁশি।

ধাক্কা খেয়ে সরে গেলাম অনেকখানি। দাঁড়াবার উপায় নেই। সঙ্গমের ঢালুতে বন্যা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। মাইক বাজছে, বিউগল সঙ্কেত করছে, বয়স্কাউটবাহিনী করছে কুচকাওয়াজ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আসবেন। বাঙলা দেশের কল্যাণী কংগ্রেসের পথে দেখে যাবেন একবার।

বাঁধের উপরে উঠেছে সারবন্দী হাতির দল। গায়ে তাদের রাজকীয় জরি-মখমলের ঢাকনা। সওয়ার ছাই-মাখা সাধু। সেদিকে ছুটে চলেছে একদল মেয়ে। অবাক হয়ে ভাবলাম, কেন? এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম, মেয়েরা দৌড়ুচ্ছে, আর চেঁচাচ্ছে, হে ভগবান, হে বাবা, থোরা ঠয়রো, ঠয়রো।

কিন্তু ঘণ্টা দুলিয়ে বাজিয়ে হস্তিবাহিনী উঠে চলেছে। তার মধ্যেই একটি মেয়ে ছুটে গিয়ে হাতির গায়ে হাত দিল। হাসিতে আনন্দে অধৈর্য হয়ে সে হাত কপালে ছোঁয়াবার আগেই, হাতির পেছনের পায়ের লাথিতে সে ছিটকে পড়ল অনেক দূরে।

তবুও, তবুও আবার ছুটল। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে, ওরা হাতির পেছনে কেন ?'

শুনলাম, হাতি স্পর্শ করে প্রণাম করবে। সে-ই হবে তার পুণ্য। ধন্যি পুণ্য। প্রাণে ভয়ও কি নেই ?

অকস্মাৎ, হট যাও হট যাও শব্দে চমকিত হয়ে সরে দাঁড়াতেই দেখলাম, একদল মানুষ ছুটে আসছে। দলের সামনে ছিন্নভিন্ন ধুলো-মাখা আলখাল্লা-জড়ানো একদল মানুষ। কিন্তু মানুষ বলে আর তাদের চেনা যায় না। ধুলি-মাখা চুল-দাড়িতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে তাদের সারা মুখ। পাগুলি ফুলে ফেটে রক্ত ঝরছে। কাঁধে বড় বড় ঝুলি। তারা দ্রুত পায়ে চলছে।

তাদের পেছনে পেছনে ছুটেছে মেয়ে-পুরুষের দল। আছড়ে পড়ছে তাদের পায়ের তলায়। চীৎকার করে উঠছে, 'দেয়া কর বাবা, দেয়া কর !' লুটিয়ে পড়ছে সুবেশ পুরুষ, মহামূল্য অলঙ্কার ও শাড়ি-শোভিতা নারী।

কিন্তু আলখাল্লাবাহিনী নির্দয়। তারা থামতে জানে না। মানুষ ছুটে ছুটে খাবার ও পয়সা পুরে দিচ্ছে তাদের ঝুলিতে।

একটি অল্পবয়স্কা নবীনা ঘোমটাউলী দু-হাত আড়াল করে দাড়াল একজন আলখাল্লাধারীর সামনে। থামতে হল আলখাল্লাধারীকে। কিন্তু সৈনিকের লেফট-রাইটের মত ওঠাপড়া করতে লাগল তার পা। চুলে-ঢাকা চোখে তার ক্রোধ নেই। ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা, মিনতি ও প্রার্থনা।

ঘোমটাউলী সুদৃশ্য রুমাল বার করে কয়েকটা টাকার নোট পুরে দিল তার ঝুলিতে। দিয়ে হাত পাতল।

আলখাল্লাধারী তার আলখাল্লায় খামচা দিয়ে এক চিলতে ন্যাকড়া ছিঁড়ে নিয়ে গুঁজে দিল তার হাতে। দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে আবার বেরিয়ে গেল !

'মিল গয়া, মিল গয়া !' বলে চেঁচিয়ে উঠল অনেকে। কিছুই বুঝলাম না। কারা এরা, কী ব্যাপার ! জিজ্ঞেস করলাম একজনকে।

সে বলল, 'ওরা মহাপুরুষ। ওরা এ জীবনে কোন দিন থামবে না। ওরা ওদের সাধনার প্রথম দিন থেকে ছুটে চলছে। জীবনভর ছুটবে। এই ওদের সাধনা।' আশ্চর্য ! মানুষের জীবনধারণেই বা তা কী করে সম্ভব, কিন্তু বিতর্ক অনাবশ্যক। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নাম ওদের।'

সে বলল, 'জনি নে।'

সালঙ্কারা ঘোমটাউলী আনন্দে খুশিতে হাসতে হাসতে চলছে তার পরিজনদের সঙ্গে। ওই চিলতে ন্যাকড়ার আনন্দ।

আবার ধাক্কা। সরে যাও, ঢল নেমেছে। হা হা করে ছুটে আসছে নরনারী। গতি সঙ্গমের দিকে। সে কি শুধু গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম ? নাকি, বিচিত্র মানুষ সেখানে সঙ্গম তৈরী করেছে সহস্র স্রোতের মিলিত মোহনায়।

স্রোতের টানে ভেসে গেলাম। একদল মেয়ে হাসছে, গান করছে, ঠেলে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেখলাম, সকলেই গৈরিকবসনা। যুবতীর সংখ্যা বেশী, প্রৌঢ়া কয়েকজন। যেন দুটি দল। একদল মেয়ে, ফরসা লাল টুকটুকে, বোঁচা নাক, টেপা ঠোঁট, খুদে চোখ। খাটো গড়ন। বাকিরা সকলেই আর দশজনের মত। কটা কটা চুল এলিয়ে, হাসি খুশি খেলায় তারা বনবালার মত উদ্দাম হয়ে চলেছে। কারুর কারুর মস্তক মুণ্ডিত। চোখাচোখি হলেই, চোখে মুখে ঝলকে ওঠে হাসি। মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করে ফেললাম একজনকে, 'আপনারা কোত্থেকে আসছেন ?'

সর্বনাশ ! এ যে সেই শ্যামাদের দলের মত কথার পৃষ্ঠে কেবলি হাসি। হেসে একজন বলল, 'আমরা হরিদ্বার থেকে আসছি। তুমি ?'

বললাম, 'বাঙলা দেশ।'

'কোলকাতা ?'

আবার হাসি। জনতাও কৌতূহলিত হয়ে তাকাল এদিকে। এক গৈরিকবসনা বললেন, 'আমরা অবধূতানী। আমাদের আশ্রম আছে হরিদ্বারে।'

অবধূতানী! মনে পড়ল সেই গৃহাবধূতের কথা। মনে পড়ল তার অবধূতানীর হাসিখুশী মূর্তিখানি। কিন্তু এরা কার অবধূতানী ?

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। পথের দুপাশে ভিক্ষুকের ভিড়। সুস্থ, অসুস্থ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, অন্ধ। তাদের সামনে বিছানো ময়লা কাপড়ে ডাল চাল ফুল পয়সার ছড়াছড়ি। এরই মধ্যে সাপুড়ে বসে গিয়েছে সাপ নিয়ে। ময়াল ছেড়ে দিয়ে বসেছে ওষধি লতাপাতা ছড়িয়ে। তাদের চীৎকারে কান পাতা দায়।

হটযোগীরা আরম্ভ করেছে যোগ দেখাতে। মাটির তলায় মাথা দিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছে পা। কেউ চিত হয়ে, খালি গায়ে শুয়ে আছে কণ্টকশয্যায়।

এক যায়গায় দাঁড়াতে হল। বছর দশেকের একটি ছেলে, ছাই মেখে শুয়ে আছে কাঁটার বিছানায়। মুখ হাঁ করে রয়েছে। জিভে ফোঁড়ানো লম্বা একটি তীক্ষ্ণ সরু ত্রিশূল। তার লাল চোখ বেয়ে জল পড়ছে। কাঁপছে থর-থর করে।

বিস্ময়ে ব্যথায় চমকে উঠলাম। এইটুকু ছেলেকে দিয়ে কেন এ ভয়াবহ ধর্মলীলা। এ মহামেলায় এমন করুণ দৃশ্যের অবতারণা কেন ?

পরমুহূর্তেই মনে হল, শুধু কি ধর্ম ? প্রাণের এ যন্ত্রণার মধ্যে কি ওর কোন সাধনা নেই ? বাঙলা দেশে কত ছেলে পথে পথে, বাজারে ট্রেনে এমনি ভয়ঙ্কর সাধনায় ব্যস্ত। সেই সাধনা তাদের পেটের। তাদের বাঁচবার সাধনা।

আমার ব্যথার দৃষ্টিদানে ওর থলি ভরবে না। এই নিদারুণ যন্ত্রণাতেও দেখছি, ওর ব্যাকুল নজর রয়েছে সামনে বিছানো কাপড়ের দিকে। ওর সাধনার ডালি ভঁরে উঠেছে কি-না, তাই। মেয়েরা ঘিরে রয়েছে ওকে চারদিক থেকে। করুণার বিচিত্র শব্দ শোনা যাচ্ছে তাদের মুখে।

থাক করুণা। যা দিয়ে ও মানুষের দৃষ্টিকে খোঁচা দিয়েছে, ওর সেই প্রাপ্য মিটিয়ে এগিয়ে গেলাম।

জলের ধারে এসে, সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ধারের কাছে পাঁক হয়ে উঠেছে জল। আর সেই পাঁকের মধ্যে ক্ষিপ্ত মোষের মত ঠেলাঠেলি করছে মানুষ। মেয়ে আর পুরুষ। শিশু ও বৃদ্ধ। ওদিকে সঙ্গমের বুক জুড়ে নৌকার ভিড়। দড়ির সীমারেখা দিয়েছে বেঁধে যমুনার কোলে। প্রতিমুহূর্তে সেখানে বাজছে ভলান্টিয়ারের হুইস্‌ল, উড়ছে পতাকা। ওইটি হল ডেঞ্জর জোন। নীল জলের প্রাণ-ভোলানো হাসির ঢেউয়ের তলায় চিরমৃত্যু রয়েছে তার পাকে পাকে, চোরা বালুতে। ওই যমুনার জলে যে মরেছে, সে আর কবে উঠেছে!

ঠেলাঠেলি করছে, তবু উল্লাসের অন্ত নেই! এ ওকে চান করাচ্ছে, ও একে বুকে করে নিয়ে চলেছে জলে।

মহারাজ, মহারাজ, বলে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল এক বুড়ো। বললাম, 'কী করব?'

সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল জলের কিনারে। তারপর আমার হাতখানি ধরেই জলে কাদায় মাখামাখি করে উঠে এল। কী হাসি! ফোগলা দাঁতে এক গাল হেসে কাদা হাতখানি ঠেকিয়ে দিল মাথায়, 'জীতা রহো বাবা। পানিমে বহুত ডর, সাঁতার নহি জানতা।'

তাই ভাল। আমাকে ধরে সে চান করে নিল। দুঃখের মধ্যে কাদা লাগল জামা-কাপড়ে।

এখানে লজ্জার অবকাশ নেই। কারুর কাপড় খুলে গিয়েছে, কেউ নিজেই রেখেছে খুলে। কেউ অন্তর্বাসটুকুও পরিত্যাগ করেছে। জামাটি অদৃশ্য হয়েছে গায়ের থেকে। সবই ঠিক। তবু, পাঞ্জাবী মহিলারা এদিকে যেন বড় উদাসীন। একে তো অধিকাংশই সাঁতার জানেন না। কিন্তু নির্বিকারভাবে তাঁরা কেমন করে শালোয়ার পাঞ্জাবি খুলছেন। কেমন করে এত লোকের সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে হাসতে হাসতে জলে নেমে আসছেন, জানি নে। হয়তো ওঁদের দ্বারাই সম্ভব এমনি মরালীর মত জলখেলা।

দেখলাম, একজন মাঝি হাঁকছে, দো দো আনা, আসুন। বেশ বড় নৌকা। অনেকে উঠেছে। সঙ্গমের মাঝখানের দিকে তাকিয়ে আর থাকতে পারলাম না। উঠে পড়লাম মাঝির হাত ধরে। পাশে রয়েছে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা। ঐ নৌকার গলুই নেই বাংলা দেশের মত। অল্পতেই ডিঙা টলমল নাচে। অথচ ছোট ছোট ডিঙাতে পাতা রয়েছে গদীমোড়া বেঞ্চি। মাথায় ঢাকনা। কিন্তু এ বড় নৌকাতে ছই বেঞ্চি কিছুই নেই।

আমাদের নৌকা ভরে উঠল। তবু মাঝি ছাড়ে না। সবাই তাড়া দিল। মাঝির দায় কাঁদছে। সে তখনো হাঁকছে, 'সঙ্গমে নাইবে এসো, দু-আনা, দু আনা।'

তারপর যখন নৌকা ডুব-ডুব হল, তখন ছাড়ল। মাঝি খেলা জুড়ল ভাল। একি ভয়াবহ নৌকাবিলাস, আমাদের মত নিতান্ত বেরসিক নরনারী নিয়ে। শুধু হাসির অন্ত নেই কয়েকটি আধুনিক গরম স্যুট-পরা পাঞ্জাবী যুবক ও যুবতীর। অথচ ভয় তাদেরই বেশী। তারা সাঁতার জানে না। আসলে হাসিটাই ভয়ের। নৌকা যত টলমল করে, ততই তারা ভয়ের হাসি দিয়ে জাপটাজাপটি করছে নিজেদের মধ্যে। পুণ্যস্নানের সাত সকালে, চোখে মুখে মেয়েদের প্রসাধনের পলেস্তারা পড়েছে। জামাকাপড়গুলিও জলে নামার মত নয়। বাদবাকি সবাই জড়োসড়ো, উদ্বাস্ত। একটি বাঙালী পরিবারও উঠেছে দেখছি। তিনটি প্রৌঢ়া আর দুই যুবক। অলেস্টারের কলারে আর মাথায় জড়ানো তোয়ালে। এদিকে আবার ঘাড়ে ক্যামেরা।

কুল্যে প্রায় জনা ত্রিশের উপর নরনারী ভিড় করেছে উন্মুক্ত পাটাতনের উপর। ঘাড়ে মাথায়, বুকে মুখে, কাঁখে কোলে পিঠে। তারই মধ্যে মনে হল দুটি কিশোরী, একটি কয়েকমাসের শিশুকে নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পোশাকে চাকচিক্য নেই, কিন্তু অলঙ্কারের বাহুল্য দেখছি খুব। হাতে গলায় কানে সোনা প্রায় অপর্যাপ্ত। তা ছাড়াও একজনের হাতে দেখছি রাশখানেক বেলোয়াড়ি চুড়ি। কিন্তু শিশুটিকে কেন, বুঝতে পারলাম না।

ডাঙায় জনারণ্য, জলে নৌকারণ্য। দাঁড়ে দাঁড়ে বৈঠায় বৈঠায়, হালে হালে, ঠোকাঠুকি। গলুয়ে গলুয়ে ধাক্কাধাক্কি। মাঝিতে মাঝিতে বিবাদ। হটাও,

পাশ দাও। শুধু নৌকার ভিড় নয়, জলের মধ্যে ভিড় মানুষের। কোমরজলে, বুকজলে ডুব আর দারুণ শীতের হিহিক্কার। তার উপরে নৌকার ধাক্কা। ডুব অবস্থায়, একবার চাপলে আর রক্ষে নেই।

মাঝি বলল, 'এখানেই নেমে পড় সব।'

প্রতিবাদের প্রচণ্ড কলরব উঠল। নৌকাই যখন ভাড়া হল, এত শীঘ্র কেন? মাঝি বললে কী হবে। কেউ-ই নামে না। আরো চল, আরো চল।

চারপাশের নৌকাগুলিতে ঝড় লেগেছে। স্নানের ঝড়! কেউ নৌকা ধরে, কেউ হাত ধরে স্নান করছে। হাসিতে, কান্নায়, কলহে, চীৎকারে মুখরিত সঙ্গম।

জলের উপর ভাসছে ফুল বেলপাতা। ঘোলা নীলজলে কোথাও সিঁদুরের গুঁড়ো। কিন্তু আশ্চর্য! এই ঘোলাজলের বুকেও দেখছি দুটি রঙের ধারা চলেছে পাশাপাশি। বর্ষা নয়, গঙ্গা তার স্বভাব গৈরিক বেশ ধারণ করে নি। তার নিরন্তর দক্ষিণাভিমুখী জলের ধারা এখন টলটলে। যত এগিয়ে চলেছি, ততই ঘোলা জল ছাড়িয়ে পরিচ্ছন্ন জলের ধারা দেখা দিচ্ছে।

পাশাপাশি চলেছে যমুনা-গঙ্গা। সাদা নীল দুই ধারা। একজন উত্তর থেকে দক্ষিণে, দৃক্‌পাতহীনা। আর-এক জন পশ্চিম থেকে বাঁক দিয়ে দক্ষিণে। সে শুধু বাঁকা নয়। বাঁকা তার স্বভাব। একজন রাগে অনুরাগে, যুগান্তের বিরহের বেদনার রঙে নীল। আর-এক জন সব পাওয়ার আনন্দের বৈরাগ্যে উদাসীন গৈরিকবসনা। একজন হাসে খিলখিল করে, আর-এক জন খলখল হাসিতে উন্মাদিনী। তবুও দুজনে পাশাপাশি, একই প্রেমের টানে তারা দিগন্তে চলেছে ছুটে। সরস্বতী কোথায়? শুনেছি তিনি গুপ্ত আছেন।

আর নয়। নৌকা থামল। হাওয়া আরো বেশী, ঢেউয়ে দুলছে নৌকা। কিন্তু জল সেই বুকসমান। তার বাইরে চারিদিকে দড়ির বেড়ার পাহারা।

নৌকার পাশে নৌকা। তারই মাঝখানে প্রাণ হাতে করে স্নান। দুই নৌকার মাঝখানে পেশাই হয়ে মরে গেলেও কেউ রক্ষে করবার নেই।

জামাকাপড় ছাড়ার পালা শুরু হল। ছি ছি, মনে মনে বলি, হে মন! চোখ বন্ধ কর। পাঞ্জাবী মহিলাদের জামাখোলার কাহিনী আর বলব না

ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে। কিন্তু তাঁরা নামবেন কি করে? মাঝি বেচারীর অবস্থা কাহিল। সবাই তাকে ধরেই ডুবে ডুবে পুণ্যিটুকু সঞ্চয় করতে চায়। যৌবন-উচ্ছল হাসি-ছলছল, অর্ধনগ্ন পাঞ্জাবী মহিলাদের পাল্লায় পড়ে, ফোগলা-দেঁতো মাঝি হাসিতে বিরক্তিতে 'হায় রাম রাম' করে অস্থির। কিন্তু জলে যদি নামা হল উঠবার নাম নেই। ধন্য! শীতও কি নেই?

সকলেই জামাকাপড় ছাড়ে, আর চায় আমার দিকে। ভাবটা, কে গো মিন্‌সে? জামাকাপড় খোলে না কেন?

হঠাৎ চমকে উঠলাম চাপা কান্নার ফোঁপানিতে। কে কাঁদে এখানে? সেই দুইজন। যাদের মনে করেছিলাম কিশোরী। সেই তাদের একজন কোলে যার কয়েকমাসের শিশু।

আর-এক জন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, হাতে যার বেলোয়ারী চুড়ি, 'রহো, মত রো।' বলছে, কিন্তু চোখে তারও ব্যথার ছায়া। মেঘভারাক্রান্ত সেই চোখে জল নামবে যেন এখুনি, কিছুটা বা লজ্জা! লজ্জাটুকু লোকের জন্য। কিন্তু লোকের নজর তাদের দিকে ছিল না। সকলে ডুবে ডুবে পুণ্যসঞ্চয়ে মত্ত।

তারা কিশোরী নয়, তরুণী। কিশোরীর ছাপ রয়েছে তাদের মুখে। কিন্তু যখন সবাই হাসিতে, কাঁপুনিতে, স্নানে, কোলাহলে মাতিয়ে তুলেছে সঙ্গম, তখন তারা দুটিতে যেন পাশাপাশি বসে চোখের জল ফেলছে।

তারা দুজনে পুঁটলি খুলল। পুঁটলির মধ্যে দামী জামাকাপড়। উপরের জামাকাপড়টি দেখে মনে হল, সাদা মুগার। সকালের রোদের ঝিকিমিকি লেগেছে তাতে। আরও দুটি বস্তু রয়েছে সেই কাপড়ের উপরেই। দুটি সোনার বালা।

গরম-জামা-পরানো শিশুটিকে ভেজা পাটাতনের উপরে শুইয়ে দিল। শুইয়ে দিতেই, শিশুটি শুরু করল পরিত্রাহী চীৎকার। কেন জানি নে, মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। শীতে কুঁকড়ে রয়েছি। শিশুর এই অসহ্য পীড়ন যেন লাগল শরীরের প্রতিটি লোমকূপে।

কিন্তু সে কান্নায় কান দিল না তারা। যে কাঁদছিল, তাকে ধরে দাঁড় করাল আর-এক জন। সে দাঁড়াল, কিন্তু সঙ্গিনীর বুকে মুখ রেখে ভেঙে

পড়ল উচ্ছ্বসিত কান্নায়। বাতাসে খসে গিয়েছে তার ঘোমটা, উড়ছে রুক্ষ চুলের গোছা। এবার তার সঙ্গিনীও ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'কাঁদিস নে শিবপিয়ানী, বোন আমার কাঁদিস নে।'

কিন্তু আশ্চর্য। তাদের সঙ্গে নেই কোন পুরুষ সঙ্গী। এ নৌকার কোন মানুষের নজর নেই সেদিকে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। বুঝলাম, সবাই ভাসছে নিজ নিজ হৃদয়াবেগে। সেই তিন বাঙালী প্রৌঢ়াদের একজন কাঁদছে জলে দাঁড়িয়ে। ডুব দিয়ে উঠছে, কাঁপছে শীতে ঠকঠক করে, তবু জলের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে আর ফিসফিস করে বলছে অনেক কথা।

এদিকে শিশুটি, কান্নার আবেগে, নিজের দুটি পা ধরেছে মুঠি করে, ঢুকিয়ে দিচ্ছে প্রায় নিজেরই মুখে। তারপরেই হঠাৎ কাত হয়ে, উপুড় হয়ে পড়ার মুহূর্তে হাত দিয়ে ধরে ফেললাম। ধরে তুলে নিলাম কোলের উপর।

মেয়ে দুটি অবাক হয়ে তাকাল চোখের জল নিয়ে। তারপর কৃতজ্ঞতা দেখা দিল। এমন কি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাসল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এমন করে ফেলে রেখেছ কেন ওকে?'

শিবপিয়ানীর সঙ্গিনী বলল, 'আমরা স্নান করব।'

কী স্নান! ভেজা পাটাতনের উপর শিশুকে রেখে পুণ্য করতে নামছে দুটিতে। নৌকার ভিড়ের চাপেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বাচ্চাটাকে কেন?'

সঙ্গিনী বলল, 'ও চান করবে।'

চান? পৃথিবীতে আসতে না আসতে পুণ্যস্নান? জিজ্ঞেস করলাম, 'ওকে কেন? তোমরা করলে হত না?'

দুঃখ থাক, বেদনা থাক, এমন করে কথা আরম্ভে তারা দুজনেই কিছুটা বিব্রত, সঙ্কুচিত। একটু চুপ করে থেকে সঙ্গিনী বলল, 'ওর বাবা নেই, ওকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে, না চান করালে চলবে কেন?'

বলতে বলতেই দেখলাম, সঙ্গিনীর শিবপিয়ানী আবার ব্যাকুল হল কেঁদে। তারপর দুটিতে নৌকার ধারে গেল। সঙ্গিনী বলল, 'ওর মাকে একটু চান করিয়ে দিই। তুমি —

বাদবাকি চাউনিতেই প্রকাশিত। 'তুমি বাচ্চাটাকে দেখো।'

ওরা নেমে গেল জলে। ডুব দিল। আর উত্তরপ্রদেশের এই দুরন্ত পিতৃহীন শিশু এক অপরিচিত বাঙালীর কোলটি কচি কচি পা দুটো আছড়ে, ঠেলে, শূন্য হাত তুলে লালা উদ্গীরণ করে মাতিয়ে তুলল। বুঝলাম, যুবতী শিবপিয়ানী বিধবা। এই শিশুর মা।

শিশু মানুষ চেনে না বুঝি এখনো। মানুষের উষ্ণ কোলটি বুঝেছে। কোলটি পেয়েছে, অমনি চারিদিকে আলো ও শব্দের মাঝে তার বিচিত্র জগতে গিয়েছে হারিয়ে।

সকলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম, পুণ্যস্নান দেখব বলে। কোথা থেকে এসে বুক জুড়ে বসল এক শিশু। তার পরিচয় জানি নে। কেমন ছিল তার বাপ, কে জানে! ওর মায়ের দেহে অলঙ্কার দেখে অনুমান করতে পারি নি, সে বিধবা। জানি নে, ওই অলঙ্কারের পেছনে কতখানি নিরাপত্তার খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে এই শিশুর জন্য। পিতৃহীনতা বোঝে না, পুণ্য বোঝে না। এই সঙ্গমের বুকে এক বিচিত্র মানুষ, ও এসেছে ওর পরমায়ুর সন্ধানে, এই অমৃতকুম্ভের সঙ্গমে। ওর এই পরমায়ুর সন্ধান পীড়ন মাত্র। এই পীড়নের পেছনে আছে কুসংস্কার। কিন্তু ওর মায়ের সারা বুক জুড়ে রয়েছে ও। প্রাণের আকাঙ্খার মর্যাদাই এখানে বড়। কুসংস্কার তো সমাজের অভিশাপ।

ওর বাবা নেই, সেজন্য যতটুকু ব্যথা, ওর বুকজোড়া দাপাদাপি সেই পরিমাণেই উল্লাসের ধ্বনি হয়ে বাজল বুকে। এক সঙ্গীকে হারিয়েছিলাম পথে আসতে। সে আসছিল তার ব্যাধিমুক্তি ও আয়ু সন্ধানের জন্য। আমরা একজন মরি, আর একজন জন্মাই। দিবানিশি এই যাওয়া আসার মধ্যে আমরা নতুন থেকে নতুনতর। একজনের আকাঙ্খা পুরাই আর-একজন। একজনের পথের শেষে শুরু করি আর-একজন। সেইজন্য আমরা মানুষ, আমরা বন্ধু।

একজন বিড়ম্বিত জীবনের প্রসাদ করালরোগ নিয়ে চলে গিয়েছে, আর-একজনকে আলিঙ্গন করেছি। ওকে পথে পেলাম, পথেই ছেড়ে দিয়ে যাব: ও বেঁচে থাক, পথের এই কামনা নিয়ে ঘরে ফিরে যাব।

শিবপিয়ানী উঠেছে, কাপড় ছেড়েছে। কথায় বুঝলাম, তারা দুই জা। বাড়ি এলাহাবাদ শহরেই।

নতুন কাপড় পরে শিবপিয়ানী পুঁটলি থেকে ফুল-বেলপাতা গোছাতে গোছাতে বার বার গুপ্ত কটাক্ষে দেখল তার শিশুকে। তার ঘোমটা তুলে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দাও।'

তুলে দিলাম। দুজনে মিলে শিশুর জামা খুলে, আবার শুইয়ে দিল পাটাতনে। দিয়ে, অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে ছিটিয়ে নাইয়ে দিল তাকে। আর-এক দফা চিলকণ্ঠের চেঁচানি ছাপিয়ে উঠল লক্ষ লক্ষ গলার চীৎকার। জামা পরিয়ে তার হাতে পরিয়ে দিল সোনার বালা। তারপর ওকে আবার শোয়াতে গিয়ে অসঙ্কোচে তুলে দিল আমার কোলে।

দিয়ে নিজেরা ফুল বেলপাতা সিঁদুর দিল জলে। হঠাৎ কী হল জানি নে। শিবপিয়ানীর হাত চেপে ধরল তার জা। কিন্তু শিবপিয়ানী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের হাত থেকে দুটি সোনার চুড়ি খুলে ফেলে দিল জলে।

শুধু তার জা ম্লান হেসে বলল, 'পাগলী।'

কিন্তু বাধা দিলেও আক্ষেপ নেই তার আর। এবার আমার দিকে ফিরে একটু হাসল শিবপিয়ানী। হেসে, দেখল নিজের ছেলেকে। এবার আর নিজে না বলে, সঙ্গিনী জাকে বলল, 'ওকে আমার কোলে দাও।'

বুঝে, আমি নিজেই শিশুটিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলাম।

মাঝি হাঁক দিল, 'ওঠো ওঠো। আমাকে আবার খেপ দিতে হবে।'

এখনো অনেকেই জলে। শিখ গৃহিণীদের দেখছি এখনো ওঠবার নাম নেই। স্বয়ং শিখ পুরুষেরাও নেমেছে।

হঠাৎ ওভারকোটে টান পড়তে পেছনে ফিরলাম। দেখি, আলুলায়িত সিক্ত কেশ ও শ্মশ্রু উৎফুল্ল শিখ একজন। চোখে তার রীতিমত দুষ্টামির হাসি। বলল, 'আরে ভাই, তুমি জলে নামছ না কেন?'

সর্বনাশ! জলে নামব কি এইসব জামাকাপড় পরে। বললাম, 'বিমার হ্যায়।'

যতক্ষণ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, ততক্ষণে জলের ছিটায় ভিজে উঠেছে আমার ওভারকোট। একলা নয়, সঙ্গিনীসহ হাসিতে চীৎকারে ভয়াবহ জলকেলিতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। হেসে বলল, 'আরে ভাই, থোড়া তো লাগাও।'

লাগাব কি! ঠাণ্ডা জলের কয়েকটি ধারা তখন শরীরটাকে কেটে কেটে নীচে নামছে। সকলেই হেসে উঠল।

মাঝিটাও হাসতে গিয়ে যেন কেঁদে উঠল। বলল, 'নৌকা ছেড়ে দেব কিন্তু।'

আবার নৌকার ভিড় ও মানুষের মাথা ঠেলে ফিরে আসা।

পাড়ে এসে, ভিড়ের মধ্যে দেখলাম থনপিসী। প্রায় বিপুলকায় পুরুষের মূর্তি ধরেছে। মাথাটি একেবারে নিরঙ্কুশ মুণ্ডিত। কী কাণ্ড! প্রহ্লাদ, দি'মাও দেখছি ন্যাড়া মাথা।

তখনো নৌকা থেকে নামা হয় নি। প্রহ্লাদ দেখে ফেলল। বলল, 'এই যে দাদা, বেশ হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন। মাথা মুড়োবেন না?'

হেসে বললাম, 'না।'

প্রহ্লাদ বলল, 'কেন? পাপ করেন নি কোন দিন?'

জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেললাম। প্রহ্লাদ বলল, 'করেছেন নিশ্চয়ই। মুখ দেখেই মনে হচ্ছে। জানেন না,

প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা।
মরগে' পাপী যথা তথা॥

মুড়িয়ে নিন, তারপর আবার পাপ করবেন, কিছু হবে না। আগের পাপটা তো কাটান।'

থনপিসী খ্যাঁক করে উঠল, 'ছি ছি ছি, কি অনাচ্ছিষ্টির কথা। সঙ্গমে দাঁড়িয়েও মুখের রাখ-ঢাক নেই?'

প্রহ্লাদ অন্যদিকে ফিরে বলল, 'আর রাখ-ঢাক, শালা এখনো সকাল থেকে দু-হাত এক হল না, সঙ্গম দেখাচ্ছে।'

দু-হাত এক হওয়া মানে, দু-হাতে কলকে ধরা। ভাগ্যি কথাটা খন-পিসীর কানে যায় নি। ব্রজবালা জলে নেমে কাঁপছে ঠকঠক করে। চকিতে একবার আমাকে দেখল, তারপর আবার ঘোমটায় আড়াল।

আমাদের নৌকা পাড়ে ঠেকল প্রায় খনপিসীবাহিনীকে ভেদ করে।

নৌকা থেকে সবাইকে হাত ধরে ধরে নামাল মাঝি। শিবপিয়ানী আর তার জা নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে ছিল বলতে পারি নে। ভয়াবহ ভিড়ের ঝড়ে খাড়া হয়ে ছিল কোনরকমে।

আমি নেমে আসতে শিবপিয়ানীর জা বলল, 'যাচ্ছি !'

বললাম, 'আচ্ছা।'

শিবপিয়ানী তার কোলের ছেলেকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'বল্ যাচ্ছি !'

আচমকা ঝাঁকানি খেয়ে শিশু একটু অবাক হয়ে থমকে রইল। পরমুহূর্তে হাত-পা আস্ফালন করে কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দ করে উঠল তার মাড়ি দেখিয়ে। শিবপিয়ানী ঘোমটার আড়াল দিয়ে একটি হাসিচকিত কটাক্ষে যেন বলে দিল, 'দেখলে তো, কেমন বলতে পারে ?' তারপর শিশুকে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল তারা !

একটি নিশ্বাস ফেলে আবার ফিরে দেখতে গেলাম খনপিসিবাহিনীর দিকে। কিন্তু ও কে ? খনপিসির পাশে ? সর্বনাশ ! সর্বনাশী স্বয়ং ? আমারই বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। না জানি কী দুর্ঘটনা ঘটে যাবে চক্ষের পলকে ! কিন্তু কী আশ্চর্য ! এত কাছে, প্রায় গায়ে গায়ে, তবু খনপিসির চোখে একবারও পড়ছে না সর্বনাশী।

আর এ কী বিচিত্র বেশ সর্বনাশীর ! এ বিচিত্র বেশ তার কাপড়ে নয়, জামায় নয়, সিঁদুরে। তার সিঁথি-ভরানো সিঁদুরে, তার কপাল-লেপা সিঁদুরে। কপাল ও সিঁথির মেটে সিঁদুরে মাখামাখি হয়েছে সারা মুখ। জলে-ভেজা জামা-কাপড়। তার বক্ষলগ্ন এক পুরুষ। কালো রোগা ক্ষীণজীবী পুরুষটির গলায় একরাশ মাদুলি। বহুদিনের না-কাটানো এক মাথা ধূলিরুক্ষ জটের মত চুল। শীতে কাঁপছে থরথর করে। দু-হাতে

আঁকড়ে ধরে আছে সর্বনাশীর বুক ও পিঠ। অসহায় জীবের মত তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

সর্বনাশীর চঞ্চল চোখে কোথায় সেই দুরন্ত কটাক্ষ, কণ্ঠে সেই সেয়ানা পাখির ডাক! গম্ভীর মুখে তার বিষন্ন স্নেহজড়িত হাসি। স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে বক্ষলগ্ন পুরুষটিকে। কী যেন বলছে তাকে আর অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে ঢেলে দিচ্ছে তার মাথায়। পুরুষটি মাথা পেতে জল নিচ্ছে আর শিশুর মত হেসে উঠছে!

হঠাৎ একটু ধাক্কা লাগল খনপিসির গায়ে। মুণ্ডিতমস্তক খনপিসি তখন কোমরজলে দাঁড়িয়ে, আহ্নিক সেরে নিচ্ছে। বিরক্ত চোখে ফিরে তাকাল। বুঝলাম, এখুনি লাগবে, পিট্টান দিই তার আগেই। কিন্তু অবাক কাণ্ড। খনপিসির বিরক্ত মুখে দেখি হাসির আলো। মুণ্ডিত মস্তক, প্রকাণ্ড মুখে সে হাসি যে কতখানি বিচিত্র না দেখলে বুঝি বোঝা যায় না। কিন্তু কেন? খনপিসি কি সর্বনাশী মেয়েটাকে চিনতেও পারল না? পরিবেশে ও কাজের গুণে মানুষের চেহারাও কি বদলে যায়?

তাই। তাই যায়। জানি নে, কেমন করে চিনতে পারলাম সর্বনাশীকে। কিন্তু খনপিসি স্থূল ঠোঁট দুটি বিস্ফারিত করে জিজ্ঞেস করল, 'কে বাছা এটি? তোমার স্বামী?

সর্বনাশী জবাব দিল ঘাড় নেড়ে, 'হ্যাঁ।'

বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এল পিসির চোখে। বলল, 'আহা, ব্যামোয় ভুগছে বুঝি অনেকদিন থেকে?'

সর্বনাশীর চোখেও ঘনিয়ে এল তেমনি ছায়া। বলল, 'হ্যাঁ, অনেকদিন।'

খনপিসি ব্যথা-কাতর চোখে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে দেখল পুরুষটিকে। ছলছলিয়ে উঠল চোখ। একটি উদ্গত নিশ্বাসের মধ্যে পরম আশ্বাসের সুরে বলে উঠল, 'ভাল হয়ে যাবে মা, আমি বলছি। এত কষ্ট করে সঙ্গমে নিয়ে এসেছ, কে নেবে ওর পেরমায়ু। তোমার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক, চির-আয়ুষ্মতী হও।'

বলে আকাশের দিকে মুখ তুলে নমস্কার করল খনপিসী। জানি নে, কী বুঝল ওই বিদেশিনী এই বাংলা কথার আশীর্বাদের। সে তার বরকে বার বার সঙ্গমের জল দিয়ে সিঞ্চিত করতে লাগল। কিন্তু আমার মনে শুধু বিস্ময় ছিল না। আরো কিছু ছিল।

যা ছিল, তা আমার আনন্দমুখরিত বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও বেদনার নমস্কার। নমস্কার মানুষের জীবনের ও হৃদয়ের কোটি কোটি বৈচিত্র্যকে, অপরূপ বিচিত্রকে।

মনে করেছিলাম ওই মেয়ে শুধু সর্বনাশের হাতধরা সঙ্গিনী। মনে করেছিলাম, সেই সর্বনাশে শুধু পাপলীলা। ধ্বংসের উন্মাদনায় মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধায় ও প্রেমহীনতায়, সে শুধু তার যৌবনের অগ্নিকণা ছিটিয়ে যায় মানুষের চোখে। অস্বীকার করব না, তার ভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কিল হাত থেকে নিজের পয়সার ব্যাগটি বাঁচিয়ে ধিক্কার এসেছিল মনে। ভেবেছিলাম, পঙ্কে ডুবে যাওয়ার জন্য যাতে হাত পড়েছিল, তাকে বুকে মুঠি করে ধরে এ কোন্ এক পয়সা-সর্বস্ব অসহায় মানুষ আমি?

আজ সেই পঙ্ক-সঙ্গমের অঙ্কে। পঙ্ক? একেই মনের সেণ্টিমেণ্ট বলে কিনা জানি নে। কিন্তু ওই পুরুষটি যদি ওর বর না হত, হত অন্য কোন পথেরই মানুষ। তাহলেও কি নত হৃদয়ের এ নমস্কারকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম? কে পারত? হৃদয়ের কোনও এক অংশ জুড়ে ছিল যার এই লীলাক্ষেত্র, প্রেমে ও স্নেহে যে সর্বনাশী এমন মূর্তি ধরতে পারে, যে এমনি করে অমৃতে হয় একাকার, তাকে পঙ্ক বলে ফিরে যাব, সে দুঃসাহস আমার নেই। যেন কারুর কোনদিন না থাকে।

খনপিসি নয় শুধু, দলের কেউ-ই তাকে চিনল না। সেও চিনল কি-না কে জানে! এখন যদি একবার চোখাচোখি দেখা হয়, তবে হয়তো আমাকেও চিনতে পারবে না। পারবে না, কেন না, আমি যে তার এ জীবনের কেউ নই। এখন সে ডুবে আছে। সেখানে তার নিজের মেলা। সেখান থেকে যখন উঠবে ভেসে, তখন এই বাইরের মেলা, তখন আমরা, তখন আমি।

ভিড় ঠেলে এলাম উপরে। আজ আর না-ই হোক দেখাদেখি। সে যে বিচিত্রের দ্বার খুলে দিয়েছে আমার চোখের সামনে, সেই দোরগোড়ায় জমা হয়ে থাক আমার বিস্ময় ও নমস্কার।

উঠে দেখি ঘোড়সওয়ার ছুটছে। নেহরু আসছেন। মানুষের দুরন্ত গতি আচমকা দুদিকে ভিরছে। এক দিকে প্রধানমন্ত্রী, অন্যদিকে সঙ্গম।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা স্পর্শে ফিরে তাকালাম। সর্বনাশ! তাকিয়েই লাফিয়ে সরে গেলাম দু-পা। একটি প্রকাণ্ড ময়াল সাপের ল্যাজ এসে ঠেকেছে গায়ে। ল্যাজটি টেনে গলায় জড়িয়ে নিয়ে, একরাশ হলদে দাঁত বের করে হাসল সাপের মালিক। ভাঙা মোটা গলায় বলল, 'কুছ ডর নহি বেটা। এ মন্ত্রপুত শিব-হার।'

একে তো ভয় পেয়েছিলাম। তার উপরে হেসে হেসে এ ভয়ংকর শিব-হারের কথা শুনে বড় রাগ হয়ে গেল। বললাম, 'খুব হয়েছে। সাপের ল্যাজ ঠেকিয়ে ছাড়া কী ডাকা যায় না?'

কিন্তু রেয়াত করলে না। সে আমার রাগকে। পরনে তার ময়লা গেরুয়া আলখাল্লা বিশেষ। হিসাব করলে মিলবে শতখানেক তালি। চেহারায় খানিকটা ভূতানন্দ ভৈরবের ছাপ। চুল-দাড়িও সেই রকমেরই। কিন্তু গলায় অতবড় একটা ময়াল, এই দারুণ ভিড়ের জনতাকেও দূরে সরিয়ে রেখেছিল অনেকখানি। যে দেখে, সেই ভীত চকিত চোখে তাকিয়ে কয়েক হাত তফাত দিয়ে যায়। কাঁধে তার বড়সড় ঝুলি একটি। হাতে বিচিত্র লাঠি। লাঠি নয়, যেন একটি আঁকাবাঁকা সাপ।

আমার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে সে শিবনেত্রে চেয়ে হাসল। হেসে বলল, 'দেখ বেটা বাবুজী, এ যাকে স্পর্শ করে, তার কপাল ভাল। তোরও কপাল আমি খুব ভাল দেখছি বাবুজী।'

বলে সে সত্যি সত্যি কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করল আমার কপাল। বুঝলাম, গতিক ভাল নয়। বাপ মা আত্মীয় বন্ধুস্বজনে যে কপাল কোনদিন ভাল দেখে নি, সে কপাল আজ অকস্মাৎ এই আলখাল্লাধারীর কাছে

ভাল হয়ে ওঠা ভাল নয়। পেছনে ফেরার উদ্যোগ করে বললাম, 'হবেও বা।'

সে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে বলল, 'শুন্ বেটা, কোথায় যাচ্ছিস্। তোর ভাগ্য ভাল। কপালে তোর শিব লীলা করছে। আজ তোকে আমি মহাদেবের প্রসাদ দান করব।'

বলে সে চট করে হাত ঢুকিয়ে দিল তার ঝুলিতে। বন্ধ মুঠি বের করে বলল, 'হাত-পাত্।'

বুঝলাম, বিপদ বড় দড়ো। কী দেবে সে হাতে? একবার এক সাপুড়ে এমনি হাত পাততে বলে, বেমালুম হাতের উপর ছেড়ে দিয়েছিল একটা জীবন্ত কাঁকড়া বিছে। অবশ্য সে বিছের হুল ছিল না। কিন্তু শিউরুনি তো কাটে না তাতে। এও যদি তেমনি হয়?

বললাম, 'কী আছে, দেখাও।'

সে বলল, 'নারাজ ন হো বেটা। হাত পাত্ আমি দিচ্ছি।'

কী মুশকিল। এদিকে ভিড় হচ্ছে আমারই চারপাশে। যত আমি চলতে চাই, সে তত আমার পেছনে ধাওয়া করে। হাত পাততে হল। সে আমার হাতের উপর কী একটা দিল। চেয়ে হঠাৎ মনে হল, কোন ছোট জাতের পোকা, কিন্তু মৃত। বস্তুটি শক্ত, সরু ও লোমশ।

জিজ্ঞেস করলাম 'কী এটা।'

সে বলল চাপা গলায়, 'শেয়ালের সিং।'

শেয়ালের সিং? অনেক চতুষ্পদীয়ের সিং দেখেছি চোখে ও ছবিতে। কিন্তু এমন অভূতপূর্ব বস্তু তো কখনো দেখি নি, শুনি নি; শেয়ালের আবার শিং গজায়! বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা না হয় রইল। কিন্তু শেয়ালের শিং দিয়ে কী রূপ খুলবে আমার কপালের? জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কী করব এ দিয়ে?'

সে বলল হেসে হেসে, 'তোর কিছু করতে হবে না বেটা। তুই খালি রেখে দিবি। যা করবার, স্বয়ং শিব করবে। সব শিয়ালের শিং হয় না। যে মহাদেবের সাক্ষাৎ পায়, তারই হয়। কখন? না, যখন মহাদেব কালিকা

দেবীর সঙ্গে মিলতে আসেন, তখন যে৷ 'শিয়ার' তাঁর সাক্ষাৎ পায় তারই শিং গজায়। তোর কপাল ভাল, পেয়ে গেলি।'

তা হবে হয়তো। কিন্তু যে সাধনা আমি করি নি, তার ফলে কেন ভাগ বসাই। জানি নে মহাদেবের দর্শনপ্রাপ্ত কোন্ :সে ভাগ্যবান শেয়াল, আর তার শিং কেটে ভাগ্যবান আজ এই সাধক। কিন্তু আমার ভাগ্যের বড় দুরূহ পথে যাত্রা। এ দিয়ে আমার কী হবে?

আমার দ্বিধান্বিতভাব দেখে আলখাল্লাধারী তাড়াতাড়ি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ইস্ মে বশীকরণ হোতা হ্যায় বেটা। দুনিয়া তোর বশ হয়ে যাবে। মনের মানুষ তোর কাছে আসবে। তোর দিল ভরে দেবে।'

হেসে উঠলাম। যে মন নিয়ে বেরিয়েছিলাম পথে, সেই মনের হাসিটা যেন এই কদিন পরে গঙ্গা-যমুনার তীরে বেরিয়ে এল স্বরূপে। বশীকরণ, তাও মনের মানুষকে? মনের মানুষ খুঁজতে গিয়ে কেউ বিবাগী। কেউ পেয়ে, না পেয়েও বিরাগী। মনের মানুষ! সে কেমন জানি নে। কোথায় তার বাস, কেমন তার রূপ তাও জানি নে। নিশিদিন তো খালি এই গুনগুন করেছি,—

ঘুরেছি পথে বিপথে
গহন বনে বনে।
মন-পাখি গেয়েছে শুধু
রয়েছি, তোমারি মনে মনে॥

অকারণে কেন মনের মানুষকে শেয়ালের শিং দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করা। সে যে আড়াল থেকে এই লক্ষ মুখের হাসি দিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করবে। বললাম, 'সাধুজী, এ আমার দরকার নেই।'

কিন্তু সে নিরাশ হবার পাত্র নয়। গম্ভীর মুখে, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'বেটা সব দরকার তো তোর বোঝার মধ্যে নয়। এটা তোকে নিতেই হবে। হাওয়া লাগাস নি, পবিত্রজ্ঞানে পাকিটে ফেলে রাখ। আর আমায় খুশী করে দে!'

তাকে খুশী করাটাই বোধ হয় আসল। বুঝলাম, শেয়ালের শিং না গছিয়ে সে ছাড়বে না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীভাবে, বল ?'

সে চোখ বুজল, আবার খুলল। বলল 'বেশী নয়, আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দে।' অচিরাৎ তার বশীকরণ যন্ত্র বাড়িয়ে ধরলাম। আমার শহুরে মূর্তি ধরে বলতে হল, 'এই নাও বাবা, তোমার জিনিস। পাঁচ টাকা দিয়ে এ জিনিস কিনতে পারব না।'

কিন্তু সে আমার চেয়েও অগ্রসর। বলল, 'কেনাকাটা নয় বাবা, দান। তোমারো দান আমারো দান। আচ্ছা দুটো টাকা দে।'

আমি হাতটা আরো এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমাকে রেহাই দাও সাধুজী, দু-টাকা আমার কাছে নেই।'

'কত আছে বেটা ?'

মিথ্যের আশ্রয় না নিয়ে আর পারলাম না। বললাম, 'চার আনা আছে।'

চোখে তার অবিশ্বাস দেখা দিল। অবিশ্বাসী চোখে একবার দেখল আমার আপাদমস্তক। হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, 'তাহলে ফিরিয়েই নিতে হয়।'

বাঁচলাম। ফিরিয়েই দিতে গেলাম। সে চিন্তিতভাবে বলল, 'কিন্তু দান তো ফিরিয়ে নিতে পারি না। আচ্ছা দে, চার আনা-ই দে। তোর কপালে ছিল।'

এতখানি যখন হল, আর-একটু হোক। বললাম, 'তোমাকে চার আনা দিলে আমি কী খরচ করব ? দু-আনা নাও।'

এবার আর তার মুখে কথা নেই। তীর্থক্ষেত্রে যে আমার মত এমন বেয়াদব পুণ্যার্থী থাকতে পারে, এটা বোধহয় সে ভাবতে পারে নি। সে বড় বিমর্ষ হয়ে পড়ল। কোথায় তার সেই সাধনদীপ্ত চোখ ? দেখি দুর্ভাগার করুণ দুটি চোখে তার নিরাশার গ্লানি। দু-আনা দিলাম। সে তবু হাত পেতে রইল।

চলে যাই দেখে ডেকে বলল, 'বাবুজী, গরিবকে একটু চা খাওয়াও। আর কী বলব ?'

তার মাঝে এবার আসল মানুষটি দেখা দিয়েছে। জীবনের রসদ খোঁজার এই তার পন্থা। মানুষের আসল মূর্তি দেখা দিলে কে আর তাকে অবহেলা করতে পারে। বললাম, 'চল খাওয়াচ্ছি।'

সঙ্গমের এই তাঁবু-সমুদ্রে চায়ের দোকানের অভাব নেই। দোকানে গিয়ে বললাম, 'তোমার বস্তু তুমি নাও, পয়সা তোমাকে দিতে হবে না।'

সে গরম চায়ে ফুঁ দিতে দিতে জিভ কাটল। 'আরে বাপরে, ও আব আমি ফিরিয়ে নিতে পারব না।'

ভাণ্ডি তো মচকাই না। চায়ের গেলাসে ঘন ঘন চুমুক দিয়ে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল তার। শেয়ালের শিং দিয়ে বশীকরণ করতে পারল না। ওই চোখ দিয়ে বশীভূত করল সে আমাকে! চায়ের পরে আরো দু-আনা দিয়ে বললাম, 'চলি সাধুজী।'

বিস্মিত হাসিটি তার চোখে দেখা দেওয়ার আগেই ভিড়ে মিশলাম।

ভিড়ের মধ্যে হিদের মা। হাত ধরে বলল, 'বাবা যে!'

ঘুরে ঘুরে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। আশ্রমমুখী হয়েছিলাম। দেখলাম, হিদের মার সামনে একজন সাধু।

বললাম, 'কী করেছেন?'

হিদের মা সাধুকে দেখিয়ে বলল, 'এই বাবুজীর কাছে বসে একটু কথা শুনছিলুম। বড় সুন্দর কথা বলে। বলে, মা; যে জন্ম-দেনদার, সে যদি মুখ ঘুরিয়ে চলে, পাওনাদার হাসে। তুই খুব হাস, হেসে হেসে বেড়া। মায়ের দেনা শোধ হয় না। তুই মরলে, তোর ছেলে মুখে আগুন দিয়ে কাঁদবে। ভাববে, তখন কেন দেনা শোধ করি নি মায়ের?'

বলে হাসল হিদের মা। মোটা আর ফাটা লেন্সের আড়ালে সেই মুগ্ধ চোখজোড়া। কিন্তু হাসিটি যেন অসম্পূর্ণ। বলল, 'তা হলে যাই বাবাজী। বাবাজী, আবার কাল আসব, আপনি আমাকে একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ সাধু মিলিয়ে দেবেন। আমি তাঁরে ভোজন করাব।'

সাধু ক্ষীণদেহ। জটা প্রকাণ্ড। তবে, এই শীতেও নগ্নদেহ। শুধু কপনি

ঝাঁটা। বলল, 'বটে। বেশ তো মা, আমিও ব্রাহ্মণ। আমাকে ভোজন করিয়ে দাও।' হিদের মা এক মুহূর্ত দেখল সাধুটির দিকে, তারপর বলল, 'বেশ তো বা বাবা, চল, তুমিই আমাকে আশীর্বাদ করবে।'

আমি বললাম, 'তা'লে চলি আমি?'

কিন্তু হাত ছাড়ল না হিদের মা। বলল, 'যাবে কেন? চল, বাবাজীকে খাওয়াই। দেখে যেও।'

বলে, আমার আপত্তি না মেনে হাত ধরে নিয়ে চলল সে আমাকে। এতে আমার কিছুই করবার ছিল না। কৌতূহলও অনুভব করলাম না। বরং খানিকটা ভয়ই ছিল। হিদের মা খাওয়াবে, কিন্তু কী দিয়ে খাওয়াবে সে!

সামনেই একটি ছোট খাবারের দোকান দেখে দাঁড়াল হিদের মা। আহ্বান করল বিদেশী দোকানদার। মেলায় তেমন ভিড় নেই দোকানটিতে। পিতলের বড় বড় বাটায় করে সাজানো রয়েছে প্যাঁড়া, পাকানো খোয়া আর সন্দেশ। পুরিও ভাজা হচ্ছে।

হিদের মা দোকান থেকে জল চেয়ে নিল। নিজের হাতে জল ছিটিয়ে, আঁচল দিয়ে মাটি লেপে সাধুকে বলল, 'বোসো বাবা।'

সাধু বসে বলল, 'কত খাওয়াতে পারবি মা?'

হিদের মা বলল, 'যত তুমি খেতে পার বাবা।' বলে দোকানদারকে বলল, 'বাবাজীবনকে খেতে দাও বাবা। পুরী সন্দেশ পেড়া, সবরকম দাও।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মুখ চুন হয়ে উঠল। ও কি খাওয়া! এ যে থামতে চায় না! কিন্তু হিদের মা মুগ্ধচোখে, যেন প্রাণভরে সেই খাওয়া দেখছে। আমার মুখ চুন হল, কারণ, আমার যে এক ভয়। সে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে হিদের মা নিজে। এত পয়সা সে কোথা থেকে দেবে? তবে কি, ভাবতে যতই সঙ্কোচ হোক, তবে কি সেইজন্যেই হিদের মা হাত ধরে স্নেহ ভরে ডেকে নিয়ে এল আমাকে।

এবার দোকানীরও চোখে সংশয় দেখা দিল। তার ছোট দোকান, খুবই ছোট। মাল তার খুবই কম। তবু একজনের পক্ষে সে যে অমানুষিক। কিন্তু তার পেতলের বাটার ভাণ্ডার ফুরিয়ে এল। যত ফুরিয়ে আসতে লাগল, তত

সে সংশয়ান্বিত। একবার দেখছে হিদের মার দিকে। আর-একবার আমার দিকে। আমার জামা-কাপড়ের দিকে। সে চাউনি দেখে আমার বুকে ধুকুপুকু। এ কী বিপদে এনে ফেলল আমাকে হিদের মা।

কিন্তু আশ্চর্য! সহজ ও নির্বিকার খাওয়া সাধুর। তার কি একটু কষ্টও হচ্ছে না? দেখতে মানুষটি সে ওইটুকু, কিন্তু পাতা তার কেবলি খালি হয়ে চলেছে। এ কি সে-ই খাচ্ছে, না আর কেউ?

দোকানী না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'আর দেব মায়ীজী?'

হিদের মা বলল, 'দেবে না বাবা? উনি যত খাবেন, তত দাও। খাওয়াও। খাইয়ে তোমার আমার, সকলের সুখ। কী বল বাবা, অ্যাঁ?'

বলে সে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু এত অসহায় বোধ আর কখনো করি নি। যা-ই বলি, যা-ই বল, সংশয় পেরিয়ে সন্দেহ আরার বদ্ধমূল হতে চলল। পকেটের মধ্যে আমার পয়সার পুঁটলিটা যেন বন্দী ইঁদুরের মত লাফালাফি করছে বেরিয়ে পড়বার জন্য। ওটাকে যদি কোথাও লুকিয়েও রাখতে পারতাম! কিন্তু কে জানত, এমন বিপদে পড়ব। আমার তো কোন সন্দেহ নেই 'দেওয়ার চেয়ে সুখ কি?' এই কথা শুনতে হবে আমাকে। কিন্তু এতবড় দুঃখ থেকে কে আমাকে উদ্ধার করবে? উদ্ধার করবে হিদের মার হাত থেকে?

যে খাচ্ছে আর খাওয়াচ্ছে, শুধু তারাই নিবিকার, তৃপ্ত, মুগ্ধ। কেবল স্বস্তি নেই দোকানদারের। দুরন্ত শঙ্কা আমার। আমার শঙ্কিত মুখ দেখেই, সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে দোকানদারের। কে জানে, চোখের ইশারায় পাহারা বসিয়েছে কি-না সে।

দোকানদারকে ঘোষণা করতে হল, 'আমার এ-বেলার তৈরী খাবার সব শেষ হয়েছে। টাকা মিটিয়ে তোমরা দুস্‌রা দোকান দেখ।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, সত্যি তার সবই শেষ।

হিদের মা বলল, 'বাবা, আর খাবে?'

মন খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এখনো তার রেশ যায় নি। কিন্তু মানুষের অতি-মানবিকতায় কিংবা পশুত্বে আমার বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধাও

নেই। গল্পের মত শুনেছি, কোন এক কালে অমুকে অত খেতে পারত। পারত কি-না জানি নে। কিন্তু আজ চোখের সামনে বিরক্তি ও ভয়ে সে দৃশ্য দেখতে হচ্ছে।

জল খেয়ে মুখ মুছল সাধু। একটি উদ্গার তুলে, ক্ষুধাতৃপ্ত মুখখানি তুলে বলল, 'না আর খাব না। আমার পেট ভরেছে।'

তবু ভাল। কিন্তু যা খেয়েছে, তাই যে অনেক। সে অনেকের কী উপায় হবে। মানসচক্ষে দেখতে পেলাম, হিদের মা ওই চোখ দুটি তুলে আমাকে বলছে, কী যে বলছে তা মাথায় আসছে না।

হিদের মা বলল সাধুকে, 'বাবা, আমাকে নিয়ে, আমার কাছে খেয়ে কেউ সুখী নয়। তুমি খুশী হয়ে থাকলে আমাকে আশীর্বাদ কর!' বলে সে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করল লুটিয়ে।

সাধু বলল, 'তোমার প্রাণে আনন্দ হোক।'

বলে সে চলে গেল। হিদের মা উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল দোকান-দারকে, 'কত হয়েছে দাদা তোমার?'

দোকানদার বলল, 'খুচরা হিসাব ধরি নি মায়ীজী। সের হিসাবে তোমার উনিশ টাকা তিন আনা হয়েছে।'

হিদের মা একবার তাকাল আমার মুখের দিকে তারপর কোমর থেকে বার করল একটা ময়লা পুঁটুলি। খুলতে দেখা গেল দোমড়ানো নোট আর খুচরা পয়সা। সবগুলি একটি একটি করে হিসাব করল। আবার আঁচল খুলল। তাতেও কিছু পয়সা ছিল। সে পয়সাগুলি যোগ করে, কয়েক আনা পয়সা ফের বাঁধল আঁচলে। বাদ বাকি সব তুলে দিল দোকানীর হাতে। বলল, 'গুনে দেখে নাও দাদা।'

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হিদের মার গোনার সঙ্গেই দোকানীর গোনা হয়েছিল। সে টাকাগুলি হাতে নিয়ে, মুগ্ধ চোখে যেন দেবীদর্শন করছিল। তাড়াতাড়ি গদির উপর টাকা রেখে সন্ত্রস্ত গলায় বলল, 'হিসাব আমার হয়েছে মায়ীজী, ও আমার ভগবানের দান।'

হিদের মা ফিরে তাকাল আমার দিকে। চোখে তার জল, মুখে হাসি।

তারপর আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল বাইরের জনারণ্যের দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'পাষাণভার নামল আমার বুক থেকে। আনন্দ হোক, আনন্দ হোক প্রাণে। আমার প্রাণের সব নিরানন্দ ধুয়ে মুছে যাক।'

বলতে বলতে কী এক আবেগের তোড়ে ভেসে গেল হিদের মা। আমাকে ডাকলে না, ফিরলে না। কোন এক মহা আনন্দের সব-ভোলানো হাওয়া এসে টেনে নিয়ে গেল তাকে। ডেকে নিয়ে গেল।

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার সব শঙ্কা ভয়, আমার সব অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল সে। হিদের মার জীবনে যা ভক্তি, যা বিশ্বাস, আমার তা নয়। হয়তো একেই বলে আত্মসম্মোহন। কিন্তু তার এই ভক্তি বিশ্বাস দিয়েই সে আমার মনের সঙ্কীর্ণতার স্পর্ধাকে ভেঙে দিয়ে গেল। এর অবাস্তবতা, অলৌকিকতা, সব জেনেও তার সব দেওয়ার এ আনন্দের মর্যাদাকে তো অবহেলা করতে পারি নে। যে এমনি করে দিয়ে যায়, তাকে এক টাকা দিয়ে আমি করুণার আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম। বিদ্রূপ নয়, কথা নয়, নিজের আনন্দ ও বেদনা দিয়ে সে আমার আত্মপ্রসাদকে ধিক্কার দিয়ে গেল। সে আমাকে সাধু খাওয়ানো শেখাল না। আমার নিজের বিশ্বাসের প্রতি হৃদয়ের সব দ্বার অসঙ্কোচে উন্মোচনের শিক্ষা দিয়ে গেল। তাই সে অমনি করে দেওয়ার কথা বলেছিল। তাই কিপটে বুড়ি [illegible] গলায় বলেছিল, 'আমাকে দু-চার আনা পয়সা দেবে বাবা?

ব্যাকুল হলাম, ফিরে তাকালাম। নেই, হারিয়ে গিয়েছে হিদের মা। চোখের সামনে শুধু জনারণ্য। হাসিমুখর কোলাহল।

সকাল থেকে যেন ঝড়ের গতিতে কেটে গেল এতক্ষণ। সবাই প্রাণভরে ডুব দিল সঙ্গমে। টেরও পাই নি, জানিও নে, কী অমৃতের সঞ্চার হয়েছিল আজ সেখানে। সবাই কী নিয়ে এল বুক ভরে, কিসের নেশায় মাতাল হল মানুষ। প্রথম দিন থেকে, পরিচিত সকলের মুখগুলি ভেসে উঠল চোখের সামনে। সকলের সব কথা।

সত্য, আমি ভগবান পেতে ছুটে আসি নি! ডুব দিতে এসেছিলাম লক্ষ হৃদি-সায়রে। এখন, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমার সারা বুক বড় ভারী। সে যে কিসের ভারে এমন পাষাণ হয়েছে জানি নে। এত লক্ষ লক্ষ লোক। আমি ডুব দিলাম, কি ডুব দেওয়ার সময় হয়েছে জানি নে। কিন্তু প্রাণভরে একটা নিশ্বাসও নিতে পারছি নে। কিসে ভরে উঠল মন এমনি করে। আমি কী পেলাম!

দিন শেষ হয়ে আসছে। সারাটি দিন ঘুরেছি পাগলের মত। দেখা হল অনেকের সঙ্গে। এবার সময় আসছে নিজের সঙ্গে দেখা হওয়ার। আজও এই উত্তরপ্রদেশের মাঘের আকাশে মেঘ ছিল। খুব সামান্য। তাতে শেষ রোদের ঝলক লেগেছে। রঙ লেগেছে। শেষ হওয়ার আগে রঙ ছড়ায় বেশী।

উচিত মনে হল, আশ্রমে ফিরে যাওয়া। কিন্তু পেটের জ্বালাটি কেমন থিতিয়ে গিয়েছে। ওদিকে বড় টান বোধ করছি না। ব্রজবালার অভিমান-ক্ষুব্ধ চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছি, উঁকি দেয়ে আছে তাঁবুর আড়াল থেকে। তবুও বিরল নৌকা ও স্নানার্থীহীন যমুনার দিকে পা চলল আপনি আপনি।

চলতে চলতে কিসে আটকে গেল পা। অবাক হলাম। পা কে চেপে ধরেছে। ভিক্ষুক। রাগতভাবে তাকাতে গিয়ে দেখি, একমুখ হাসি। বিকলাঙ্গ বলরাম।

বলতে যাচ্ছিলাম, 'বলরাম যে!' তার আগেই সে পাগলের মত গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল,

'তুমি কে-এ, পাগলপারা হে!
বহুদিনের চেনা বলে মনে হতেছে,
পাগলপারা হে!'

খোলা গলার এ উদাত্ত স্বর আকাশ ছুঁল গিয়ে। চকিতে মনে হল, বুকে ছিল আমার স্তব্ধ জলরাশি। সে অশ্রু কি-না জানি নে। তাতে হাওয়া লাগল, ঢেউ বইল, আর পাগলা মাঝির মত বলরাম সেই জলে চালিয়ে দিল তার পানসি। পাগল তো আমি নই। পাগল যে সে। কৌতূহলী

কিছু নরনারীও এ বিচিত্র দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু থামাই কী করে। বললাম, 'বলরাম শোন।'

বলরাম তবু গেয়ে উঠল,—

'বইসেছিলাম বুক পেতে,
আজ ধরা দিলে হে!
পাগলপারা হে!
য্যাতই মাখো ধূলাবালি,
নেপ য্যাতই কালো কালি,
চইলবে না আর ফাঁকিবাজি
ছাইড়ব না আর হে,
পাগলপারা হে।'

বলরামের আনন্দ দেখে, রুষ্ট হতে পারি নে। তবু, কৌতূহলী নরনারীর লজ্জা যে পারি নে কাটাতে। তার হৃদয়াবেগের ধারে লজ্জার অন্ধকার হয় তো কেটে যায়। আমার যে সে উত্তরণ হয় নি। ডাকলাম, 'বলরাম!'

বলরাম হেসে গেয়ে মাতাল। বোধহয় গানের স্বর এখনো নতুন করে ছুটে আসছে তার গলায়। বলল, 'বলেন।'

বলরাম, 'লোক জমেছে।'

'বেশ, তবে চলেন, কোথায় চইলছিলেন। কিন্তু ঠাকুর! ছেইড়ে দেব না।'

ছি ছি ছি, বলরাম আমাকে বার বার ঠাকুর বলে আমার মানুষিক অস্তিত্বটাকে যেন বেশী করে জানিয়ে দিতে লাগল। বলরাম, 'যমুনার ধারে—'

কথা শেষের আগেই সে বলে উঠল, 'সেই ভাল, সেই ভাল।'

বলে সে আমার আগে আগে, হেঁচড়ে হেঁচড়ে, দু-হাতে ভর দিয়ে চলল। আমাকে সে-ই পথ দেখিয়ে চলল নিয়ে। তার স্বাভাবিক চলার কষ্ট দেখে নিজেরই কষ্ট হয়। কিন্তু তাকে থামানো যাবে না। কেল্লার কোলের যমুনার তীরে এসে সে বসল। হেসে ঘাড় কাত করে বসল, 'বইসতে হবে কিন্তুন।'

শুষ্ক বালুসৈকত। মাথার গামছাখানি খুলে তাড়াতাড়ি পেতে দিল বলরাম। জানি, আমার অনেক আত্মাভিমান আছে, ধুলোবালির বাছবিচার আছে। তা বলে এখানেও গামছা পাতা কেন? বলরাম এত খুশী, আমি একটু বসতে পারি নে? বললাম, 'গামছা থাক!'

বলরাম জিভ কেটে মাটি দেখিয়ে গুনগুন করে উঠল,

'ভুঁয়ে নি সে বইসবেরি ধন?
বইসবে হিয়ের মাঝখানে॥'

বলে আঙুল দিয়ে দেখাল খোলা বুক। বলল, 'ওই গামছা আমার মনে হিদয় কইরে দিলাম, বইসতে হইবে।'

বসলাম। বলরামের কথার বাগানে আমি দীন।

বলরাম বলল, 'এমন কইরে আর একদিনও যমুনার পাড়ে আসি নাই। যদি আইসলাম, তবে একটু গান গাই, অনুমতি দেন।'

বলরাম 'গাও।'

অমনি মিষ্টি গলায় যমুনার দিকে ফিরে গান ধরল সে,

'যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা
পোরবাহিনী।
ও য্যার বিশাল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীল কান্তমণি॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা সেই জলকেলি
কোথা শ্যাম রাসবিহারী বংশীধারী
বামেতে রাই বিনোদিনী॥'

যমুনার রূপ ফিরিয়ে দিল বলরাম। রঙ বদলে দিল। সন্ধ্যাকাশের রক্তরাগে কালিন্দীর এক অংশ আচমকায় লাল হয়ে উঠেছে। আর সারা ঘননীলে ব্যাকুল কালো চোখের ছলছল ঢেউ। শীত, তবু বাতাস বহে ঝিরিঝিরি।

বলরাম বলল, 'কত চোখের জলে নীল হইছ তুমি, সে আমি জানি।'

তাকিয়ে দেখলাম, বলরাম হাসছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। বলল, 'এই তো সেই জল।'

'ভাবি, এখনো কি বাঁশি বাজে ঠাকুর। ছুটে ছুটে আসে রাইঠাকরুন। সুরে তাল নাই। বাঁশি বাজবে, পায়ের মলের তাল বাজবে না?'

বলে তার কী হাসি। হেসে বলল, 'তা হইলে, এই যমুনার পাড়ে বইসেই কই, একবার কি মনে করতেও নেই? লক্ষ লক্ষ বলা পাইছেন, তাই বুঝি আমারে ভুলছেন।'

বললাম 'না, তোমাদের আশ্রমটি তো চিনি না।'

বলল, 'ওই তো, কেল্লার কাছেই। নন্দগোপাল মাধবাচার্য বাবাজীর আশ্রম। আজ কিন্তুন যাইতে হইবে। আমি কি একলা? আরো নোক রইছে বইসে আপনের জন্য। রোজ আমারে জিজ্ঞেস করে, "তোমার সে কোথায়"?'

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলরাম? লক্ষ্মীদাসী?'

সে বলল হেসে, 'শুধু নক্কীদাসী কেন? সে আছে, আরো আছে। নিজের চোখে গিয়া দেখতে হইবে। যাবেন তো?'

বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে আর 'না' বলতে পারলাম না।

প্রাক্-চন্দ্রোদয় মুহূর্তে প্রদোষকালের মত হালকা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে যমুনা কালিন্দী হল। দুর্গের গাঢ় ছায়া দুলতে লাগল ঢেউয়ে ঢেউয়ে। সঙ্গমের কোণ-ভূমিতে অস্থায়ী টাওয়ারটি যেন শহরের ওয়াটার-ট্যাঙ্কের মত দেখাচ্ছে। রাজকীয় অতিথিদের জন্য ওটি তৈরী হয়েছে। সাধারণের আরোহণে চার আনা দর্শনী।

টাওয়ারের পাশ দিয়ে, লোকের ভিড় ঠেলে চললাম বলরামের সঙ্গে সঙ্গে। বলরাম আমার পাশে পাশে। আমার হাঁটুতে ঠেকছে তার মাথা। কি আমার ভাগ্য! জন্মবিকলাঙ্গ এক সঙ্গী আমার। না পাই তার মুখ দেখতে। পাশ ফিরলে না দেখি তাকে। সে চলছে আমার সঙ্গে, মাটি হেঁচড়ে।

আলো জ্বলে উঠেছে এখানে সেখানে। আজ বড় ভিড়। দোকান সম্ভারে পরিপূর্ণ, স্তূপাকার বেলোয়াড়ি চুড়ি নিয়ে দিকে দিকে বসেছে চুড়িওয়ালী ও ওয়ালার দল। আলো পড়ে রঙের বাহার লেগেছে রামধনুর। ঘিরে বসেছে

ঝি-বহুড়িরা। তাদের কলহাসি রঙ ছড়াচ্ছে আরো। এদেশের রেওয়াজ। পালা-পার্বণে, উৎসব আনন্দে, লক্ষপতির বউ থেকে দরিদ্র-গৃহিণী সকলেই পরে রাশি রাশি কাচের চুড়ি। শখ যাদের আরো বেশী তারা কণ্ঠে পরেছে পুঁতির হার। রঙবেরঙের পুঁথির পাহাড় বসেছে। আজমগড়ের কুমোরেরা ছড়িয়ে বসেছে বিবিধ কারুকার্যপূর্ণ মাটির জিনিস। সিগারেট-ফোঁকা বাবুদের মন-ভোলানো ছাইদানি থেকে, আহা মরি মরি, ভাবের গাঁজার কলকেটি পর্যন্ত। ফুলদানি টি-পটেরও অভাব নেই।

পা আর মন ওই দিকে ছুটে যায়। বলরামকে ছেড়ে যেতে পারি নে। এই রাস্তের ভিড়। বলরামকে কেউ মাড়িয়ে দিলেও তার কিছু করার নেই। সঙ্গে যখন রয়েছি, তাকে তো ছেড়ে যেতে পারি নে। কিন্তু আশ্চর্য! হাতে ভর দিয়ে চলেছে, কিন্তু গুনগুনানির কামাই নেই।

বলরাম ডাকল, 'ঠাকুর।'

বললাম, 'বলরাম, ওই নামটি কি বাদ দেওয়া যায় না?'

বলরাম বলল, 'মন ডাকে। আমি কি ডাকি? ওইটে আপনার নাম নয়, পরান ওই বলেই ডাইকল আপনেরে। তাতে তো এই সোমসারে কেউ দুঃখু পাইব না। তবে '

তবে ওই নামেই ডাকুক বলরাম। দুঃখ পাই নে, ভয় পাই। বললাম, 'কী বলছিলে?'

বলরাম বলল, 'বলতেছিলাম, আমার ঠাকুরের মুখখানি অমন শুকু-শুকু ক্যান? এই কয়দিনে মুত্তিখানিও বড় রোগা হইছে। কষ্টে আছেন?'

যার এত কষ্টের জীবনযাত্রা, সে আমাকে জিজ্ঞেস করে কষ্টে আছি কি-না। কিন্তু বলরামের মন ও প্রাণ সম্পর্কে আর সংশয়ের অবকাশ ছিল না। এ সংসারে কতকগুলি চোখ আছে, যাদের কাছে কিছুই ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাদের চোখের এক অদৃশ্য মাইক্রোস্কোপ প্রতিটি বিন্দু দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বলরাম দেখেছে ঠিক। আখড়াবাসী মূল গায়েন সংসারের আসল কথাগুলি দেখছি জানে ঠিক।

বললাম, 'মেলার ব্যাপার। ঘুরে ঘুরে দিন কেটে যায়, তাই হয়তো।'

বলরাম হঠাৎ থেমে বলল, 'একা-একা কি-না, তাই। সঙ্গে কেউ থাইকলে চখে চখে রাইখ্‌তে পারত। ব্যামো হইলে যে বড় বিপদ হইবে ঠাকুর। সাবধানে রইয়েন।'

বলে সে বাঁক ফিরে, দু-পাশে তাঁবু মাঝের সরু পথে পড়ল। দুর্গপ্রাকার সামনেই। কানে এল খোল-করতালের শব্দ। বাংলা নাম-গান চলেছে ভারি উল্লসিত কণ্ঠে।

বলরাম থামল। আমিও থামলাম। একটি তাঁবুর কাছে কে দাঁড়িয়ে ছিল।

অদূরের একটি হ্যাজাক লাইটের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। তাঁবুর পর্দার বাইরে সে মূর্তি মেয়েমানুষের।

বলরাম তাকে কী বলতে গেল। কিন্তু চকিত কটাক্ষের ঝিলিকে সে একবার বলরামকে দেখে ভেতরে ঢুকে গেল।

বলরাম গলা বাড়িয়ে বলল, 'যাইও না, কারে ধইরে নিয়ে আসছি, একবার ছ্যাখ।'

গলা নামিয়ে বলল আমাকে, 'গোসা করছে আমার উপুর। চিনতে পারে নাই আপনারে।' বলেই বলরামের হাসি। হাসতে হাসতেই গাইল—

'মানের বশে যাইও না গো, রাখো মিনতি,
ভাবো আমার কি হইবে গতি।'

বুঝলাম, মূল গায়েনের লক্ষ্মীদাসী। আমঘাটার আখড়ার অধ্যক্ষা। রাগ করেছে খুবই। কিন্তু, মধ্যবয়সী লক্ষ্মীদাসীর চোখেও অমন অগ্নিবর্ষণ হয়? বুঝি প্রাণে আগুন আছে এখনো অনেক। মধ্যমা ঋতু আশ্বিনের ঢলঢল মদালসা গাঙের বিস্তারে চকিত বাতাসের শিহরণ।

জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, এত রাগ কেন। তার আগেই আবার দেখা দিল লক্ষ্মীদাসী। চল্লিশ বছরের বালিকা। লজ্জায় বিস্ময়ে আনন্দে ভরে উঠল তার বালিকার মত চোখ দুটি। কিন্তু হাসতে গিয়ে শীতে ফাটাফাটা ঠোঁট বেচারীর বিস্ফারিত হতে পারে না। তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, 'ঠাকুর! আসেন, আসেন। মনে পড়ছে?'

বলরাম অমনি বলে উঠল, 'মনে কি পড়ে গো। মনে পড়াইতে হয়। ধ্যান কইরে ধইরে নিয়া আসলাম।'

কিন্তু লক্ষ্মীদাসী চেয়ে দেখল না বলরামের দিকে। হাত জোড় করে বলল, 'ভিতরে আসেন, এটুস্ বসতে হইবে, এখনি ছাইড়ব না।'

বলরাম বলল, 'আসেন ঠাকুর।'

ছুটি তাঁবুর মাঝখান দিয়ে এসে উঠলাম একটি উঠোনে। উঠোনের উপরে সতরঞ্চি পাতা। পুবদিকে একটি ছোট পিতলের শিবিকা। মধ্যে রয়েছে ফুটখানেক দীর্ঘ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। সামনে নামাবলীধারী কিছু লোক বসে খোল-করতালসহযোগে ঢুলে ঢুলে ছুলে ছুলে নাম-গানে মত্ত। একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবাবেশে হাত তুলে ছুলছে। বৈদ্যুতিক আলো নেই। একটিমাত্র হ্যাজাক জ্বলছে। তাঁবু ও হোগলার ঘরগুলির কোন কোনটাতে জ্বলছে কেরোসিনের বাতি।

বুঝলাম, চার পাশের তাঁবু আর হোগলার ঘরের ঘেরাওয়ের মধ্যে এই উঠোনটি হল শ্রীনন্দগোপাল মাধবাচার্যের আশ্রম। সম্ভবত, এই তাঁবু ও ঘরগুলি এ আশ্রমেরই শিষ্যদের।

আমাকে দেখে একটু বে-তাল হল আসর। বেশভূষায় মিল নেই। বোধহয় আমার চেহারাতেও বিলক্ষণ গরমিল ছিল আশ্রমের সঙ্গে। নিতান্ত নিরীহ মুখগুলি তুলে বাবাজীরা বড় বড় চোখে কৌতূহলী হয়ে দেখল। এলাহাবাদ স্টেশনে কাউকে কাউকে দেখেছি এদের লক্ষ্মীদাসীর সঙ্গে। তাদের গায়ে মুখে চোখে সর্বদাই গ্রাম্য দরিদ্র বোষ্টমের ছাপ। বুঝলাম, আমার মত মানুষ এমন আড়ম্বরহীন আশ্রমে আসে না, আসে নি এ কদিনে। চোখেই পড়ে না সম্ভবত। আমারও পড়বার কথা নয়। টেনে নিয়ে এল বলরাম।

আসরের কাছ থেকে খানিকটা দূরে একটি হোগলার ঘরের মধ্যে ঢুকতে হল। লক্ষ্মী আসন পেতে দিয়ে বলল, 'বসেন।'

বললাম, 'দেরি হয়ে যাবে যে?'

বলরাম হাসি মুখখানি তুলে বলল, 'দেরিতে যে আসছেন। সাধ মিটবে না ঠাকুর, কিন্তন যতটুকুন মিটে ততটুকুন না মিটাইয়ে ছাড়ি কেমনে?'

বলে লক্ষ্মীর দিকে ফিরে বলল, 'নক্কীঠাকরুন, ঠাকুরের মুখখানি বড় শুকু শুকু মনে হইতেছে। রাধামাধবের পেসাদ একটুস্—'

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'থাক না।'

বলরাম বলল, 'থাকতে নাই। কোন কিছু থেইমে থাকে না। বুকে হাত দিয়া দেখেন, সেও থেইমে নাই। থাক কইয়ে তারে থামাইয়ে রাইখতে পারেন? যেদিন থাকবে সেদিন সবই থাকবে। য্যাতক্ষণ চলে, চইলতে দেন ঠাকুর।'

জানতাম, বলরামের সঙ্গে কথায় পারব না। তার তো শুধু কথা নয়। কথার সঙ্গে ছিল তার কালো মুখের নিরন্তর হাসি। ওই হাসি যেন প্রসন্ন বাতাস, উদার আকাশ। সেদিকে তাকালে মূক-মুগ্ধতায় স্তব্ধ হতে হয়। বলরাম ততক্ষণ চোখ বুজে গুনগুন করে গান ধরেছে।

'চল চল চল রে মন,
কোথায় খোঁজো মনেরি জন।
তুমি যত চল, সেও চলে,
চলে, দিবানিশি সব্বোক্ষণ।'

ফিরে দেখি, লক্ষ্মীদাসী। হাতে দুটি পিতলের ঘটি। কিন্তু সে নিথর বিহ্বল। তার সেই কালো চোখ দুটি মেলে, সব ভুলে তাকিয়ে আছে বলরামের দিকে যেন, গুনগুনানির সুরের মধ্যে ডুবে গিয়েছে, একাত্ম হয়েছে গানে। গানে শুধু নয়, রূপে অন্ধ হয়েছে। আমি একটা মানুষ, তাকে নজরে পড়ল না লক্ষ্মীদাসীর। কী দেখছে সে অমন করে তার মূল গায়েনের দিকে। গুনগুনানি থামিয়ে চোখ তাকাল বলরাম। তার দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল লক্ষ্মীদাসী! একটি উদ্গত নিঃশ্বাস চেপে ঘটি দুটি বসিয়ে দিল আমাদের দুজনের সামনে। দিয়ে পেছন থেকে সামনে এসে ধরে দিল দুটি শালপাতা। দেখলাম, রয়েছে খানিকটা খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, বাঁধাকপির তরকারি, খানিকটা খোয়া। বলরামকেও তাই।

বলরাম বলল, 'আমাকেও দিলে? ঠাকুরের সঙ্গে-ই?'

বড় লাগে নিজেরই কানে। জানি নে, কী দিয়ে বলরামের মন পেয়েছি।

একটি সিগারেট ছাড়া তো-কিছু দিই নি। কিন্তু 'ঠাকুর ঠাকুর' করে সে এবার আমাকে ঠাকুর বলিয়ে ছাড়বে।

লক্ষ্মীদাসী বলল, 'আপনেরা খান ঠাকুর।'

বলে আমাকে লুকিয়ে লক্ষ্মী আড়চোখে দেখল বলরামকে। খেতে খেতে ভাবলাম, না, বলরামকে আমি হিংসে করব সেকথা এ বিশ্বে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যি বলি, ভাবতে পারি নি, বলরামের জীবনের চারপাশে নিরাপত্তার একটি সুরক্ষিত পাঁচিল আছে। তার খাওয়ায় পরায় আহারে বিহারে কোন সযত্ন হাতের স্পর্শ থাকতে পারে, একথা মনে আসে নি তাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম। প্রথম ভেবেছিলাম পথের ভিখারী, তারপরে আখড়ার মূল গায়েন। আজ আমারই এক পংক্তিতে সে আহারে বসেছে। আমার ঢাকা চোখের সামনে বিস্মিত মুক্ত প্রাঙ্গণ কে খুলে দিলে বুঝতে পারলাম না। লক্ষ্মীদাসী, না বলরাম? হৃদয়াবেগ, ভক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় মিলেছিল বলরামের গানে ও কথায়। সে একদিক। আর-এক দিক দেখিয়ে দিল তার লক্ষ্মীদাসী।

হঠাৎ লক্ষ্মীদাসী ডাকল, 'ঠাকুর।'

তাকিয়ে দেখি, চোখে তার জল। অবাক হয়ে বললাম, 'কী বলছ?'

লক্ষ্মী বলল, 'নালিশ আছে, বিচার করতে হইবে আপনেরে।'

বিচার? এত বড় ভয়ানক দায়িত্ব তো আমাকে কেউ কখনো দেয় নি। তাকিয়ে দেখি বলরামের হাসি একথায় বাগ মানছে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমারো মন করতেছিল গো নক্কীদাসী, আসো দুইজনে বিচার চাই এনার কাছে। বেশ, তবে বাদী আগে বলুক, আমি হইলেম পিতিবাদী অর্থাৎ কি-না আসামী।'

বলে বলরাম হেসে উঠল। সারাদিনের পর পেটে আহার পড়ে ঝিমনো মনটাও গা নাড়া দিয়ে উঠল খানিকটা।

লক্ষ্মীদাসী বলল, 'ওই তো দেখেন মানুষটা। আর এই মেলা। মেলা নয়, যেন শহরের সড়ক। সহচ্চ সহচ্চ মানুষ হাতি ঘোড়া, গাড়ির কামাই নাই। কথা নাই বাত্তা নাই, যখন তখন বাইর হইয়ে যায়। কোথায়

গিয়ে বইসে থাকে। এট্টা বিপদ আপদ হইলে আমি কোথায় যাইব, বলেন তো?'

বলে, চোখের জল নিয়ে তাকাল লক্ষ্মীদাসী। এতক্ষণে বুঝলাম, কেন লক্ষ্মীদাসী অভিমান করেছে। সত্যি, বিকলাঙ্গ বলরাম। বাইরের ভিড়ে তো সর্বক্ষণই তার প্রাণ-সংশয়।

বলরাম অমনি হাসিমুখখানি তুলে বলল, 'অনুমতি করেন, এইবার এই নিধম জবাব দেউক।' বলে লক্ষ্মীর দিকে একবার দেখে সে বলল, 'ঠাকুর, জন্মো-লুলা আমি। এখেনে নক্কীদাসী আমারে আনতে চায় নাই। জোর কইরে আসছি। কিন্তুন এখেনে আইসে যে আমি আর থির থাকতে পারি না! আমার শরীলখানি ভাঙা, মন যে রয় না। সে যে মানে না। কে আমারে ডাকল, জানি না। যদি আসলাম, তবে এই আখড়ায় পইড়ে থাকি কেমনে। ঠাকুর আমি যে লুলা, এমন কইরে আর কোনদিন বুঝি নাই। আইজ বার বার দৌড়বার নেগে য্যাখন ছটফট করতেছি, পাখা য্যাখন মেলতে চাইতেছি, ত্যাখন দেখি, এ পাখা উড়তে পারে না। যদি আসলাম, তবে যেটুকু ঠেকতে ঠেকতে পারি—'

লক্ষ্মীদাসী আমার দিকে ফিরেই বলল, 'যদি এট্টা বিপদ আপদ হয়?'

বলরাম বলল, 'অমঙ্গলের চিন্তা করতে নাই। সোমসারে সবই আছে। সেই ভেবে কি বইসে থাকে কেউ?'

লক্ষ্মীদাসী বলল, 'কিন্তুন যদি কিছু হয়, তবে আমার আখড়া যে অন্ধকার হইবে। রাধামাধব তো আর কারুর গানে তুষ্ট নয়?'

রাধামাধবের অনুভূতি সম্পর্কে আমার নিতান্ত মানুষসুলভ মন চৈতন্যহীন। মনে হল, যদি বলরামের বিপদ হয়, তবে এক জায়গায় অন্ধকার নেমে আসবে। তার গান না শুনলে কোন এক হৃদয়ের রাধামাধব চিরদিনের জন্য দরজা বন্ধ করবে।

বলরাম বলল, 'নক্কীদাসী, বাইরে কত নোক। সামনে যমুনে কেমন কলকল কইরে বইতেছে। সেখানে তিনি কান খাড়া কইরে রইছেন। আমি যে আসলজনারে গান শুনাইতে চাই।'

বলে সে হঠাৎ গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল,

'তুমি যেথায় আছ, সেথায় আছি।
আমার মিছা ভাবনা নাই মনে।
তুমি ডাকলে আপনি কপাট খোলে
তোমার বাতাসে তাল দিয়া নাচি।'

আর কথা নেই লক্ষ্মীদাসীর মুখে। দু-চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সে বলরামের দিকে। কোথায় গেল নালিশ, বিচার। এইটুকুনির জন্যই বোধ হয় নালিশ, এইটুকুনি পেলে আর কিছু চাওয়ার নেই।

কিন্তু অবাক মানল মন। এই বিকলাঙ্গ মূল গায়েন যে এমনি করে একটি নারীর হৃদয় জুড়ে রয়েছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করতে মন চায় না। বুঝলাম, এ সংসারে হৃদয়ের রীতি বড় বিপরীত পথে ধায়।

লক্ষ্মীদাসীর ধ্যান ভাঙাল বলরাম। বলল, 'কই, তুমি যে ঠাকুরকে কী বলবা বলতেছিলে আমারে। ধইরে নিয়া আসলাম, বল। একবার পরথ কইরে লেও, কারে ঠাকুর কইছি।'

বলে আমাকে বলল, 'এই গানখানি সেই আতাউল বাউলের ঠাকুর।'

লক্ষ্মীদাসী বলল, 'ঠাকুর, আপনারে সেই কইলকেতার রবি বাউলের গান একখানি শুনাইতে হইবে।'

মনটা চমকে উঠল। আবার সেই কথা! বলরামের গান শুনে এক নিঃশব্দ সুরতরঙ্গ আপনি দোলা খাচ্ছিল আমার গলায়, আমার বুকে, আমার রক্তধারায়। জানি নে কে আতাউল, কিন্তু সে কথা ও সুরের রাজা, সন্দেহ নেই। তা বলে রবীন্দ্রনাথকে সেই দলে নিয়ে আসতে আমার সঙ্কীর্ণ মন বার বার বাধা পেল। বাধা পেল, তবু শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু-অঙ্কিত সেই রবি বাউলের একতারা-বাজানো মূর্তিখানা বার বার ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

বললাম, 'তাঁর অনেক গান। কোন গান যে বাউল তা তো ঠিক জানি নে। তা ছাড়া আমি তো গান গাইতে পারি নে।'

বলরাম বলল, 'তা, বললে শুনব না ঠাকুর। 'ছলছল চখে, ছলো হাসি

হাসো, তোমায় চিনি গো, চিনি।’ ওনার একখান গান শোনান! যিনি কন ‘কবে তুমি আইসবে বইলে রইব না বইসে’, তানার গান না শুনলে আমার আমঘাটায় ফিরা যাওয়া বেরথা ঠাকুর।’

ধন্য কথা বলরামের, ধন্য তার স্মৃতিশক্তি। একবার বলেছিলাম, ঠিক মনে রেখেছে। তবু, এই বলরাম যেন সুরের নদী। আজ আমি তার সেই সুরদরিয়ায় ডুব দিয়েছি। মুখে যা-ই বলি, আমার সমস্ত লজ্জা ও অক্ষমতার সঙ্কোচ ধুয়ে দিয়েছে। সুর ও কথা আপনি ভেসে এল মনে। বাউল গান সব জানি নে। তবু ধরে দিলাম, আমার জীবন, সমাজ ও পরিবেশ ভুলে এক নূতন সংসারে মেতে উঠলাম—

‘আমার মন বলে চাই চাই গো—
যারে নাহি পাই গো।
সকল পাওয়ার মাঝে
আমার মনে বেদন বাজে—
নাই নাই নাই গো॥

* * *

ভোরের তারায় জাগবে বলে
বলে সে—যাই যাই যাই গো॥’

বলরাম ঝাঁপ দিল প্রায় পায়ের কাছে, ‘তবে, তবে ঠাকুর! ফাঁকি দিয়ে পলাইতে চাইছিলেন?’

লক্ষ্মীদাসীর চোখে জল। বলল, ‘আহা সন্ধ্যাতারা যায় যে চাইলে, ভোরের তারায় জাইগবে বইলে। কী কথা!’

আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। উচ্চারণে গ্রাম্য দোষ। তবু রবীন্দ্রনাথের গান যে এই গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষগুলির মনকে এমনি করে ভাসিয়ে দেবে, তা কোনদিন ভাবি নি। মনে করেছিলাম সে শুধু আমাদের, আমাদেরই। আমাদের এই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের চাপা-গলা দুর্বল স্বরের প্যান-প্যানানি-ওয়ালাদের। ফিরে দেখি, হোগলা ঘরের দরজার কাছে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আরও কয়েকজন। একজন বলল, ‘আর-একখানা কিরপা করেন।’

ছি ছি ছি। ছিঃ, শেষটায় আমাকে গানের আসরে অনুরোধ!

কিন্তু আর তো বসতে পারি নে। বললাম, 'আর না বলরাম, এবার উঠব। অন্য দিন হবে।'

বলরাম বলল, 'আচ্ছা ঠাকুর, এখেনে আর ধরে রাখব না।' বলে লক্ষ্মীর দিকে ফিরে বলল, 'ভাব মূল গায়েন করবা কি-না?' বলে হাসতে হাসতে আমার সঙ্গে এল।

বলরাম, 'তুমি আর এসো না, আমি নিজেই যাচ্ছি।'

বলরাম বলল, 'নিজে তো যাইতে পারবেন না। আমারে নিয়া যাইতে হইবে।'

বললাম, 'কোথায় হে?'

সেকথার জবাব না দিয়ে লক্ষ্মীদাসীর দিকে চেয়ে হাসল। হাসল লক্ষ্মীদাসীও। তারপর বলল, 'চলেন, নিয়ে যাই। আমারে রোজ জিজ্ঞেস করে, সে কোথায়? জবাব দিতে পারি না। আজ জবাব দিয়া আসি।'

লক্ষ্মী পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ঠাকুর, রোজ একবার দেখা দিতে হবে যদ্দিন আছেন।'

বললাম, 'চেষ্টা করব।'

তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, জ্যোৎস্নালোকে ভরে গিয়েছে সারাটি মেলা। আকাশ জুড়ে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ।

বললাম, 'বলরাম, এখন আর কোন আখড়ায় যাব না।'

বলরাম বলল, 'আখড়ায় নয় ঠাকুর। কিন্তন্ একবার না গেলে যে চইলবে না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেখানে কে আছে?'

'যাইয়া দেখবেন।'

পেছন থেকে ছুটে এল লক্ষ্মীদাসী। তাড়াতাড়ি একখানি কম্বল মুড়ে দিল বলরামের সর্বাঙ্গে। দিয়ে আবার একবার আমাকে মিনতি করে চলে গেল।

যেতে হল। বুঝলাম, না গেলে বলরামের পরাজয়। জানি নে, আবার

সে কোথায় কী বাঁধিয়ে রেখেছে, কী গল্প করে রেখেছে কোথায়। সে কেল্লার পথের প্রাচীরের কোলের দিকে এগিয়ে চলল। সারি সারি তাঁবু। জ্যোৎস্নায় দেখলাম, নানান রকম নিশান উড়ছে তাঁবুগুলির মাথায়। এদিকটায় দোকানপাট কম, সেইজন্য ভিড়ও কম।

একটি গাছতলার তাঁবুর কাছে এসে থামল বলরাম। তাঁবুর সামনে, খানিকটা জায়গা জুড়ে, মাথায় সামিয়ানার মত ঢাকনা দেওয়া। একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। সেই আলোয় দেখলাম, একটি জ্বলন্ত উনুনে রয়েছে তাওয়া। একজন রুটি ভাজছে, বেলে বেলে দিচ্ছে আর-একজন।

আমাকে আর বলরামকে দেখে তারা দুজনেই ফিরে তাকাল। তাকাতেই চমকে উঠলাম। চমকে ওঠবার মুহূর্তেই একটি চাপা খিলখিল হাসি হঠাৎ বেজে উঠে কুহক বিস্তার করল। তাওয়াটা ঠক্ করে নেমে এল উনুন থেকে। আগুনের আঁচে দেখলাম, হাসিতপ্ত লাল মুখ শ্যামার। ছি-ছি-ছি, এ কোথায় নিয়ে এল বলরাম। বলতে যাচ্ছিলাম তাকে সেই কথা। তার আগেই বলরাম হাত কপালে ঠেকিয়ে শ্যামার দিকে বলল, 'রোজ রোজ বলেন, লুলাসাধু তোমার সেই বাবু কোথায়? একদিন ডেইকে নিয়া আস। আজ ধইরে নিয়া আসলাম।'

মনে করলাম, তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি। জীবনে এত বড় লজ্জার সামনে আর কোন দিন পড়ি নি। কে জানত, বলরাম আমাকে এইখানে ধরে নিয়ে আসবে। লজ্জার সঙ্গে রাগ হল। বলরামদের হৃদয়াবেগ লোকলজ্জার ধার ধারে না। সংশয়, সন্দেহ ও রুষ্ট চোখের বাধা মানে না। কিন্তু আমাকেও কি সে তাই ভাবল?

নোকারনী পতিয়া বেলে দিচ্ছে রুটি, ভাজছে শ্যামা, ছোট্ট একটি চারপায়ার উপর বসে। তার চটুল চোখে বিস্ময় ও হঠাৎ-হাসির ঝলকানি। সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার হেসে উঠল। সে হাসি শুনেছিলাম পথে পথে, এক বন্দী বিহঙ্গের পাখা ঝাপটা খাওয়ার শব্দ শুনেছিলাম তখন লৌহপিঞ্জরে। আর এখন, দুর্গকোলে, এই যমুনাতীরের জ্যোৎস্নাভরা হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি। এ-রাত্রি যেন বদ্ধজলার নিস্তরঙ্গ জল। তাতে যেন হাসিতে আচমকা

বায়ু শিহরণের কম্পন লাগল। এ যেন আরো রুদ্ধশ্বাস। ব্যথা ও যন্ত্রণা এক নতুন হাসির কুহকজাল ঘিরে আনন্দময়ের রূপে ফুটে উঠতে চাইছে।

আরো শুনলাম। শুনলাম, বুঝি এক তীব্র বিদ্রূপের ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে ওই হাসিতে। যেন আমাকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলছে, এসেছ তো? এসেছ?

মনে পড়ল, নিজের অভিশপ্ত জীবন ও হৃদয়ের তিক্ততায় সেদিন শ্যামা হঠাৎ বিচিত্র রূপ ধরে আমার মাথা হেঁট করে দিতে চেয়েছিল। আমি তখনো হেসেছিলাম। আজ এই হাসির সামনে যদি না হাসতে পারি, তবে এই ভীরু ও দুর্বল চিত্ত নিয়ে লজ্জায় মরে যাব।

ফিরে তাকালাম শ্যামার দিকে। সাজা-গোজার অন্ত নেই। সিল্‌ক্ শাড়ি পরে বসেছে রুটি সেঁকতে। উলেন্ স্কার্ফ এলিয়ে পড়েছে কাঁধের থেকে মাটিতে। তাকিয়ে দেখলাম, বাঁকা চোখে তীব্র অনুসন্ধিৎসা। ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু কেন যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে নি, বরং হঠাৎ লজ্জায় তার খরহাসির তীব্রতাকে একটু করুণ করে তুলেছে। কাঁচা সোনার অলঙ্কার ঝিকমিক করছে তার হাতে গলায়। তার অপলক চোখের দৃষ্টিটা এমন করে বিঁধে রইল আমার সারা মুখ জুড়ে যে, মুখ ফেরাতেও পারি নে।

শ্যামা তাড়াতাড়ি নিজের ছোট্ট চার-পায়াটি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বস।'

পতিয়া যেভাবে রামনাম নিল, তাকে বাংলা করলে বোধহয় হবে 'মরণ'। বলরামও হাসল, 'বসেন ঠাকুর।'

বলরামের গলায় ব্যাকুলতা। ফিরে তাকিয়ে দেখি, তার মুখে পাগলা হাসির বান ডেকেছে। কিন্তু বসব? সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছি নে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আর সব কোথায়?'

শ্যামার হৃদয় বাঁকা। কথার আগেই ঘাড় বেঁকে যায়। যেন তাগ কষছে। বলল, 'আর কারা?'

বললাম, 'তোমার সতীন, স্বামী, তারা সব কোথায়?'

ভ্রূ তুলে বলল শ্যামা, 'তারা না থাকলে বুঝি বসা যায় না?'

এবার কথার স্বরও বাঁকা হয়ে উঠল শ্যামার। চট করে কোন জবাব

যোগাল না মুখে। তার মুখের দিকে চেয়ে চমকে আড়ষ্ট হয়ে উঠল মন। হাসিটি কেন যাই-যাই করে তার মুখ থেকে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বুকের ভেতরটি পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে।

বললাম, 'না, বসা যাবে না কেন? এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।'

শ্যামা বলল, 'তবে নারাজ কেন?'

নারাজ নই। নারাজ আমার মনের সামাজিকতা, ভব্যতা, লোকলজ্জা। কিন্তু, বুঝলাম, ওই বোধগুলি আপাতত বিবেকের আড়াল করে বসতে হবে। মনে করেছিলাম, পথে বেরিয়েছি। লজ্জা ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে নয়। ওসব বালাই রাখব না মনে। কিন্তু যে আছে আমার রক্তধারায়, তাকে ছাড়ব বললে ছাড়ানো যায় না। তবু ভাবলাম, শ্যামার কথায় বসতে গিয়ে যদি কোন বেদনাদায়ক অপমান নিয়ে ফিরতে হয়, আমার চলার পথের ধূলায় তা ফেলে রেখে যাব। যদি না পারি, তবু জানি জীবন-মনের পলিতে একদিন তা ঢাকা পড়ে যাবে।

বসলাম। তবু বিস্ময়ের সঙ্গে একটা অজানা বিচিত্র অনুভূতি ঘিরে রইল মনে। অজানা, কেন-না, শ্যামার হৃদয়ের গতি অজানা। সে খিলখিল করে হাসলে, ঠাট্টা করলে, তাকে বুঝতে পারি। কিন্তু ডেকে বসতে বলে যদি এমনি করে মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকে, যদি তার মনের গোপন লীলা খেলা করতে থাকে মুখের ছায়ায়, তবে বসে থাকি কেমন করে।

পতিয়া দেহাতি ভাষায়, চাপা স্বরে বিদ্রূপ করে বলে উঠল, 'তাহলে রাতে আর রুটি বানানো হবে না তো? আজ এই পর্যন্তই?'

শ্যামা অমনি তার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দিল। টানাটা একটু বেশীই হয়েছে। টাল সামলে পতিয়া বলল, 'উঃ বাবাগো! নিজের চুল ধরে টানো। আমার কেন?'

বলে চকিতে একবার আমাকে দেখে, বলরামের দিকে চেয়ে হাসল। বুঝলাম, শুধু নোকারনী নয়, পতিয়া নোকারনীর অন্তরালে খুনসুটি করাব সইও বটে। কিন্তু পতিয়ার খোঁচানিতে কাজ হল। আবার উনুনের ধারে বসল শ্যামা।

আর বাধা মানল না বলরামের গলা। সে আপনমনে চাপা স্বরে গুনগুন করে উঠল—

'কত কথা ছিল মনে
আজ মনে বাহির হইল না,
সখি, একি দায়, সময় যায়,
বুক ফাটিয়ে মুখ খুইল্ল না ॥'

ওরা না বুঝুক বলরামের গানের কথা। নিজে তো বুঝি। বুঝে লজ্জায় ও ত্রাসে চমকে উঠলাম। অবস্থাটা কাটাবার জন্য তাড়াতাড়ি কথা বলবার জন্য মুখ তুললাম। শ্যামাও মুখ তুলল। বোধহয় কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিল, থেমে রইল।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শ্যামা বলল, 'কী বলছিলে?'

বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কী কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তা নিজেই জানি না। বললাম, 'কিছু নয়। তুমি কী বলছিলে?'

শ্যামা বলল, 'বলছিলাম, কোথায় আছ? কোন্ আশ্রমে?'

জবাব দিলাম।

পতিত বিদ্রূপভরে বলল শ্যামাকে, 'মেহেরবানি করে একটু সরে বস, এবার আমি বানাচ্ছি রুটি।'

শ্যামা সে বিদ্রূপ গায়ে মাখল না। সরে বসল সত্যি সত্যি। তারপর কেমন আছি, কোথায় ঘুরলাম, কোথায় খাই, সব জিজ্ঞেস করল। জিজ্ঞেস করল, জবাব নিল, আর টেড়ে টেড়ে চেয়ে হাসল নিঃশব্দে। বলল, 'তোমার লুলা সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হয় কি-না। এমন আজীব আদমি তুমি!'

এটা বোধহয় তার ডাকাডাকির কৈফিয়ত। কিন্তু আজীব কেন? বললাম, 'কেন?'

সে বলল, 'কী জানি। রেলগাড়িতে সেদিন তোমাকে খুব তখলিফ দিয়েছিলাম, না?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেইজন্যই ডেকেছ বুঝি?'

সে বলল, 'হুট।'

এমন করে তাকিয়ে ছিল পতিয়া আর বলরাম, এমন নীরবে শুনছিল, যে আর বসে থাকতে পারলাম না। একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'উঠি।'

শ্যামা বলল, 'কাল আসবে তো ?'

কেন, জিজ্ঞেস করাই উচিত ছিল। পারলাম না। কিন্তু আসা-আসির কথা আদায়ের বাঁধাবাঁধি কেন।

বললাম, 'যদি পারি।'

বলে মাথার ছাউনির বাইরে এলাম। বলরাম এল। গলায় তার গুন-গুনানি থামে নি। হ্যারিকেনের আলো কোথায় হারিয়ে গেল। মাঘ মাসে পৌষ-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল গায়ে।

শ্যামার চাপা আহ্বান শোনা গেল, 'শোন।'

ফিরে তাকালাম। চাঁপা বর্ণের খয়েরি সিল্‌ক শাড়িতে নীল জ্যোৎস্নার ঝরনা গড়িয়ে পড়ল। আর ঝিকমিকিয়ে উঠল রুপালী উলেন স্কার্ফ। কাছে এসে বলল, 'সেদিন রাগ করেছিলে ?'

সেদিন মানে একদিনই। বিদায়ের মুহূর্তে চকিতে বদলে-যাওয়া মুখে তার সেই তিক্ত কথা। না জেনে সেদিন তার বড় তিক্ত বেদনার বন্ধ দরজায় কড়া নেড়ে দিয়েছিলাম। রাগ করব কেন? দোষ তো আমারই।

বললাম, 'না, রাগ করি নি তো ?'

'সত্যি ? সচ বলছ ?' সংশয়াকুল হাসি তার মুখে।

সংশয় কেন? কেন রাগ করি নি, অত সব কথা বলতে পারব না বুঝিয়ে। রাগ যে করি নি, করতে পারি নি, সেকথা তো জানি নিজের মনে।

বললাম, 'মিছে বলব কেন ? সত্যি বলছি।'

এবার হাসির সঙ্গে চোখে তার কৃতজ্ঞতা দেখা দিল। বলল, 'কাল এস কিন্তু। এই সময়ে।'

চোখাচোখি হল আবার। হাসির সঙ্গে এই বিষণ্ণ জ্যোৎস্নার মত একটা আবেশের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তার চোখে। কপালের টিপটি কাঁপছে তার তৃতীয় নয়নের মত। অনুরোধে মিনতির স্বর।

জবাব না দিয়ে চলে এলাম। ভুলি নি, সঙ্গে রয়েছে বলরাম। তবু কথা এল না। মন চমকাল বারে বারে। মানুষের মন! সে যেন পথের ধারে দোলানো আয়না। লক্ষ চমক তার বুকে।

শ্যামা স্বৈরিণী নয়। এক কুলীন ভুঁইহার ঘরের অশীতিপর বৃদ্ধের যুবতী বউ। হৃদয়ে তার বহু বজ্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রয়েছে চাপা। উৎসবের রাত্রে তা খোলা আকাশের বুকে বহু রঙের আলোর ঝাড়ে হাউয়ের মত জ্বলে উঠতে চায়। চোখ ও মন ভরে দিতে চায়। উৎসবের বাসর রচনা করতে চায় সর্বত্র, জীবনের বিড়ম্বনার অন্ধকারে। তাই এ সমাজের সব পরিবেশেই সে ভিন্ন ও বিচিত্র।

কিন্তু আমার পথে নেমে আসে যদি অন্ধকার! ভেজা পথে যদি বারে বারে আটকায় পা?

বলরাম বলল, 'ঠাকুর, আমার উপর রাগ করছেন?'

বললাম, 'না।'

'তবে বলি এট্টা কথা?'

'বল।'

'বলব, তার আগে এটুস্ গরম চা পেইলে হইত।'

নাঃ, বলরামই দেখছি ঠিক আছে। মুখ ফেরাতেই দেখলাম, চাঁদের আলোয় একমুখ হাসি তার মুখে। ভিড় এখনো খুব। গাড়ি ঘোড়া ও মানুষের অবিরাম যাওয়া-আসা। জ্যোৎস্না পেয়ে সবাই যেন নতুন করে মেতে উঠেছে।

দোকানের অভাব নেই। চা নিয়ে বলরাম বলল, 'ঠাকুর, গুরু ধরেছেন?'

এ আবার কী কথা! বললাম, 'গুরু? কেন হে?'

বলরাম বলল, 'গুরু না হইলে কি চলে? জন্ম থেইকে মরণ পর্যন্ত,

গুরু আসে যায়, সকলে তো চিনা দেয় না।' বলে গুনগুন করে উঠল—

'গুরু বইলে ক্যারে পরনাম করবি মন।
তোর ভিতরে গুরু, বাইরে গুরু,
গুরু অগণন।'

গেয়ে বলল, তার মধ্যে এক গুরু,

'সখি গো! এবার গুরু বলে রাখি মাথা
তোমার চরণে,
পেমরীতি বুঝাইলে তুমি অবোধ
জীবনে।'

বলল, 'বুঝেছেন? এই গুরু ঠিক না থাকলে, সব বেঠিক।' বলে হেসে উঠল।

একটু বুঝি অন্যমনস্ক রইলাম। পরে বললাম, 'তুমি গুরু করেছ তো বলরাম?'

বলরাম, 'করছি। কিন্তন ঠাকুর। গুরুর সেবা কইরে আমার মনটা ভরে না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তোমার সেই গুরু?'

বলরাম, 'যে নিজে কেন্দে আমারে কান্দায়।' বলে সে হঠাৎ চোখ মুছল। চোখে তার জল! বলল, 'ঠাকুর, কাইলকে আসবেন কিন্তন্। নক্কীদাসী আপনের জন্যে বইসে থাকবে।'

চলে এলাম। শেষ, বলরামের চোখের জলে আজ আমার ডুব দেওয়া সাঙ্গ হল। জলের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। অনেক, অনেক মুখ মনে পড়ছে। এই লক্ষ মানুষের মুখের মিছিলে আজ তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কত গুরু। পথে প্রান্তরে, কুটিরে বস্তিতে, ইমারতে ঘরে, অগণিত গুরুকে আমার নমস্কার জানাই। বার বার নমস্কার জানাই।

একেবারে যাবার ইচ্ছা ছিল না বলতে পারি নে। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যা-

বেলায় যেতে পারলাম না। অনেক ঘোরা বাকি ছিল। এখন ঘুরে না নিলে আর হবে না। তবু ভেবেছিলাম সন্ধ্যাবেলা ঘুরে ফিরে তারপর যাব। সন্ধ্যাবেলায় নৌকায় করে ফিরে আসছিলাম যমুনার ওপর থেকে। হঠাৎ এই মাঘের সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর মত চকিতে মেঘে ছেয়ে ফেলল আকাশ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ঝলকে ঝলকিত যমুনা। ঢেউ উঠল তার বুকে। নৌকা দুলে উঠল। বাতাস এল, ঘোর হয়ে এল অন্ধকার। ঝুসির পাড়ে নৌকা ঠেকবার আগেই বৃষ্টি নেমে এল, ঝোড়ো ঝাপটায়। ইচ্ছে করল গুনগুনিয়ে উঠি—

'উন্মাদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ,
দমকত বিদ্যুৎ পথতরু লুণ্ঠিত
থরহর কম্পিত দেহ।'

পাড়ে যখন উঠলাম, তখন সর্বাঙ্গ সিক্ত। একে উত্তরপ্রদেশের মাঘের শীত। তার উপরে জল। অসহ্য শীতে দাঁতে দাঁত, হাঁটুতে হাঁটু ঠেকে গেল। চারিদিকে সবাই ছুটছে। মানুষ ও জানোয়ার সমান তালে ছুটছে আশ্রমের সন্ধানে। দোকানপাট ঝাঁপ ফেলছে তাড়াতাড়ি। কোনরকমে আশ্রমে এসে উঠলাম।

সারারাত্রি প্রায় জল ঝরল। সকালবেলা শোনা গেল, কে একজন বৃদ্ধ সাধু শীতে বৃষ্টিতে বাইরে থেকে মারা গিয়েছে। হিমপ্রবাহের প্রথম্ শিকার। তারপরেই দারুণ অভিশাপের মত বালুচরে নেমে এল ভয়ংকর হিমপ্রবাহ। সারা উত্তরপ্রদেশে জুড়েই এক অদৃশ্য ভল্লুক তার থাবা বসাল। ভেঙে যেতে লাগল মেলা।

খোলা আকাশের বুকে যে সব সাধুরা আস্তানা নিয়েছিল, তারা লোটা কম্বল নিয়ে ছুটল সব শহরের দিকে। ঝুসির উঁচু জমির কোলে গুহা কেটে আশ্রয় নিয়েছিল যারা, তারা পালাতে লাগল। যাদের ঘর, তাঁবু ধসে ভেঙে পড়েছে, তারা বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে ঘরে অভিযান করল।

চারদিকে শুধু পালাই পালাই রব। কোটরে কোটরে কেবল গোঙানি

ও যন্ত্রণার ফোঁপানি। ভগবানের কাছে নিবেদন, আবেদন। শীতের তাণ্ডব চারদিকে ছত্রাকার করে দিল। এখন শুধু—

'আগুন আমার ভাই,
আমি তাহারি গান গাই।'

আগুন, আগুন চাই। মানুষ বেরোয় না। শুধু উটগুলি কাঁপতে কাঁপতে আসে কাঠের বোঝা নিয়ে। । এলাহাবাদের বাউণ্ডেলে মেয়েপুরুষেরা কেউ বেকার রইল না। সকলেই বনে বাদাড়ে ঘুরে কাঠ এনে বিক্রি শুরু করল। আর নিয়ে আসতে না আসতে বিক্রি হয়ে যায়। একবেলা খাওয়া না জুটুক, আগুন না হলে চলবে না।

আগুন নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি। অর্থবান আশ্রমগুলি ভালো আছে। তাদের কাঠ, আগুন ও ভাল তাঁবুর অভাব নেই। সেখানে নাগারা উলঙ্গ হয়েই বেড়াচ্ছে নির্বিকারভাবে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রাম থেকে নিয়ে আসছে কাঠ। এক টুকরো কাঠের জন্য তীর্থক্ষেত্রে কোলাহল ঝগড়ার অন্ত নেই।

আমাদের আশ্রমের কাছেই গোলমাল। বেরুতে পারি নে তিন দিন ধরে। ইচ্ছে করলে বেরুনো যেত। কিন্তু এই শীতে কোথায় যাব। তার মধ্যে ভেজা ওভারকোটটি কয়েক মাসের মধ্যে শুকোবে কিনা সন্দেহ। তার ওজন হয়েছে কয়েক মণ। গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসে দেখি, একজন .সাধুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দুজন লোক। সাধুটির হাতে কয়েক টুকরো কাঠ। কী ব্যাপার? না, সাধুটি নাকি কাঠ চুরি করেছে ওই লোক দুটির দোকান থেকে। কিন্তু সাধু কিছুতেই যাবে না। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব অভিশাপবাক্য বর্ষিত হচ্ছে তার গলা থেকে। কিছুতেই যখন যাবে না, তখন লোক দুটি আক্রমণ করল তাকে। সে পিঠ পেতে নিল সেই পীড়ন। তারপর বলল, 'বেশ করেছ, মগর লকরী দেব না।'

দিল না। লকরী না, প্রাণের টুকরো কটি নিয়ে সে ফিরে গেল হাসতে হাসতে।

একদিন শহরে গেলাম। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম দেখলাম। কৌতূহল মিটল আনন্দভবন দেখে। একটু পোস্ট অফিসে যাওয়ার দরকার ছিল। সেখানে

গিয়ে দেখা এক বন্ধুর সঙ্গে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বন্ধু। তাঁকে আর এ কাহিনীতে টানব না। কিন্তু কদিন ধরে শুধু শহরেই যাওয়া আসা করলাম। একদিন নিমন্ত্রণ পেলাম, কেল্লার অভ্যন্তরভাগে সবকিছু দেখে নেওয়ার। সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

গোলাপীবর্ণের আকবরের দুর্গাভ্যন্তরের সৌধটি, পাঁচিলের বেড়ার মধ্যে নির্জনে দাঁড়িয়ে আছে একলা। পাঁচিলের দরজা সারাদিন বন্ধই থাকে। কারণ ওখানে বারুদের স্তূপ নাকি ঠাসা আছে। সেখানে সাধারণ কর্মচারীদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। মানুষের সঙ্গে যেন এক অতীত সৌধের অদৃশ্য মানুষেরা অবাক চোখ মেলে রইল অলিন্দে অলিন্দে, গবাক্ষে গবাক্ষে। গবাক্ষে প্রবেশ-মুখে কোন দরজা নেই। ছিলও না কোনদিন। মখমলের ভারী পর্দা ঝুলত। সেই পর্দার ফাঁক দিয়ে ঢুকত খোলা সঙ্গমের হাওয়া। বেলোয়াড়ি কাচের ঝাড় বাজত ঠিনিঠিনি করে। এখন খোলা গবাক্ষ দরজা দিয়ে হাওয়া ঢুকে পাক খেয়ে ভিতরেই হারিয়ে যায়। আকবরের দুর্গ, দরবার বসত একদিন এখানে। এখন পুরনো ইমারতের গন্ধে বাতাস ভারী।

বেরিয়ে এলাম। এই সৌধের পূর্বে দ্বিতল অট্টালিকার পেছনে জঙ্গল ও পুরনো প্রাচীর। প্রাচীরের নীচেই গঙ্গা। দেখলাম, এক জায়গায় একটি বিশাল বট। আসলের চেয়ে সুদ বেশী। বটের ঝুরি নেমে তৈরী হয়েছে আরও কতকগুলি বিরাট গুঁড়ি। বটের গভীর ঝাড়ে চারিদিক হালকা অন্ধকার। তলায় গোবর দিয়ে সযত্নে লেপা মোছা রয়েছে। লেখা আছে, অক্ষয়বট।

এই-ই প্রাচীন ও প্রকৃত অক্ষয়বট। কেল্লার অন্য অংশে পাতালপুরীতে অনেক দেবদেবীর সঙ্গেও রয়েছে একটি শাখাপত্রহীন বটের মোটা ডাল। পাণ্ডা বলল, ওটিই আসল অক্ষয়বট। ইতিহাস তা বলে না। এই কৃত্রিম শাখাটি নিয়ে এক সময়ে কাগজে লেখালেখিও হয়েছিল। ওটি আসল অক্ষয়বট নয়, পাণ্ডাদের পয়সা রোজগারের সিদ্ধিবট হবে হয়তো। শ্রীশিবনাথ কাটজু এম. এল. এ. গবেষণা করে জানিয়েছেন, নিরালার এই ঝুরি-নামা বটটি আসল অক্ষয়বট। এর উপরে দাঁড়ালে দেখা যায় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। আদিগন্ত মেলা ও তাঁবুর সমুদ্র।

একদিন, এই গাছ থেকেই সহস্র সহস্র হিন্দু ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গমে প্রাণ দিয়েছেন। তুলসীদাসের শ্রীরামচরিত মানসে আছে—

'সঙ্গম সিংহাসনু সুধি সোহা।
ছত্র অক্ষয়বট মুনিমন মোহা॥
পূজহিঁ মাধব পদ জলজাতা।
পরসি অক্ষয়বট হরক্ষহিঁ গাতা॥'

হিউ-এন্-সাঙ, অলবেরুনী, আকবরের আমলের ইতিহাস লেখক আবতুল কাদের বাদায়ুনী সকলেই লিখে ও বলে গিয়েছেন।

আর ওই দূরের চর, সঙ্গমের তীরভূমি। কোথায় কোন্ স্থানটিতে মাথায় রাজমুকুট নিয়ে এসে বসতেন সম্রাট হর্ষবর্ধন। কোথায় বসত তাঁর পঞ্চবার্ষিকী মহাসভা, যেখানে যুদ্ধের উপকরণ ছাড়া সবই বিলিয়ে দেওয়া হত দানপত্র খুলে। কিন্তু আশ্চর্য! কুম্ভমেলার ইতিহাস কোথাও নেই। কেবল লক্ষ লক্ষ নরনারী যুগযুগান্ত থেকে পাগলের মত ছুটে এসেছে এখানে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে সঙ্গমে। কেউ বলেন, শঙ্করাচার্য এ মেলার প্রতিষ্ঠাতা। কতখানি সত্য, জানি নে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, শঙ্করাচার্য তাঁর প্রচারমঠ করেছিলেন চার জায়গায়। শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্ধন ও বদরিকাশ্রম অঞ্চলে যোশীমঠ। প্রয়াগের উল্লেখ তো দেখি নে।

ইতিহাসই যখন এল, তখন শঙ্করাচার্যের কথা আর-একটু বলি। সে ইতিহাস একটু রাজনীতি-ঘেঁষা। এগার শো বছর আগে আরবসাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তখন ইসলাম ধর্মপ্রচারকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভারতের দক্ষিণ সৈকতে। ধর্মপ্রচারের নামে, ওটা রাজ্যদখলের ফিকির বলা যায়। আর হিন্দু নিম্নবর্ণের মানুষেরা তখন বর্ণহিন্দুদের দ্বারা এমন ভয়াবহভাবে নির্যাতিত যে, তারা দলে দলে মুসলমান হতে আরম্ভ করল। মন্দিরে প্রবেশাধিকার তো দূরের কথা, ভগবানকে ডাকবারই অধিকার নেই। ইসলামধর্ম উদার মূর্তি ধরে দিল দেখা। রাজায় প্রজায় একসঙ্গে বসে প্রার্থনা করলেও ভগবান অসন্তুষ্ট নন। তখন শঙ্করাচার্য ব্যাপার দেখে ধর্মকে ভেঙে গড়লেন। ইসলাম এক? হিন্দুর ভগবানও এক। উৎপত্তি হল শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ। নির্গুণ

উপাসনা। এ ধর্মান্দোলনে তখন প্রগতিশীলতার গন্ধ ছিল। আজকে অনেকখানি মূল্যহীন। তবু আজকের ভারতকে অস্পৃশ্যতাবিরোধী অভিযান করতে হয়।

এই আমলেও হয়তো সহস্র সহস্র মানুষ এসেছে কুম্ভমেলায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছে।

আজো আসে, এখনো আসে। আমার মত কত মানুষ এসেছে, কত মানুষ দেখেছে। তবু ভাবি, সেদিনও কি এমনি বিচিত্রের মেলা বসত! এমনি সব বিচিত্র নরনারী আসত তাদের হাসি ও চোখের জল নিয়ে। হয়তো আসত, এর চেয়েও বিচিত্রতর মানুষ। বিচিত্রতর ছিল তাদের হৃদয়লীলা।

শুনলাম, আগুন লেগেছে প্যারেড গ্রাউণ্ডে। যে আগুন এখন মানুষের প্রাণ, সেই আগুন রুদ্রমূর্তিতে দিয়েছে দেখা। ভয় হল। প্যারেড গ্রাউণ্ডে বলরাম থাকে। এর পরে একদিনও যাই নি। আগুন লাগার কথা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, না, বলরামদের তাঁবু অক্ষত আছে।

বলরাম বলল, 'জানতাম, ঠাকুর আমার না এইসে পারবেন না। ঠাকুর কি আর এমনি কইছি। ওইখানে থেকে উনি পিতিদিন এইসে এইসে জিজ্ঞাসা করেছেন কই লুলাসাধুজী, তোমার বাবুজী তো আইসলেন না?'

'মনে মনে কইছি, রয়েন গো ঠাকরুন, সময় হইলে আপনি আসবেন।'

বুঝলাম, শ্যামার কথা বলছে। অভদ্রতার চেয়েও বড় কথা, শ্যামার নিষ্পাপ হৃদয়লীলা দুদিনের জন্য সুর তুলতে চেয়েছিল। তার সেই বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারি নি আমি আমার সমাজবোধের জন্য।

বলরাম বলল, 'আপনি রোজই শহরে চলে যান শুনলাম। কাইল গেছিলাম আমরা। আপনার আশ্রমে। গিয়া শুনলাম, আপনি নাই। কেউ কিছু কয় নাই আপনারে?'

অবাক হলাম। তাই তো, কাল ব্রজবালা কী যেন বলছিল। প্রহ্লাদ এ ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় শয্যা নিয়েছে। ব্রজবালার মন খারাপ। তবু একবার যেন বলেছিল, তোমাকে ডাকতে এসেছিল কারা। ভেবেছিলাম, শহরের কেউ

হবে। যেভাবে শহরে পরিচয়ের বাড়াবাড়ি ঘটেছে, কারুর আসা বিচিত্র নয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি গেছলে?'

বলরাম বলল, 'একলা নয়, ওনারা চারজনও আছিলেন। ওনার সতীন, সতীনের বুইন আর ঝি। আমারে কইলেন, লুলাসাধুজী, আমার সতীন না গেলে তোমার বাবুজী আইসবেন না। চল ঘুরে আসি। আপনারে পাইলাম না। ওনারা অনেক জিনিসপত্র কিনলেন, তারপর আইসে পড়লেন।'

স্তব্ধ হয়ে রইলাম। বলরাম বলল, 'যাইবেন একবার?' বলরামের হাসিমুখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'বলরাম, যাওয়া যায় না।'

ফিরে আসবার পথে লক্ষ্মীদাসী ছুটে এল। বলল, 'ঠাকুর, আপনে এট্টু বারণ কইরে যান তারে, যেন এমনি করে বাইরে না বইসে থাকে। আবার মেলায় মানুষ বাড়তেছে। কাইলকে কার পায়ের তলায় পইড়ে মাথায় চোট খাইছে। আপনে এট্টু কন, আপনার কথা শুইনবে। কিছু কইলে খালি এক কথা, নক্কীদাসী! মন যে মানে না গো! তবে আখড়া, ভোগ পূজা রেইখে তুমি আমার সঙ্গে চল। যদি কই, কোথায়? কয়, সেইখানে মন টানে, মন যায়।'

কেঁদে ভাসাল লক্ষ্মীদাসী। বলরাম বলল, 'নক্কীদাসী, তোমার কাছেই তো পাঠ নিছি—'

'আর বইসে থাকার সময় নাই গো,
বেন্দাবনে বাজছে বাঁশি আমার নাম ধইরে।'

তবু বললাম, 'কিন্তু সাবধান থেকো বলরাম। এভাবে জীবন সংশয় কোরো না।'

সত্যি, আবার লোক বাড়তে আরম্ভ করেছে। মাঝে ভাঙন ধরেছিল, ফিরে যাওয়ার তাড়া পড়েছিল একটা। কিন্তু দ্বিগুণ করে ফিরে আসার তাড়া পড়েছে। ঠাণ্ডা কমেছে, হিমপ্রবাহ সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আবার রোদ

হাসতে আরম্ভ করছে। প্রত্যহ নতুন নতুন সাধুবাহিনী হাতি, ঘোড়া ও নিশানের মিছিল নিয়ে ছুটে আসছে দূর-দূরান্ত থেকে।

এই প্রথম দেখলাম, উলঙ্গ সন্ন্যাসী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ছুটে আসছে অশ্ব-সওয়ার হয়ে। বিশেষ, নাগাদেরই এ রুদ্রমূর্তিতে দেখা যাচ্ছে বেশী। তাদের চেহারায়, অস্ত্রে, সর্বদাই তারা ভয়ঙ্কর। কখন থেকে এদের উৎপত্তি, জানি নে। তবে শুনেছি, নগ্নতা বহুদিনের। কৃপাণ কয়েশ-শো বছর আগের। অসহায় সাধুদের রক্ষার জন্য চৌদ্দশ শকে বালানন্দজী সাধু-সংরক্ষণী সশস্ত্র সাধুসেনাবাহিনী তৈরী করেছিলেন। এমন কি এরা অনেক সময় রাষ্ট্রের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছে।

সাধু ও মানুষের ভীড়ে মেলা আবার জমকে উঠল। সামনে অমাবস্যা। মৌনী অমাবস্যা, সেইদিন পূর্ণকুম্ভ স্নান।

একদিন রাত্রিবেলা পাঁচুগোপাল বলল, 'তুমি সব লিখবে, এখানকার সব কথা?'

বললাম, 'যদি লিখি?'

'আমার কথাও লিখবে?' চেয়ে দেখি, পাঁচুগোপালের সেই চোখে সেই পাগলামির ছায়া। বললাম, 'লিখতে পারি।'

কেউ ছিল না। তবুও চারদিক দেখে সে বলল, চাপা গলায়, 'তবে লিখে দিও, আমি বলেছি সেইভাবে নয় কিন্তু! লিখে দিও, যদি সে একবার এসে বলে, বাবামণি, তুমি আমায় মাপ কর, তবে, তবেই আমি তাকে······'

কণ্ঠরুদ্ধ হল তার। দুপ-দাপ শব্দে চলে গেল সে সামনে থেকে। 'সে' মানে তার মেয়ে শিউলি। যে তার বাবাকে ছেড়ে গিয়েছে। জানি নে সে কোথায় আছে। কিন্তু আমি লিখে দিলে যদি সে পাঁচুগোপালকে এসে বাবামণি বলে ডাকে, তবে লিখে দেব। নিশ্চয় লিখে দেব। লিখে দেব, 'শিউলি! কোথায় ফুটেছে, কোথা থেকে ছড়াচ্ছে এত গন্ধ। ডক্টর পাঁচুগোপাল পাগল হয়ে ফিরছে পথে পথে। একবার বাবামণি বলে ডেকে তার কোল ভরে দিয়ে যাও।'

মেলা পাগল হয়ে উঠল। যে মানুষের বন্যা দেখে এতদিন অবাক

হয়েছি, এবার তার অনেক গুণ বেশী। মনে হল, মানুষ আর ধরবে না সারা মেলায়।

অমাবস্যা নিকটবর্তী। সকালবেলা এসে হাজির বলরাম। এসে বলল, 'চলেন ঠাকুর।'

বলরাম, 'কোথায় হে ?'

বলল, 'যেখানে যাওয়ার ?'

আশ্রমের সবাই অবাক বলরামকে দেখে। শুনলাম, সকলেই বলাবলি করছে, ছোঁড়াটা কোন গুণ্-তুকের ওষুধের সন্ধানে আছে। নইলে, ওসব মানুষের সঙ্গে কেন ? ব্রজবালাও আমাকে পর পর ভাবতে আরম্ভ করেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ? তোমাদের তাঁবুতে ?'

সে বলল, 'না, বেড়াইতে।'

বের হলাম। বলরাম সোজা দক্ষিণে নিয়ে চলল। নিয়ে চলল, যেখানে গৃহাবধূতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বুঝতে দেরী হল না, কেন বলরাম টেনে নিয়ে এসেছে।

দূর থেকেই দেখলাম জনবিরল গঙ্গার ধারে, শ্যামা দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে তার জলভরা কলসী। কলসীর মুখে ভেজা জামাকাপড়। বুঝলাম, স্নান করে দাঁড়িয়ে আছে। পরেছে লাল টকটকে শাড়ি। জানি, সে দেখেছে। তবু মুখ ফিরিয়ে আছে অন্যদিকে।

পা আপনি থেমে এল। বললাম, 'বলরাম, তুমি তো আনন্দ ছাড়া কিছু জান না। তবে পথের মাঝে শুধু অনাসৃষ্টি করে এ নিরানন্দকে ডেকে আনছ কেন ?'

বলরাম বলল, 'ঠাকুর সত্যই অনাচ্ছিষ্টি। তবে, চোখের জল কি শুধু অনাচ্ছিষ্টি ? তবে আনন্দে চোখের জল ফেলেন কেন ?'

'এখানে সে আনন্দ কই ?'

'ওই যে। হেসে, কথা কয়ে একজন আনন্দ ছিষ্টি করতে চাইছে, তারে আমি থামাই কেমনে ? যে কেন্দে কেন্দে আনন্দ করতে চায়, তারে ফিরাই কেমনে ? এই যমুনাপারে আপনারা দেখা করেন, কেন্দে ফিরে যান।

আমি তাই দেখি। দেইখে ফিরে যাইব। সেই আমার আনন্দ। পথ চলার ওই তো মজা। ওই আনন্দটুকু তার লাভ।'

'এই বুঝি তোমার গুরুর শিক্ষা?'

'হ্যাঁ। কিন্তুন্, সে বলে ওইটুকু নাকি দুঃখু। যে দুঃখু মাইনসের সঙ্গ ছাড়ে না। আমরা আনন্দ-দুঃখু একসঙ্গে থাকি।'

বলে সে হাসল। এগিয়ে গেলাম। শ্যামা ফিরে তাকাল। কিন্তু এ কী! এতদিন সে অন্য শাড়ি পরে রাঙা হাসি হেসেছে। আজ রাঙা শাড়ি পরে এসেছে, কিন্তু সারা মুখে ব্যথা-নীল যমুনার স্থির ও গম্ভীর ছায়া। ভেজা চুল এলানো। বাঁকা চোখে তার অভিমানক্ষুব্ধ তিরস্কার। তাকিয়ে প্রথমে শুধু বলল, 'মিথ্যুক!'

ওইটুকু বলতেই তার গলায় যেন অনেক জোর দিতে হল। বলরাম বলল, 'ঠিক। কপট বাক্যিতে ঠাকুর বড় দড়ো দেখতেছি।'

না হেসে পারলাম না। মেনে নিতে হল শ্যামার অভিযোগ। বললাম, 'শুনলাম তোমরা একদিন আশ্রমে এসেছিলে।'

চকিতে ঠোঁট বাঁকিয়ে শ্যামা বলল, 'মগর, তুমি পালিয়েছিলে। ভীরু! কেন পালিয়েছিলে?'

বললাম, 'পালাই নি। জানতাম না, তোমরা আসবে।'

সে বলল, 'জানতে। ভয়ে পালিয়েছিলে।'

'কার ভয়ে?'

'আমার ভয়ে।'

'তোমার ভয়ে? কেন?'

শ্যামা চকিতে মুখ ফিরিয়ে নিল। মুখ না দেখিয়ে বলল, 'আমি খারাপ আওরত তাই। তোমাকে তখলিফ দেব, সেই ভয়ে তুমি কথা দিয়েও যাও নি। তুমি এসেছ, চলে যাবে। আমিও চলে যাব। মানুষের সঙ্গে কি মানুষের মিতালি হয় না?'

বলে সে ফিরল। হাস্যময়ী শ্যামার চোখে বহতা যমুনা। বলল, 'যেয়ে দেখতে তোমাকে তখলিফ দিতাম না। যত খারাপ ভাব, আমি তত খারাপ নই।'

পরাজয় ধিক্কার দিল আমাকে। শ্যামার লাল শাড়ি নীল হয়ে উঠল। ও যে ব্যথার রঙ! যমুনার কারসাজি। যমুনাতীরের বাঁশি কবে লোকলজ্জা মেনেছে। সে যে চিরদিন কলঙ্কের ফোঁটা কপালে দিয়ে হাসিয়েছে কাঁদিয়েছে। শুধু মিতালি। শ্যামা আমার মিত্রাণী। মনে মনে কোন অস্বীকৃতি ছিল না। প্রকাশ্যে লজ্জা ছিল, সে-বাঁধও ভাঙল। তাকিয়ে দেখি, সেই দুরন্ত মেয়ে, কী অসহায়! ডাকলাম, 'শ্যামা!'

এই প্রথম তার নাম ধরে ডাকা। শ্যামা ফিরে তাকাল। বললাম, 'ভীরু নই। তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি।'

শ্যামা বলল, 'তুমি আমার তখলিফ ভাবছিলে? মিথ্যুক। তবে আসো নি কেন?' বলতে বলতে তার ভেজা চোখে ও বাঁকা ঠোঁটে হাসি দেখা দিল। বলল, 'এখানে রোজ চান করতে আসব, যে কদিন আছি। আসবে তো? আসতে হবে।'

মনের কথা বলতে পারলাম না। নীরবে স্বীকৃতি দিতে হল। বলরাম বলল, 'একখান হিন্দী গান শিখছি এইখ্যানে এইসে—

'শুন শুন রাধে, মৎ যাইহো যমুনাকে তীর
বেন্দাবনকে কুঞ্জ গলিমে কর পকড়ত মরি চীর।'

এবার গানের সঠিক অর্থ বোঝায় কোন গণ্ডগোল হয় নি শ্যামার। একবার বলরাম, আর-এক বার আমার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল অপাঙ্গে। হাসল নিঃশব্দে ঠোঁট বাঁকিয়ে। তারপর শ্যামা বলল, 'চল।'

'কোথায়?'

'আমাদের ওখানে।'

গেলাম। দেখলাম, মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হল। বলতে হল, আমার সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে, তাই ধরে নিয়ে এসেছে। প্রৌঢ়া প্রেমবতীয়া আমাকে দেখে হেসে উঠল। প্রৌঢ়া বলল, 'লুলা সাধুজির সঙ্গে তোমার আশ্রমে গিয়েছিলাম। কদ্দিন আছ আর?'

কোন বিকার না দেখে অবাক হলাম। বললাম, 'অমাবস্যাটা দেখে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।'

তারপরেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। সর্বনাশ! বৃদ্ধ ব্যাঘ্র এক নজরে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! বুড়ো হঠাৎ ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, 'খবর ভাল?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

বুড়ো বলল, 'আমার ছোট বউ তোমার কথা খুব বলে।' তারপর হঠাৎ গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'ভগবান তোমার ভাল করুন।'

বলে বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দূর আকাশের দিকে।

চোখ তুলে দেখি শ্যামা তাকিয়ে আছে এদিকে।

তারপর দেখা হয়েছে প্রায় প্রতিদিন। শুধু ঘাটে নয়, নাগাবাসুকির মন্দিরে, দারাগঞ্জের বেণীমাধবের স্থানে, ওপারে অড়হরের ক্ষেতের ধারে। বলরাম ছিল সব সময়। প্রৌঢ়া প্রেমবতীয়াও সঙ্গে ছিল দু-একবার। কেবল পাগলের মত ঘুরেছে লক্ষ্মীদাসী বলরামের পেছনে পেছনে।

অমাবস্যার আগের দিন যমুনার ঘাটে বললাম, 'পরশু চলে যাব।'

শ্যামা বলল, 'আমরাও।' বলে সে ফিরে তাকাল দূরে যমুনার দিকে। রুদ্ধ গলায় বলল, 'মনে থাকবে?'

'কী?'

'এই মেলা?'

'থাকবে।'

শ্যামা দুর্জয় কটাক্ষ হেনে বলল, 'মিথ্যুক।'

না, মিথ্যুক নই। জানিনে কিসে ভরে রইল বুক ও মন। এই ভরা নিয়ে আমার চলা। ভুলব কেমন করে। বলরাম বলল, 'আমার কী পাওয়ানা হইল?'

বললাম, 'কিসের পাওয়ানা?'

'আপনাদের বিদায়ের?'

শ্যামা বলল, 'আমি দেব তোমাকে, কাল ভোরে, এখানে! তোমার বাবুজী এলে।'

ভোরে যেতে পারলাম না! অনেক বেলা হল। আশ্রম ফাঁকা। ভিড়

দেখে আতঙ্ক হল। কিন্তু এ তো শুধু ভিড় নয়, পাগলের মত সবাই দিগবিদিক ছুটছে। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে, কাপড়-জামা ছিঁড়ে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মানুষ চারিদিকে ছুটছে; খুন! মৃত্যু! মরে গেছে, হাজার হাজার মরে গেছে।

কী হল? যাকে জিজ্ঞেস করি, সে-ই ঠেলে ফেলে ছুটে যায়। দুবার মুখ থুবড়ে পড়লাম। মানুষ কি পাগল হয়েছে?

শুনলাম, মানুষে সাধুতে দলেপিষে প্যারেড গ্রাউণ্ডে হনুমানজীর মন্দিরের কাছে মৃতদেহের স্তূপ জমেছে। সাঁকো পার হতে পারলাম না। ভিড় আর পুলিসের কর্ডন চারদিকে।

বেলা দশটায় এসে একটার সময় পার হলাম। সারা মেলা জুড়ে শুধু মৃত্যু-চীৎকার। সে কাহিনী আর বাড়াব না।

কিন্তু বলরামদের তাঁবু কোথায়? বলরাম কোথায়? সব ছিন্ন-ভিন্ন ভাঙা তছনছ চারিদিকে। কাউকে পেলাম না। লক্ষ্মীদাসী, বলরাম, শ্যামা—কাউকে না।

চারিদিকে শুধু মৃতদেহের স্তূপ। তাকে ঘিরে রয়েছে পুলিসবাহিনী। অপরিচিত নারী ও পুরুষ কণ্ঠলগ্ন হয়ে পিষে মরেছে। শিশু চেপটে লেপটে রয়েছে মায়ের বুকে। যে দেহ ও রূপ নিয়ে অনেক লজ্জা, অনেক সজ্জা, তা আজ ঠাণ্ডা, স্পন্দনহীন স্তূপীকৃত। রঙীন ওড়না আর সিল্‌ক শাড়ি, নাগরা জুতো আর কলিদার পাঞ্জাবি, মাথার টিকুলি আর গলার চন্দ্রহার, তারই সঙ্গে ছন্নছাড়ার ছিন্ন বেশ, সব একাকার। কিন্তু সে স্তূপে সাধু একটিও নেই।

পুলিসের কর্ডন ভেঙে মানুষ ছুটে আসতে চাইছে। খুঁজছে। বউ-মা, বাপ-ছেলে, আত্মীয়-বন্ধু, সবাই সবাইকে খুঁজছে, ডাকছে, পায়ে পড়ছে পুলিসের।

কে একজন চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলছে, 'সব মাতাল সাধুরা এদের খুন করেছে, খুন।'

রাজপুরুষ থেকে শুরু করে সকলের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধ ফেটে পড়ছে।

চলে এলাম। দেখলাম, আশ্রমের অনেকে এসেছে হাত-পা ভেঙে। হাত-পা-ভাঙা অবস্থাতেই গোছাতে ব্যস্ত। পালাও, পালাও। একদিন যেমন কারুর মুখে পা দিয়ে, কারুর গলা টিপে সবাই এসেছিল তেমনি করে আজ সবাই পালাচ্ছে। একদিন পাগলের মত হন্যে হয়ে সবাই এসেছিল, আজ পাগলের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে সবাই পালাচ্ছে।

সন্ধ্যা হল। শত শত চিতার আগুন লকলকিয়ে উঠল প্রয়াগের আকাশে। আগুন লাগার ভুল করে বার বার ফায়ারব্রিগেড অ্যালার্ম বাজল। কিন্তু সে চিতার আগুন নেভাবার জন্য কোন জলধারা ছুটে এল না। কার প্রতিশোধ এমন রূপ নিল, কার প্রতিদানের এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখা দিল।

ব্রজবালা ডাকল। চমকে উঠলাম। দেখলাম, তারা লটবহর নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। কেউ বলল না, শুধু সে বলল, 'যাবে না?'

ঝোলা কাঁধে নিয়ে বললাম, 'চল।' কিন্তু প্যারেড গ্রাউণ্ডে এসে স্থির থাকতে পারলাম না। ব্রজবালারা চলে গেল। আবার ছুটে গেলাম সেখানে। না, কেউ নেই। শুধু অপরিচিত জনতা ও পুলিসের ভিড়। ফিরে বাঁধে উঠতে গিয়ে, একটি গাছতলায় দেখলাম লক্ষ্মীদাসী, সঙ্গে কয়েকজন ছন্নছড়া ভীত সন্ত্রস্ত বৈষ্ণব। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম বলরামের কথা।

লক্ষ্মীদাসী আমাকে দেখে শান্ত গলায় বলল, 'কতবার, কতবার বারণ করছি ঠাকুর। কিন্তুন্ সে যে যাওনের জন্যে আসছিল, তারে আমি ফিরাইয়া নিয়া যাইব কেমনে?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে বলরামের?'

একজন বৈষ্ণব ফুঁপিয়ে বলল, 'বলরাম ওইখানেই আছে।' বলে চিতার দিকে দেখিয়ে দিল।

বলরাম নেই? নেই। বলরাম তার কথার ফুলবাগান নিয়ে এখানে এসেছিল। তার মালিনী ছিল লক্ষ্মীদাসী। এখন বাগান দগ্ধ হচ্ছে। লক্ষ্মীদাসী এইখানে বসে আছে।

শক্ত হয়ে রইলাম, নিজেকে দুহাতে চেপে ধরে রইলাম। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। পরে বললাম, 'চল, যাওয়া যাক।'

লক্ষ্মীদাসী : 'চিতা নিভুক ঠাকুর, পরে যাইব।'

তারপরে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি যেথায় আছো সেথায় আছি, আমার মিছা ভাবনা নাই মনে। তুমি ডাকলে আপনি কপাট খোলে, তোমার বাতাসে বাতাসে তাল দিয়া নাচি।'

বলরামের-ই গান। মূলগায়েনের গান। যার গান না শুনলে লক্ষ্মীদাসীর মন্দিরের ঠাকুর হাসে না, মুখ তোলে না। সে আবার বলল, 'নিভুক ঠাকুর, তা পরে যাইব।'

সেই ভাল। গভীর রাত্রে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওদের, মানে শ্যামাদের কোন খবর জান?'

লক্ষ্মীদাসী বলল, 'আপনার ওনার?'

আমার ওনার! সে বলল, 'ওনারে দেখি নাই। ওনার সতীনেরে দেখছি ঠাকুর, বুক থাপড়াইয়ে কানতেছিল। কিন্তুন্ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি নাই।'

বুক চাপড়ে কান্না? হাঁটু মুড়ে বসে রইলাম। নতুন করে আর কোন ভয়ঙ্করতাই নাড়া দিতে পারল না মনকে। কেবল ভেতরটা অস্থির হয়ে রইল।

সকালেও চিতা নিভল না। তবু যাত্রা করতে হল। পলায়মানদের স্রোতে ভেসে গেলাম। আসার জন্য মৃত্যু, এবার যাওয়ার তাড়ায় মানুষ মানুষকে পিষে মারছে।

ভিড়ের মধ্যে ট্রেনের কামরা খুঁজছিলাম। পিঠের ঝোলায় টান পড়ল।

ফিরে দেখি, প্রৌঢ়া। বলল, 'উঠে এস।' উঠলাম লক্ষ্মীদাসীকে নিয়ে। লক্ষ্মীদাসী বসল এক কোণে। দেখলাম তার পাশে প্রেমবতীয়া, তারপরে পতিয়া, তারপরে শ্যামা। প্রৌঢ়া আর শ্যামা দুটি সাদা ওড়নার ঘোমটা দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকেছে।

প্রৌঢ়া ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমার বুড়টা মারা গেল ভাই।'

ফুঁপিয়ে উঠল প্রেমবতীয়া ও পতিয়া। কেবল শ্যামার মুখ দেখতে পেলাম না। সারা কামরাই ব্যথা ও শোকের কান্নায় ভরা।

জায়গা ছিল না। মাঝখানে মালের উপর বসতে হল। শ্যামা ফিরে তাকাল। ওড়না খসে গিয়েছে। সিঁথিতে মেটে সিঁদুর নেই, কপালে নেই

টিপ। রাত্রিজাগরণ ও ক্লান্তির ছাপ সারা চোখেমুখে। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল। ও-ই শ্যামার বিধবার বেশ। চোখে মুখে তার ক্লান্তি ও বেদনা ছিল। আর ছিল চাপা সুখের একটি নিগূঢ় ছাপ। কিন্তু বৈধব্যের যন্ত্রণার ছায়া কোথায় যেন আড়াল পড়েছে।

অনেকক্ষণ পর চোখ বুজে আসছিল। ঘাড়ে স্পর্শ পেয়ে ফিরে দেখি শ্যামার হাত। ঠোঁট দুটি একবার কাঁপল। বলল, 'আমরা পাটনায় নেমে অন্য গাড়ি ধরব।'

অকারণেই জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'কেন ?'

ব্যথিত হেসে শ্যামা বলল, 'ঘরে যেতে হবে না ?'

কোন সঙ্কোচ না করে তার দিকে ফিরে বসলাম। বললাম, 'বলরাম—'

সে বলল, 'জানি। তুমি ঘাটে এলে না। তোমার হয়ে তাকে আমি একটা জিনিস দিয়েছিলাম।'

'কী ?'

'আমার একটা আংটি।'

নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। সে বিষণ্ণ হেসে বলল, 'একটা কথা বলবে ? আমাকে কী মনে হল ?'

'এখনো, বুঝতে পারি নি।'

'আমার কিন্তু মনে হয়েছে।'

'কী ?'

'তুমি নিষ্ঠুর।'

বলতে বলতে তার চোখের কোণ দুটি চকচক করে উঠল।

কে জবাব দেবে ? বলরাম নেই আজ। কথা নয়, সে যে গান গেয়ে জবাব দিতে পারত। সে আবার বলল, 'যমুনাপারের ওই ঘাটে অনেকবার একলা গিয়ে অনেকবার ভেবেছি। তুমি যেখানটায় আসতে। ভেবেছি, আচ্ছা কী হল ?'

বললাম, 'কিছুই না।'

সে বলল, 'অনেক কিছু। যমুনার ঘাটে আর আমার মনে রয়েছে তা।

এই প্রথম আর……' চুপ করে আবার বলল, 'এই শ্যামাকে, নতুন বিধবাকে তোমার মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

সে আবার আমাকে বলল, 'মিথ্যুক! তুমি বড় মিথ্যুক!'

বলতে বলতে তার গলা রুদ্ধ হল।

আর মনের মধ্যে শুধু হু-হু করে উঠল একটি কথা, আজ বলরাম নেই! নেই! সে ছাড়া যে আমাকে সত্যবাদী বলার আর-কেউ ছিল না।

পাটনা এল। প্রৌঢ়া বলল, 'যাই।'

প্রেমবতীয়া পতিয়া প্রথম কথা বলল, 'যাচ্ছি।' শ্যামা তাকাল, ঠোঁট দুটি নড়ল। কি বলল অস্ফুটে, বুঝলাম না। তারপর সাদা ওড়নার ঘোমটা ঢেকে নেমে গেল। অনেক কথা ছটফট করে উঠল মনের মধ্যে। কিছুই বলতে পারলাম না। কেবল তাকিয়ে রইলাম। যতক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল, প্ল্যাটফরমের উপর থেকে নতুন বিধবা শুধু অন্ধ চোখে তাকিয়ে রইল।

প্যাসেঞ্জার গাড়ি। ঠেকতে ঠেকতে পরদিন সকালে বর্ধমান পৌঁছল। প্রায় পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। নতুন গাড়ি ধরতে হবে। লক্ষ্মীদাসীও নেমে গেল। পায়ে হাত দিয়ে বলল, 'ঠাকুর।'

তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে বললাম, 'বল।'

আশ্চর্য! সে গান গেয়ে উঠল। এমন মিষ্টি গলাটি লক্ষ্মীদাসীর। তাই তো। সে যে বলরামের গুরু। গুনগুন করে গাইল—

'মনের আগুন কেউ দেখল না।
তোমার বাঁশির স্বরে বাতাস আগুন।
যাখন ত্যাখন আইসে ফাগুন॥
বাজাইয়ে ফিরলে বন্ধু,
আমার মন দেখল না।'

সে চোখ বুজে গাইতে লাগল। দু-চোখ দিয়ে নেমে এল জলের ধারা।

মন্দিরের রাধারানী আজ মূল গায়েনের অভাবে নিজে গেয়ে কাঁদছে। তার সঙ্গীরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার গাড়ি এল। চলে গেলাম। অমৃতের সন্ধানে গিয়েছিলাম। কী নিয়ে ফিরে এলাম জানি নে। কেবল যেদিকেই ফিরি, সেদিকেই বড় ভারী। সকলের কথা, সকলের মুখগুলি একে একে মনে পড়ছে।

সেই চেনা মিছিলের মধ্য দিয়েই দ্বিপ্রহরের নিরালা গ্রামের পথে চলেছি ঘরে। বাগদিপাড়ায় ঢুকে মোড় নিতে গেলাম। কে বলল, 'ফিরে এলেন গো বাবা। একটু দাঁড়ান।'

কে? বুড়ি অবলা বাগদিনী। সে কেন দাঁড়াতে বলল? আর পথে দাঁড়াতে পারি নে।

সে কথা বলে। কিন্তু ঘোমটা থেকে মুখ দেখায় না। মস্ত একটি ঘোমটা টেনে কলসী কাঁখে ফিরে এল। বলল, 'জুতা খোলেন।'

'কেন?'

'খোলেন না।'

খুললাম। এক কলসী জল পায়ে ঢেলে দিয়ে বলল, 'তীথিক্ষেত্তর থেকে এলেন। পা ধুইয়ে দিতে হয় যে। নিয়ম কি না।'

ঠাণ্ডা স্পর্শে সমস্ত শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। আর এতক্ষণে সব ঝাপসা হয়ে এল চোখের সামনে।

যাত্রার শেষ কোথায়? ঘরের কাছে এসে অবলা বাগদিনী আমাকে নতুন অমৃত-সন্ধানের জলধারা দিল পায়ে। সন্ধানের শেষ নেই।